KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ নবীন চন্দ্র রায়চৌধুরী, কল-২৬
Collection : KLMLGK	Publisher নীরু সরকার
Title চিত্রবৎ	Size 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number ৫৫/৩	Year of Publication বৈশাখ- আশ্বিন ১৪১১ // Aug 2004
	Condition : Brittle Good ✓
Editor আবদুর রউফ	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৬৩ সংখ্যা ৩ বৈশাখ-আশ্বিন ১৪১১

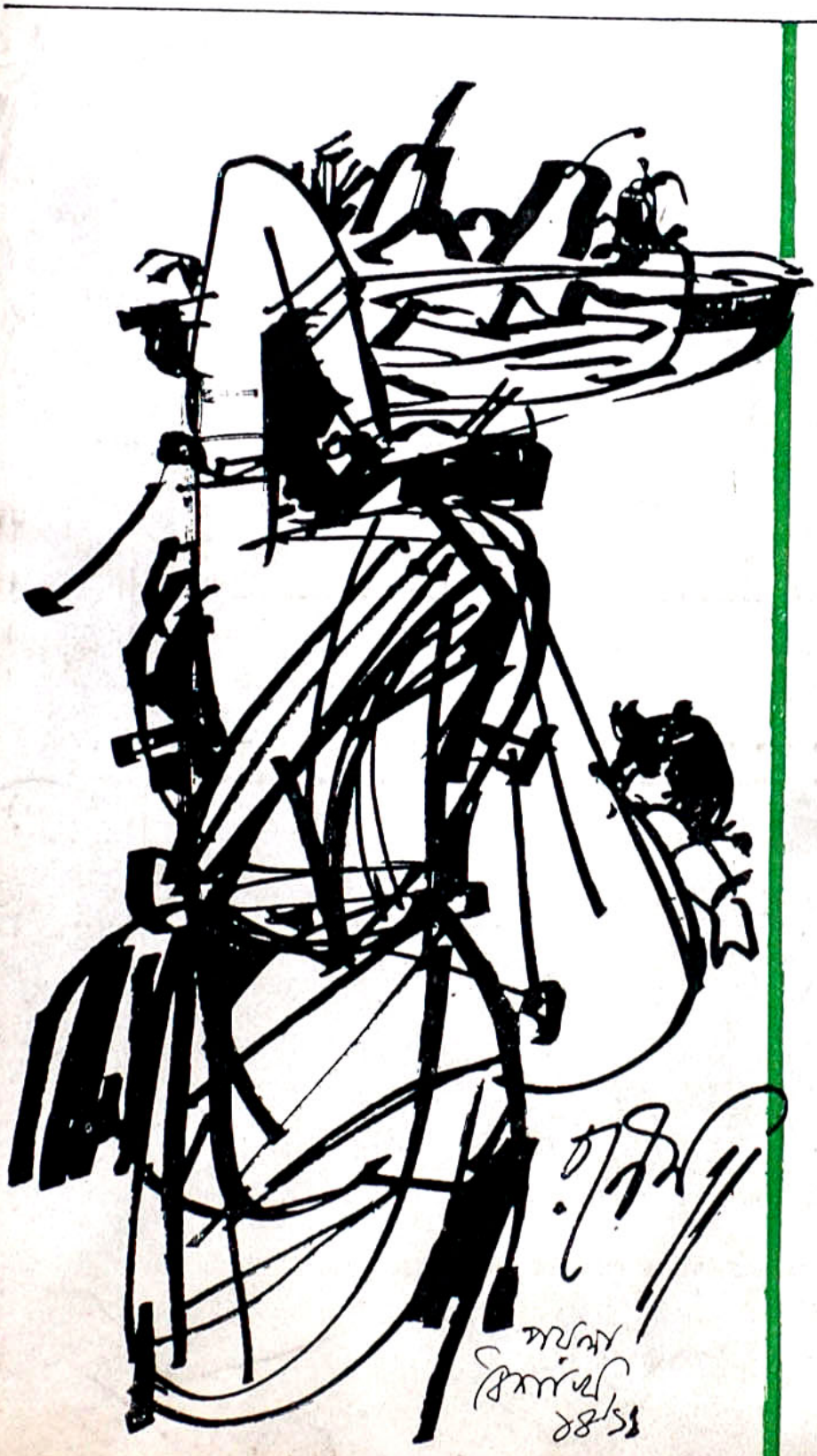

'বণিক-সংস্কৃতির সদর্থক অবদান' সতর্কতার সঙ্গে বুঝে নেবার পরেও তার 'নিদারুণ অসম্পূর্ণতা' নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মানুষের আত্মদর্শন ও আত্মানুসন্ধানের জটিল রহস্যময় দিকটা আলোচনা করেছেন অর্থনীতিবিদ-দার্শনিক অম্লান দত্ত।

পরার্থপরতার বিপরীতে স্বার্থপরতা কী যুক্তিতে অর্থনীতির বিষয় হতে পারে, অর্থনীতিতে তার ভূমিকাই বা কী— এই নিয়ে অর্থনীতিবিদ দেবকুমার বসুর প্রবন্ধ।

১৯৪৮-য়ে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে কলকাতায় গড়ে উঠেছিল 'খোঁজ পরিষদ' নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত লিখেছেন তারই জন্মমৃত্যুর বৃত্তান্ত।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশে ও বালুচিস্তানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অপকীর্তির নতুন তথ্যসমৃদ্ধ কাহিনি শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবন্ধে।

সুখরঞ্জন সেনগুপ্তের ধারাবাহিক রচনায় 'জনসেবক' পত্রিকার প্রথম দিনগুলির কথা।

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের রম্য-সংলাপ— 'বিংশ-একবিংশ সংবাদ'।

WITH BEST COMPLIMENTS

"TO BUILD A BETTER TOMORROW D.T.M. OFFERS A WIDE RANGE OF CIVIL ENGINEERING AND MANUFACTURING SERVICES UNDER ONE ROOF"

SPECIALISED IN THE CONSTRUCTION AND ERECTION OF :—

- MATERIAL HANDLING PLANTS
- LPG BOTTLING PLANTS
- 400 KV SUBSTATION & SWITCHYARD FOUNDATION
- MULTISTORIED BUILDING
- HOUSING COMPLEXES
- BRIDGE & ROADS
- FACTORY BUILDING & SHEDS
- GAS TURBINE PROJECTS
- MANUFACTURING OF PRE-STRESSED CONCRETE POLES
- DREDGING OF LAKES, CANALS, WATER RESERVOIR & RIVER BEDS
- HEAVY EQUIPMENTS FOUNDATION
- AND GOVERNMENT PROJECTS

D. T. M. CONSTRUCTION (INDIA) LIMITED

CIVIL/STRUCTURAL ENGINEERS CONTRACTORS

MASTER DREDGERS & PROMOTERS

Registered Office :

59B, CHOWRINGHEE ROAD (3RD FLOOR)

CALCUTTA - 700 020

PHONE : 2283 2538

TELE FAX : 22832545

35 Years' Dedicated Service to the Nation

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৬৩ সংখ্যা ৩-৪
বৈশাখ-আশ্বিন ১৪১১

প্রবন্ধ

- যুক্তির স্তরভেদ ও ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি — অম্লান দত্ত ১১১
- স্বার্থপরতার অর্থনীতি — দেবকুমার বসু ১১৪

কবিতা ১১৮-১২৫

- ভাস্কর চক্রবর্তী ■ সব্যসাচী দেব ■ গণেশ ভট্টাচার্য ■ বেণু দত্তরায় ■ বিকাশ নায়ক
- নন্দিতা সেন বন্দ্যোপাধ্যায় ■ সৌমনা দাশগুপ্ত ■ সেবন্তী ঘোষ

ছোটগল্প

- মৃত্যুর ফেরিওয়ালা — অভিমন্যু সারথি ১২৬

অনুবাদ গল্প

- মহাবলী — সুজাতা ১২৯

ধারাবাহিক স্মৃতিচারণা

- ভাঙা পথের রাঙা ধুলায় — সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত ১৩৪

রম্যসংলাপ

- বিংশ - একবিংশ সংবাদ — রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ১৪৩

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

- খোঁজ পরিষদ : একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান — আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ১৫০
- ভারত-বিভাজনের কিছু স্বল্পজ্ঞাত তথ্য — শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫২
- ভ্রমণ - বিভ্রম — চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল ১৬১

গ্রন্থসমালোচনা ১৭১-১৮৪

- জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ■ সৌমেন সেন ■ ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
- সৈয়দ আবুল মকসুদ ■ প্রণব সেন ■ বুলবুল আহমেদ

নাট্য সমালোচনা

- '১৭ই জুলাই'-য়ের নাট্যনির্দেশক উত্তীর্ণ হয়েছেন ...... — আবদুর রাউফ ১৮৫

চলচ্চিত্র সমালোচনা

- মেল গিবসনের 'দ্য প্যাশন অব দ্য ক্রাইস্ট' — মেঘ মুখোপাধ্যায় ১৮৭

স্মরণে

- হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় — প্রণব বিশ্বাস ১৯১
- বিলায়েৎ খাঁ — অতনুশাসন মুখোপাধ্যায় ১৯৩

প্রতিবেদন ১৯৭ **চিঠিপত্র** ১৯৮

সম্পাদক : আবদুর রাউফ

শিল্প পরিকল্পনা : রণেন আয়ন দত্ত

সম্পাদনা সহকারী : মেঘ মুখোপাধ্যায়

উপদেষ্টামণ্ডলী

শঙ্খ ঘোষ
দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত
রণেন আয়ন দত্ত
তুষার তালুকদার

মূল্য : ১৫
ডাকে : ২০

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক ইম্প্রেশন হাউস, ৬৪ সীতারাম ঘোষস্ট্রিট, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা – ১৩ থেকে প্রকাশিত

দূরভাষ ২২১৫-০৭৭০

অক্ষর বিন্যাসে - নয়া উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা - ৬

Rasoi
RASOI LIMITED

যুক্তির স্তরভেদ ও ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি

অম্লান দত্ত

আত্মার সংকুচিত রূপ অহং, যার অনুরণন আছে অহংকার শব্দটিতে। অহমের সম্প্রসারিত রূপ আত্মা, যার স্পষ্টতর উচ্চারণ 'মহাত্মা' অভিধায়। শব্দের প্রচলিত ব্যবহার নিয়ে তর্ক উঠতে পারে, আমরা তাতে যাচ্ছি না। শব্দার্থের হেরফের মেনে নেবার পর একটা কথা থেকে যায়, যেটা নিয়ে তর্ক নেই। মানুষজীবটি মিশ্র প্রকৃতির। আপাত অসমঞ্জস নানা উপাদান তাতে মিলে মিশে আছে। যে শিশু ছোট ছোট মান অভিমান নিয়ে নাটকীয় ভাবে "অহংকেন্দ্রিক" তাকেও দেখা যায় বিশ্বপ্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কখনও উত্তেজিত কখনও বিস্ময়ে অভিভূত। এই সারল্য এই বৈপরীত্য শিশুর বৈশিষ্ট্য, সেটা যদি বা বিবর্ণ হয় বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তবু মুছে যায় না, চেতনার তলায় কোথাও রক্ষিত থাকে। অথবা ধরা যাক সেই কিশোরের কথা, যে স্বদেশকে ভালবাসে, আত্মবলিদানে প্রস্তুত, ত্যাগের মূল্যেও স্বদেশবাসীর প্রতি যার সহানুভূতি সাগ্রহে প্রসারিত। অথচ দেখি সে আবার ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ধর্মের প্রতি অবস্থাবিশেষে কঠোরভাবে নির্দয়। অহংবোধ এবং আত্মত্যাগের আকাঙ্ক্ষা সবই মিলে মিশে জটিল রহস্যময় হয়ে ওঠে। এই ব্যাপারটা কিছু পরিমাণে বুঝে নেওয়া মানুষের আত্মজ্ঞান অনুসন্ধানেরই অংশ বলে বিবেচিত হতে পারে। এই আত্মজ্ঞান প্রয়োজন আজ সুস্থ মানুষ সুস্থ সমাজ গড়বার জন্য।

মানবসমাজের আদিম যুগে অহংবোধের প্রাথমিক সম্প্রসারণ ঘটেছে প্রকৃতির পরিকল্পিত সরল পথে। সন্ততির ভিতর জনকজননী নিজেকেই দেখেছে। আত্মপ্রসারের এই শক্তি, প্রকৃতিপ্রদত্ত স্নেহ মমতা, ইতিহাসের দীর্ঘ পথ ধরে কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও কার্যকর রয়েছে। আধুনিক যুগেরই কোনও বাঙালি পিতা ব্যক্তিগত পত্রে "প্রাণাধিকেষু" বলে সম্বোধন করেছিলেন পুত্রকে। পুত্রকন্যার প্রতি মাতাপিতার প্রাণের টানের যে বন্ধন কখনও মর্মান্তিক হয়ে ওঠে, তার ব্যাখ্যার জন্য প্রকৃতিকে অতিক্রম করে বেশি দূর যেতে হয় না। "অহম্" শব্দের সম্বন্ধবাচক রূপ হচ্ছে "মম"। অহংবোধের প্রবল শক্তিই আদিতে মমতা হয়ে ওঠে, এরা দুই ভিন্নপ্রান্তের বস্তু নয় অন্তত আদিম পর্যায়ে।

সেই তুলনায় মাতাপিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যবোধ কিছুটা ভিন্ন জাতের বস্তু। এই বোধটি সম্পূর্ণ প্রকৃতিপ্রদত্ত নয়, বরং বেশ খানিকটা সামাজিক বিধান ও সংস্কৃতি দিয়ে গঠিত। কোনও কন্যা কর্ডেলিয়া হন, সব কন্যা নন; কিং লিয়ার থেকে গেছেন বহু যুগের ওপার থেকে বিদীর্ণ পিতৃহৃদয়ের আর্তনাদ বহন করে। সংস্কৃতিতে আছে বৈচিত্র ও অসম্পূর্ণতা, প্রকৃতিতে চিরকালের ভাষা। জটিলতা যদিও আছে পরিবারের গণ্ডির মধ্যেও তবু প্রথমিক পর্যায়ের মূল তত্ত্বকথাটা সাধারণভাবে মান্য। অর্থাৎ পারিবারিক সংঘবদ্ধতায় অথবা আত্মীয়সমাজে অহংবোধের যে সম্প্রসারণ ঘটেছে প্রাচীন সমাজে, তার অবস্থান ততটা সচেতন যুক্তিবিচারে নয় যতটা সহজাত প্রবৃত্তির আধারে। আত্মীয়সমাজের আরও একটু বর্ধিত রূপ পাওয়া যাবে রক্তের সম্পর্ক ও বৈবাহিক

বন্ধনে গঠিত আদিবাসী অথবা কনবাসী কিংবা জনজাতি সমাজে। এখানেও সমাজসংহতির প্রধান আশ্রয় হচ্ছে আদিম জৈব প্রবৃত্তি। এর পর থেকে কিন্তু ইতিহাসে প্রধান্য পেতে থাকে চেতনার ও সমাজসংগঠনের ভিন্নস্তরের কিছু শক্তি।

এক জনজাতির অদূরে আছে অন্য জনজাতি। এরা দুই ভিন্ন আত্মীয়সমাজ। এদের ভিতর সম্পর্কটা হবে কোন ধরনের? জনসংখ্যা যতই বাড়ে আর সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পায় প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অধিকার নিয়ে কাড়াকাড়ি, ততই পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নটা আর তুচ্ছ করা যায় না। নানা ধরনের সম্পর্কই সম্ভব। দুই প্রধান সম্বন্ধের প্রাধান্য দেখা গেছে ইতিহাসে, তাই দিয়ে কথা শুরু করা যাক।

অহংবোধের একটা ঝোঁক আছে প্রভুত্বপরায়ণতার দিকে। আরও একটু ব্যাখ্যা করে বললে কথাটা এই রকম দাঁড়ায়। যাকে আপন ভাবা যায় না, অপর যে জন, অহংবোধ তাকে উপেক্ষা করতে পারে ততক্ষণই যতক্ষণ সে ভয়ের অথবা লোভের বস্তু হয়ে ওঠে না। লোভের বস্তু হলে তার ওপর আধিপত্য অর্থাৎ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করবার পথটা আকর্ষক হয়ে ওঠে। এক জনজাতি অন্যকে লুণ্ঠন করে ধনবান হতে চায়। মানুষের নিষ্ঠুরতার কিছু কাহিনি এই ভাবে ইতিহাসে ও লোকস্মৃতিতে স্থান পায়। কিন্তু লুণ্ঠনটা হতে পারে কেবল সাময়িক ঘটনা, প্রভুত্ব আরও স্থায়ী ব্যবস্থা। এই পথে ঘটনা এগিয়ে গেছে বারবার—আক্রমণ লুণ্ঠন তারপর সংগঠিত প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাজ্য ও সাম্রাজ্য। আক্রমক উপজাতি হয়ে উঠেছে পরাভূত ভূখণ্ডের পরাক্রান্ত শাসকগোষ্ঠী। ক্ষত্রিয় সে যুগে বীর;বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। অহংবোধ এইভাবে উত্তীর্ণ হল তামসিকতা থেকে রাজসিকতায়। সমাজ হল ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রশক্তির পদানত। ক্ষমতালিপ্সু যূথবদ্ধ অহংবোধের নতুন সীমানার মধ্যে লালন করা হল মানুষের খণ্ডিত চেতনাকে। সংঘবদ্ধতার আধার হল ধর্ম ও উত্তেজক মতাদর্শ। মনে রাখা ভাল যে ইতিহাসের সেই পর্বটাকে আমরা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

এরই পাশে পাশে এগিয়ে গেছে সমাজবিবর্তনের অন্য এক ধারা। বিভিন্ন দেশ ও জনগোষ্ঠীর ভিতর বৃদ্ধি পেয়েছে পণ্যবিনিময়ের সম্পর্ক। আকারে বিস্তৃত আর সংগঠনে কিছুটা দৃঢ় হলে এই বিনিময়ব্যবস্থাকে নাম দেওয়া হয় বাণিজ্য, যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা পায় বণিকশ্রেণি। আধুনিক যুগের আরম্ভে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অগ্রণী হয়েছিল পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ছোট দেশ। ক্রমে সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে যে মানুষের চেতনার ও উদ্যোগের দুই ভিন্ন স্রোত হিসাবে এরা অনেক সময় স্পষ্টভাবে চিহ্নিত থাকেনি। এ কথাটা তাই বলা প্রয়োজন যে বৈশ্য সংস্কৃতি আর ক্ষত্রিয়ের ঐতিহ্য ভিন্ন বস্তু, ইতিহাসে এদের ভূমিকা পৃথক। বণিকশ্রেণি যদিও ক্ষত্রিয়ের আধিপত্য কখনও মেনে নিয়েছে, ক্ষত্রিয় বণিকের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে, তবু এদের বিভেদকে লঘুভাবে দেখলে ভুল হবে।

এ কালের কিছু ঐতিহাসিক আর্থিক স্বার্থের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্রে রেখে মানুষের ইতিহাসের ব্যাখ্যা করেছেন। এই ভাবে চিরকালের সত্যের আসনে বসানো হয়েছে যুগবিশেষের চেতনাকে। দু'টি ভ্রান্তি সম্বন্ধে একই সঙ্গে সচেতন থাকা আবশ্যক। বৈশ্যের ঘরে মানবপ্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিচয় অথবা মানুষের সমগ্র ইতিহাসের চাবিকাঠি খুঁজতে যাওয়া ভুল। আবার বণিকের অবদানকে যথেষ্ট মান্যতা না দেওয়াটাও কম ভুল নয়। এই দ্বিতীয় ভুলটাকে মনে রেখে এবার কিছু কথা যোগ করা যাক।

প্রাচীন সমাজ ছিল বর্ণভেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক উচ্চনীচভেদ সব দেশেরই উপস্থিত, যদিও দেশে দেশে তার কিছুটা প্রকারভেদ আছে। আমরা এখানে বিশেষভাবে এদেশের কথা বলছি। বর্ণভেদ ধর্মশাস্ত্র দ্বারা সমর্থিত। রাজধর্ম কিংবা ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য ছিল ধর্মের বিধানকে মান্য করে শাসন চালানো। ভিন্ন দেশেও ঐতিহ্যমণ্ডিত অসাম্যকে রক্ষা করেই চলতে অভ্যস্ত ছিল অভিজাত শাসকবর্গ। বণিকশ্রেণির ওপর শাস্ত্রের প্রভাব পড়েনি একথা বলা যাবে না। তবু বণিকের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে যেটা উল্লেখযোগ্য ভাবে ভিন্ন। বণিকের যেটা নিজস্ব বৃত্তি তাই দিয়ে দেশে দেশে প্রভাবিত হয়েছে তার স্বধর্ম, সেই প্রভাব কাজ করেছে প্রাচীন সমাজব্যবস্থা থেকে একেবারেই ভিন্ন পথে। আর এই কারণেই প্রাচীন সমাজ বণিকশ্রেণিকে নিয়ে কখনওই স্বস্তিবোধ করেনি, সামাজিক বিন্যাসে তাকে স্থান দেওয়া হয়েছে নিম্নস্তরে। বণিকের নিজস্ব জগতে আছে ক্রেতা ও বিক্রেতার ভিতর ভেদ। ক্রেতার যদি ক্রয়ক্ষমতা থাকে তবে তার বর্ণ বণিকের দৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে গৌতম বুদ্ধের সময় থেকে শুরু করে এ দেশে বর্ণ- ভেদের বিরোধী যেসব ধর্মীয় আন্দোলন দেখা গেছে, সেই সবের প্রতি বণিকসমাজের উল্লেখযোগ্য সমর্থন লক্ষ করা যায়। অবশ্য বৃহত্তর সমাজের সদিচ্ছা রক্ষা করেই বৈশ্যকে চলবার চেষ্টা করতে হয়েছে নিজস্বার্থেই। সেটা ভিন্ন কথা। সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে বৈশ্যের বৃত্তি আর ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিধানের ভিতর একটা অস্বচ্ছন্দ সহাবস্থানই ধরা পড়ে।

আরও একটা কথা এখানে যোগ করা আবশ্যক। ইতিহাসের এ কালকে কোনও এক সময়ে বলা হয়েছে "যুক্তির যুগ।" যুক্তি হচ্ছে এ কালের যুগধর্ম। বিষয়টাকে যখন আমরা ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি—বিশুদ্ধ দর্শনের সঙ্গে নয়—তখন স্বীকার করতে হয় যে যুক্তিরও নানা স্তর আছে, প্রকারভেদ আছে।

এ কালের যুক্তিমুখী মননের একটা বিশেষ ঝোঁক আছে, যেটা নির্ধারিত হয়েছে শুধু বিজ্ঞান নয়, বাণিজ্যেরও প্রভাবে। বণিকের বৃত্তিগত প্রবণতা এই যে, সে হিসাব করে চলে, বৈষয়িক দৃষ্টিকোণ থেকে। যে কোনও সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য বৈষয়িক পরিণাম বিচার করে অগ্রসর হওয়াটাই ব্যবসায়ীর অভ্যাস। এইভাবে ইহবাদ আর পরিণামবাদ মিলে মিশে তৈরি হয় আধুনিক যুক্তিবাদী জীবনদর্শন। ব্যক্তিস্বার্থের মনোযোগী হিসাব এ যুগের অহংবোধের বৈশিষ্ট্য। পুরনো কিছু অন্ধ সংস্কার এতে দুর্বল হয়, নতুন কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়।

হিসাবি বুদ্ধির সঙ্গে বেহিসাবি ভালবাসাকে মেলানো যায় না। এইখানে সমস্যা। যে সম্পসারিত "অহং" ছুঁতে চায় "আত্মা"কে তার বিচারধারা ভিন্ন এক তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সে আপনাকে অপরের ভিতর আর অপরকে আপনার ভিতর পেতে চায়, কোনও লাভের হিসাব করে নয় বরং সীমাভাঙার "অকারণ" মুক্তির আনন্দে। "আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া, / বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।" তবে এ সব তত্ত্ব আলোচনা আপাতত স্থগিত থাক। আগে ব্যবসায়ী যুক্তিবাদের সুবিধার দিকটা আরও একটু বুঝে নেওয়া যাক। হিসাবি অহংবোধ যেমন অকারণ ভালবাসাকে মূল্য দিতে প্রস্তুত নয় তেমনই আবার সে অকারণ কলহকেও সমর্থন করে না। অকারণ কলহে স্বার্থের বৃদ্ধি ঘটে না, হানি ঘটবারই সমূহ সম্ভবনা। একই কারণে ব্যবসায়ী যুক্তির ঐতিহ্য কলহের নিষ্পত্তি করবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়েছে। এ সব নিশ্চয়ই তুচ্ছ বস্তু নয়।

এ দেশে বণিক সংস্কৃতি তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। আমাদের সমাজে ও ঐতিহ্যে তাই কিছু বড় ফাঁক থেকে গেছে। যা নিয়ে আমাদের গর্ব সেখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে আমাদের খর্বতা। "বসুধৈব কুটুম্বকম্" বাক্যটি আমরা উচ্চারণ করি গর্বের সঙ্গে। আত্মীয় কুটুম্বের প্রতি ভাব ভালবাসার কর্তব্য পালনের ব্যাপারে যদি বা আমাদের ত্রুটি থাকে তবু ওটা আমরা বুঝি, হৃদয়ের সায় আছে ওখানে। আর তারপরই আমরা চলে যাই এক লম্ফে বসুধার বিশাল বৃত্তে। মাঝখানে যে একটা সমাজ আছে, যাকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে পৌরসমাজ বা সিভিল সোসাইটি কিংবা অন্য কোনও নামে, তার উপযোগী নিয়ম ও নীতিবোধ আমাদের ঐতিহ্যে শিকড় গাড়তে পারেনি। পরিবার ও স্বজাতির প্রতি মমতা আমাদের ভিতর একটা স্বীকৃত মূল্যবোধ। তার বেশি আর কোনও ন্যায়বোধের—পক্ষপাতহীন সুবিচারের—প্রয়োজন আছে, এ কথা আমরা অন্তর থেকে গভীরভাবে অনুভব করি না। পৌরসমাজে অথবা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে দুর্নীতি প্রতিরোধ করবার মতো কোনও সংস্কৃতি এদেশে গড়ে ওঠেনি। ইউরোপে বাণিজ্যবিপ্লবের পাশে পাশে দেখা দিয়েছিল ধর্মীয় অন্য এক আন্দোলন। অমার্জনীয় কিছু আতিশয্য সত্ত্বেও পিউরিট্যান আন্দোলনের একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল নতুন যুগমানসের গঠনে, দুর্নীতিশোধক আন্দোলন বলে যার নাম দেওয়া যেতে পারে। এ দেশে তার প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল ব্রাহ্মআন্দোলনে। দেশ তাকে গ্রহণ করেনি। অভিজাত ও দলিত নির্বিশেষে আমাদের সমাজের সর্বস্তরে স্বজনপোষণ এখন স্বীকৃত নীতি। ইন্দিরা গান্ধী, জ্যোতি বসু, লালুপ্রসাদ সবাই এই নীতি মেনে চলেছেন। দেশ এটা মেনে নিয়েছে।

এরই সঙ্গে আবার যুক্ত হয়ে আছে প্রাচীন প্রভুত্ব পরায়ণতা, বিশেষত নারীপুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেটা তামসিকতার বিজয়স্তম্ভের মতো উপস্থিত। এই অসাম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনে রাজসিক কিংবা ব্যবসায়িক কোনও প্রচলিত ঐতিহ্যই যথেষ্ট নয়। সুনীতির এক সংকীর্ণ ঈর্ষাবিকৃত সংজ্ঞা এ দেশের সামাজমনকে অধিকার করে আছে। চরিত্রহীনা বলতে আমাদের সমাজে একটি ব্যাপারই বোঝায়, দেশের সম্পদের সুষম বিনিয়োগ ও সার্বিক হিতের সঙ্গে তার সম্পর্ক ক্ষীণ ও তর্কসাপেক্ষ। নিবিষ্ট সুনীতিজিজ্ঞাসা যুক্তিবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রে আজ স্থান পাবার যোগ্য। ঔদার্য ও ন্যায় বিচারের ভিতর কীভাবে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা যায় সেটাই প্রধান প্রশ্ন।

তার বাইরে আছে আরও নানা দার্শনিক চিন্তার অবকাশ। যেহেতু মানুষের অধ্যাত্মবোধ অহংবোধের মতোই অবধ্য কাজেই প্রশ্ন অনিবার্য, যুক্তির সঙ্গে অধ্যাত্মবোধের সমন্বয় সম্ভব কি না এবং সেটা কোন শর্তে? অহংবোধের উন্মোচনের মধ্যপথে প্রায়োগিক যুক্তিফর্চার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এটা হয়ে ওঠে এক জরুরি প্রশ্ন। আরও আছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানব চেতনার সম্বন্ধয় নিয়ে ভাবনা। এই সব তর্ক চলবে। তর্কটা কিন্তু শুধুই দার্শনিক নয়। জনজীবনের সঙ্গে আছে তার প্রগাঢ় সম্পর্ক। আত্মীয়সমাজের ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে বহু মানুষের মনে যে রিক্ততা, যে নিঃসঙ্গ তাবোধ বেড়ে উঠেছে তাকে রোধ করা যাবে না কেবল ভোগ্যপণ্যের প্রসার দিয়ে। আজকের পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ অসুখী ক্রয়ক্ষমতার অভাবে, আবার বহু মানুষ অসুস্থ ভোগ্যবস্তুর আতিশয্যে। এই ভাবে বেড়ে চলেছে এক ভয়াবহ দুর্দশা যার প্রকাশ ঘটছে কখনও অবাধ্য অবসাদগ্রস্ততায়, কখনও বিপথগামী বিঘ্নিষ্ট উত্তেজনায়। বিশ্বের ইতিহাসে বণিক-সংস্কৃতির সদর্থক অবদান সতর্কভাবে বুঝে নেবার পরই স্বীকার করে নিতে হয় তার নিদারুণ অসম্পূর্ণতা। তবেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে আজকের যুগচেতনায় দ্বান্দ্বিকতার বিশেষ রূপটি। দার্শনিক চিন্তাকে যোগ রক্ষা করতে হবে একদিকে চিরকালের কিছু মৌল প্রশ্নের সঙ্গে, অন্যদিকে সমকালের সংকটের সঙ্গে। দ্বন্দ্ব বেড়ে চলছে, প্রয়োজন জিজ্ঞাসু অনুত্তেজিত আলোচনা।

প্রবন্ধ

স্বার্থপরতার অর্থনীতি

দেবকুমার বসু

প্রবন্ধের শিরোনাম স্থির করতে উৎসাহ পেয়েছি বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ আকবর আলি খানের লেখা (২০০০) 'পরার্থপরতার অর্থনীতি' নামে বইটি থেকে। বাংলাভাষায় অর্থনীতির বিষয় নিয়ে এত সহজ ও উপভোগ্য ভাষায় রচনা চোখে পড়েনি। দান-খয়রাতির (altruism) মধ্যে পরার্থপরতার যে প্রকাশ, নব্যধ্রুপদী (neoclassical) অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখক তার বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু ড. খানের রচনা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। বর্তমান প্রবন্ধকারের উদ্দেশ্য পরার্থপরতার বিপরীত স্বার্থপরতা কি যুক্তিতে অর্থনীতির বিষয় হতে পারে এবং বর্তমান অর্থনীতিতে তার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা।

অর্থনীতির তত্ত্বে ব্যক্তি-স্বার্থের (self-interest) ভূমিকা সব সময়েই মুখ্য হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু সবসময়েই ব্যক্তি-স্বার্থকে একভাবে দেখা হয়নি। অর্থনীতির ইতিহাসে দেখা গেছে কোনও সময় ব্যক্তি-স্বার্থ স্বার্থ-রক্ষার অর্থে, কোনও সময়ে তা স্বার্থপরতার অর্থে সমাজে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অর্থনীতির তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক আগেকার সমাজেও মানুষ ব্যবহারিক জীবনে তার স্বার্থরক্ষার জন্য চেষ্টা করে এসেছে। কিন্তু তার মধ্যেও পারস্পরিক নির্ভরতার মধ্য দিয়ে অপরের স্বার্থ সম্বন্ধেও একটা চেতনা ছিল। প্রাকশিল্পায়নের যুগে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় দেখা যেত গ্রামবাসীরা নিজেদের বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনের সামগ্রী তৈরি করার জন্য এক ধরনের কাজের দায়িত্ব ভাগ করে নিচ্ছে। কাঠের আসবাবের দরকার মেটাত ছুতোরেরা। ছুতোরের কাপড়ের দরকার মেটাত তাঁতিরা। তাঁতির খাদ্য যোগান দিত কৃষকেরা। এই ধরনের পারস্পরিক নির্ভরতার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিল গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। যতদিন গ্রামগুলি দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিল, এই ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণতাই ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য। অবস্থাটা বদলে গেল মৌলিকভাবে যখন রেলগাড়ি চালু হল। রেল সহজেই এক্গ্রামের তৈরি পণ্য পৌঁছে দিল দূরের অনেক গ্রামে। সমস্ত গ্রামের বাজারগুলি যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হল এক বড় বাজারের। এই বাজারে কতগুলি বিশেষ চরিত্র ফুটে উঠল। এই বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে গ্রামের বাজারের মতন আর কোনও যোগাযোগ রইল না। কার পণ্য কোন গ্রামে কোন ক্রেতা কিনলেন আর জানা গেল না। কেনা-বেচার মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে এক জিনিসের এক দর ঠিক হয়ে গেল। এত বড় বাজারে গ্রামের একজন পণ্যপ্রস্তুতকারক যতটা নিজে তৈরি করত বাজারে মোট সরবরাহের তা সামান্য অংশ। কাজেই একজন ইচ্ছামতন দর বাড়িয়ে লাভ করতে পারবে না। এই অবস্থায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে এডাম স্মিথ উপস্থাপন করলেন অর্থনীতিতত্ত্বের মূলসূত্র, বাজারে প্রত্যেক পণ্যবিক্রেতা স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেকেরই নিজের আয় বাড়ে; ফলে সামগ্রিকভাবে সমাজের সকলেরই আয় বাড়ে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার মধ্য দিয়েই সাধন হয় সামাজিক স্বার্থ। স্মিথের মতে মাংস, রুটি, মদ যারা বিক্রি করে তারা প্রত্যেকেই নিজের স্বার্থে তা করে থাকে। তারা মানুষকে ভালবাসে বলে নয়, তারা নিজেদের ভালবাসে বলেই আমরা এগুলি পাই। তাদের নিজেদের সুবিধা হবে বলেই ক্রেতারা প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পেয়ে থাকেন।১

কিন্তু সমাজে অনেক বিষয়ই থাকতে পারে যা বাজারে কেনাবেচার উপায় নেই। যেমন রাস্তাঘাট, ব্রিজ, বাঁধ ইত্যাদি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যক্তিগত লাভের সুবিধার জন্য ব্যবসায়ীরা এগুলি করবেন তা ভাবা যেত না। স্মিথ এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তিনি বলেন এই সব বিষয়ে যেখানে জনসাধারণের স্বার্থ জড়িত আছে, সেখানে সরকারের একটা ভূমিকা থাকা দরকার; কারণ কোনও ব্যবসায়ীই এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেবে না। স্মিথ তাঁর অর্থনীতির সূত্রগুলিকে ব্যক্তিগত স্বার্থে বাজারি ব্যবস্থা এবং জনস্বার্থে সরকারি ব্যবস্থা, এই দুই অংশে ভাগ করলেন।২ পরবর্তীকালের অর্থনীতিবিদরা দ্বিতীয় অংশটি অর্থনীতির বিষয় হতে পারে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে বিজ্ঞানের যে অভাবনীয় স্ফুরণ, তত্ত্বের দিক থেকে নিউটনের সূত্র, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নিউকমেনের পাম্প, জেমস্ ওয়াটের বাষ্পীয় যান, রেলপথের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কল-কারখানার যে বিস্তার, সব মিলিয়ে শিল্প-বিপ্লবের গৌরবময় অধ্যায় রচনা হয়েছিল। তারই প্রভাবে কিছু অর্থনীতিবিদ অনুভব করলেন বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অর্থনীতির মূল সূত্রগুলি নতুন করে সাজানো দরকার। তাঁদের মতে বিজ্ঞান যেমন প্রকৃতির

নিয়মগুলিকে গণিতের যুক্তি অনুসরণ করে সূত্রাকারে উপস্থিত করেছে, অর্থনীতির মধ্যেও তেমনই মানবসমাজের নিয়মের সূত্রের প্রবর্তন করা সম্ভব। এই চিন্তার পথিকৃৎদের মধ্যে ছিলেন জেভনস, ভালরা (Walrus) (১৮৭৪) মেঙ্গার প্রভৃতি। অর্থনীতির তত্ত্বকে নিয়মের সূত্রে বাঁধার জন্য তাঁরা ধ্রুপদী অর্থনীতিকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করলেন। এই প্রসঙ্গেই স্মিথ অর্থনীতির উদ্দেশ্য যেভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন তা নিয়ে আপত্তি করলেন ভালরা। ভালরার মতে রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংগ্রহের কাজে ভালমন্দ বিচার বিবেচনা করার প্রয়োজন, এটা কিন্তু বিজ্ঞানের বিষয় হতে পারে না।৩ প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হল সত্যের অনুসন্ধান। অনুসন্ধানের কাজের ফলাফল ভাল কি মন্দ হবে সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীর উচিত সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা। অর্থনীতির প্রাথমিক কর্তব্য হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সত্যের অনুসন্ধান; রাষ্ট্রের জন্য রাজস্ব সংগ্রহ নয়। ভালরাই প্রথম এ পর্যন্ত রাজনীতি এবং অর্থনীতির মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্বীকৃত ছিল তার অবসান ঘটান। ভালরা গণিতের সমীকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বাজারগুলির সমন্বয়ের জন্য সহসমীকরণের (simultaneous equations) মাধ্যমে সাম্যাবস্থার শর্ত (conditions of equilibrium) নিরূপণ করেন। অর্থনীতিতে এই নতুন চিন্তাধারাকে নব্যধ্রুপদী অর্থনীতি (neoclassical economics) বলে অভিহিত করা হয়। এই সময় থেকেই রাজনীতি (political science) এবং অর্থনীতিকে (economic science) বিজ্ঞানের দু'টি ভিন্ন শাখা হিসাবে গণ্য করা হয়। এই অবস্থায় প্রশ্ন উঠল অর্থনীতিতে নৈতিক বিচারের কোনও সুযোগ থাকবে কি না। ১৯৩৫ সালে লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিকসের অধ্যাপক লাওনেল রবিন্স পরিষ্কার মত প্রকাশ করলেন, নীতির বিষয় এবং অর্থনীতির বিষয় দু'টির ক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা। এদের এক করে ফেলার কোনও অর্থ হয় না।

নয়া অর্থনীতিতে এ পর্যন্ত অর্থনীতির মধ্যে মানবিকতাবোধের যে ভূমিকা ছিল তার প্রয়োজনীয়তা আর রইল না। নব্য ধ্রুপদীবাদের যুক্তিতে সব মানুষই সমাজে তাদের নিজস্ব স্বার্থরক্ষার জন্য কাজ করেন। এর থেকে সিদ্ধান্ত হল যে সমস্ত মানুষ যদি ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে সব থেকে উৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করেন, তা হলে সমাজের সকলের পক্ষেও তা সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হবে। এই সিদ্ধান্ত যে সঠিক তা প্রমাণ করা গেল গণিতের সমীকরণের মধ্য দিয়ে, যাতে সাধারণ বিজ্ঞানের পদ্ধতির সঙ্গে তা তুলনীয় হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন কয়েকটি সরল অনুমানের যা অনুসরণ করে গাণিতিক সূত্রগুলি প্রতিষ্ঠা করা যায়। এর মধ্যে অন্যতম অনুমান হল সমস্ত মানুষই যুক্তিনির্ভর, তারা যে কাজই করে তা নিজের স্বার্থ ভেবেই করে থাকে। সেই জন্য সমষ্টির জন্য আলাদা করে চিন্তা না করলেও ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণ করতে গিয়ে সমষ্টির স্বার্থও পূরণ করা হবে। এই প্রসঙ্গে অমর্ত্য সেন (১৯৮৭) বলেন সব মানুষ যুক্তিনির্ভর এই কথাটা মেনে নিলে বাস্তবে যা ঘটছে সেটাই মেনে নিতে হয়। অর্থাৎ অর্থনীতির নতুন করে কিছু ব্যাখ্যা করার থাকে না।

নব্য ধ্রুপদী অর্থনীতির হিসাবে যুক্তিনির্ভর মানুষের পক্ষে ব্যক্তিস্বার্থের বাইরে সামাজিক স্বার্থে অপরের জন্য কিছু করা সম্ভব নয়। তত্ত্বের দিক থেকে ভালরা সহসমীকরণের সাহায্যে একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো (complete system) এমনভাবে রচনা করলেন যাতে একটি সুন্দর সাম্যাবস্থার (equilibrium) সৃষ্টি হয়। এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কোনও সমষ্টিগত সামাজিক প্রভাব এখানে কাজ করে না। এই জন্য রাষ্ট্র এখানে অনুপস্থিত। পরবর্তীকালে নব্য ধ্রুপদী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে নিমরাজিভাবে গ্রহণ করা হয়েছে, যার কিছু অংশের বিশ্লেষণ আকবর আলি খান তাঁর গ্রন্থে করেছেন। কিন্তু যুক্তির দিক থেকে এই অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের কোনও ভূমিকা না থাকলে আপত্তি করার কিছু নেই। সমষ্টিগত স্বার্থের বিষয় এই অর্থনীতির বাইরে থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু স্মিথ যখন ব্যক্তি স্বার্থের প্রয়োজনে বাজারে পণ্য বিক্রয়ের নিয়মের সূত্র রচনা করেন, তিনি তখনই বলেছিলেন এর অর্থ এই নয় যে অপরের প্রতি সহানুভূতি সম্পর্কে সমাজে কারও কোনও নৈতিক দায়িত্ব থাকবে না। সেইজন্য বাজারের বাইরেও অর্থনীতির একটা ভূমিকা থাকতে পারে। এই জন্যই তিনি অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকার কথা বলেছিলেন। নতুন অর্থনীতির প্রবক্তারা অর্থনীতিকে সামাজিক দায়বদ্ধতার থেকে মুক্তি দিলেন। ব্যক্তিস্বার্থের নির্দেশে পরিচালিত প্রতিযোগিতামূলক বাজারই অর্থনীতির মূল কাঠামো হয়ে রইল। এর একটা পরিণতি হল সমাজে সাধারণের ব্যবহার্য সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব থেকেও অর্থনীতির অব্যাহতি।

সমাজের যে সব সম্পদে সকলের সমান অধিকার, তার পরিণতি নব্য অর্থনীতির ব্যাখ্যায় কীরকম হতে পারে তা দেখালেন গ্যারেট হার্ডিন (১৯৬৮)। ব্যক্তিস্বার্থই যদি একমাত্র শর্ত হয়, তা হলে সাধারণ গোচারণভূমিতে প্রত্যেকেই নিজস্ব স্বার্থে সব থেকে বেশি সংখ্যায় পশু চরাবার চেষ্টা করবে। এর ফলে জমির ওপর ক্রমাগত চাপ বাড়তে থাকলে শেষে তা আর ব্যবহারের উপযোগী থাকবে না। হার্ডিনের প্রবন্ধ,

The Tragedy of Commons অর্থনীতিবিদ ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাধারণের ব্যবহার্য সম্পদের বিয়োগান্ত পরিণতির নিদর্শন হিসাবে বারবার আলোচিত হচ্ছে। শ্মিথ বলেছিলেন এই ধরনের ক্ষেত্রে যেখানে বাজারের কোনও ভূমিকা নেই, সেখানে জনস্বার্থে রাষ্ট্রকে উদ্যোগ নিয়ে ব্যবস্থা করতে হবে। নব্য ধ্রুপদীদের মতে তা হবে অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নষ্ট করার পথ; কাজেই ব্যক্তিগত স্বার্থ বজায় রেখেই চলতে হবে। এই নীতি অনুসরণ করে বহু কনজ সম্পদ, সামুদ্রিক প্রাণী, যেমন তিমি মাছ, টুনা মাছ, ইত্যাদি ধ্বংস হয়ে আসছে। এই জন্য বলা যায় ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার বিষয়টা রূপান্তরিত হয়ে গেল নিছক স্বার্থপরতায়। ধ্রুপদী অর্থনীতি থেকে নব্য ধ্রুপদী অর্থনীতি যে পরিবর্তন আনল, তা হল একদিকে সমষ্টির স্বার্থকে বর্জন করে শুধুমাত্র ব্যক্তির স্বার্থে অর্থনীতিকে সীমাবদ্ধ করা। ঠিক একই সময়ে অন্য একদিক থেকে প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির মূল ভিতকেই নাড়িয়ে দিচ্ছিল একচেটিয়া পুঁজিপতির শক্তি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার শর্ত লঙ্ঘন করে কিছু ব্যবসায়ী অসৎ উপায় অবলম্বন করে প্রতিদ্বন্দ্বীদের ক্ষতি করে বাজারে নিজেদের অংশ বৃদ্ধি করে বড় আকারে কর্পোরেশনগুলির সৃষ্টি করল।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে অর্থনীতির বিভিন্ন অংশে, ইস্পাত, তেল, ঔষধ ও রসায়ন, খাদ্য ও পানীয় এইসব ক্ষেত্রে বাজারে প্রধান্য প্রতিষ্ঠা করল একচেটিয়া পুঁজির প্রতিনিধি বড় বড় কর্পোরেশনগুলি। স্বাধীন প্রতিযোগিতার অন্যতম শর্ত যে কারও পক্ষে এককভাবে বাজারে পণ্যের দর স্থির করা সম্ভব নয় তা উপেক্ষা করে এরা নিজেদের লভ্যাংশের কথা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ স্তরে দর নির্ধারণ করার ক্ষমতা অর্জন করল। স্বাধীন প্রতিযোগিতামূলক বাজারের এইখানেই অবসান। বিষয়টা প্রকটভাবে দেখা যায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যবস্থায়। যে সব ক্ষেত্রে একচেটিয়া পুঁজি তাদের আসর করে নিয়েছে, যেমন তেল, রসায়ন, ইস্পাত, বিমান, এমনকী খাদ্য ও পানীয়, সেখানে কোনও নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীকে তারা টিকতে দেয় না। বড় কর্পোরেশনগুলি বিভিন্ন দেশে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানগুলি কিনে নিয়ে সৃষ্টি করে বহুজাতিক কর্পোরেশন। বিভিন্ন কৌশলে আইনকে ফাঁকি দিয়ে এরা বাজারে স্বাধীন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। তাই এদের স্বার্থসিদ্ধি স্বার্থপরতারই প্রকাশ। এইভাবেই উত্তরণ হল স্বার্থরক্ষা (Self-interest) থেকে স্বার্থপরতায় (Selfish interest)। তাই এই অর্থনীতিকে বলা যায় স্বার্থপরতার অর্থনীতি।

সাধারণের সম্পদকে উপেক্ষা করার মধ্য দিয়ে নব্যধ্রুপদী অর্থনীতিতে সূচনা হল প্রাকৃতিক সম্পদকে উপেক্ষা করার রীতি। অর্থনীতির সঙ্গে প্রকৃতির বিচ্ছিন্নতার এখান থেকেই সূত্রপাত। নব্য ধ্রুপদী অর্থনীতি যেহেতু সম্পূর্ণভবে বাজার নির্ভর, যেখানে বাজার নেই সেখানে কোনও কর্তব্যও নেই। কারখানার ধোঁয়া যখন আকাশে ধোঁয়ার আস্তরণ তৈরি করে পৃথিবীর উত্তাপ বৃদ্ধির কারণ হয় এবং তা থেকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও প্রভাবিত হয়, আধুনিক অর্থনীতিতে তার প্রতিবিধান কঠিন। কারণ ধোঁয়া বাজারে কেনাবেচা হয় না। এই অবস্থায় রাষ্ট্রকেই জনস্বার্থে ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিনিষেধ আরোপ করতে হয়। কিন্তু নব্য অর্থনীতি ব্যবসায়িক বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপ অনুমোদন করে না।

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশের ফলে বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়, প্রাকৃতিক সম্পদ যা শিল্পায়নের দরুণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার পরিবর্তে কৃত্রিম উপায়ে সেগুলি তৈরি করা। এ বিষয়ে কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্যও লাভ করা যায়। এরই প্রতিক্রিয়ায় নতুন অর্থনীতির প্রবক্তারা দাবি করেন কোনও প্রাকৃতিক সম্পদ শেষ হয়ে গেলেও আর আশঙ্কা নেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের পরিবর্তে কোনও না কোনও কৃত্রিম পদার্থ তৈরি করতে পারে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা মত আছে যে যেহেতু পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী কোনও বস্তুর বিনাশ নেই, পদার্থের ভরের (mass) পরিমাণ একই থাকে, তাই ব্যবহারের ফলে বস্তুর যেটুকু ক্ষয় হয় তা ছড়িয়ে থাকে পৃথিবীর আকাশে জলে জমিতে। প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে সেগুলিকে আবার জড়ো করে উৎপাদনের কাজে লাগানো যাবে। এই চিন্তায় একটা ফাঁক আছে। পদার্থবিজ্ঞানের অপর একটি নিয়ম অনুযায়ী যে কোনও কাজ করতে প্রয়োজন হয় শক্তির (energy)। শক্তির প্রয়োগের একটি ধর্ম হল যে কোনও কাজের সময় শক্তির এক অংশ উত্তাপের আকারে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই শক্তিকে আর ফিরে পাওয়া যায় না। যদিও সমস্ত শক্তির উৎস সূর্য সমানে পৃথিবীর উপর অফুরন্ত তাপশক্তি বর্ষণ করে চলেছে, তার সামান্য অংশই মানুষ ব্যবহার করতে পেরেছে। পরিবেশের মধ্যে ছড়ানো ক্ষয়প্রাপ্ত বস্তুকে সংগ্রহ করতে নতুন পদার্থে পরিণত করতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন, তত্ত্বের দিক থেকে সম্ভব হলেও তার বাস্তব সম্ভাবনা অর্থনীতির হিসাবে আসে না।

সমাজে উৎপাদনব্যবস্থা প্রকৃতির উপর আর এক ভাবে নির্ভর করে। প্রকৃতির বাস্তুব্যবস্থায় (ecosystem) জল, বাতাস এবং জৈবপদার্থের যে সমাবেশ তার সাহায্য ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। বাস্তুব্যবস্থার এই পরিষেবা বাদ দিয়ে সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থাও চলতে পারে না। অথচ অর্থনৈতিক উন্নতির চাপে প্রকৃতির এই সম্পদের সমষ্টি (stock of natural resources) ক্রমশই কমে আসছে। মানবসভ্যতার আদিপর্বে মানুষ প্রকৃতির জৈবসম্পদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশ হয়ে ছিল। সময়ের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সাহায্যে ক্রমবর্ধমান মানুষ প্রকৃতির সম্পদের উপর আধিপত্য বিস্তার করল। জৈবসম্পদের বহু অংশ তারা ব্যবহার করল উৎপাদন ও ভোগের জন্য। একদিকে মানুষ উৎপাদনের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষ করে চলে, অপরদিকে উৎপাদনব্যবস্থায় যে দূষণের সৃষ্টি হয় তা সুস্থ পরিবেশকে নষ্ট করে। ক্রমাগত পরিমণ্ডলে বিষাক্ত গ্যাস এবং জলে রাসায়নিক বর্জ্যপদার্থ যুক্ত হবার ফলে প্রকৃতির দূষণ পরিশোধনের ক্ষমতাও কমে আসছে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে জমির ব্যাবহারে পরিবর্তন হচ্ছে কৃষি, শিল্প ও নগরায়নের স্বার্থে। জৈব সম্পদের উপর চাপ পড়ার ফলে অবলুপ্ত হচ্ছে বহু প্রজাতির উদ্ভিদ, শস্য ও সমুদ্রের প্রাণী। বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে জানা গেছে মানুষ কয়েক যুগ ধরে ৭০০০ প্রজাতির উদ্ভিদ ও শস্য ব্যবহার করে আসছিল। এখন মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যের ৯০ শতাংশ হল মাত্র ২০টি প্রজাতির শস্য, যা এখনও টিকে আছে। এর মধ্যে অর্ধেকের মতন, শতাংশ হিসাবে ৪৫ এর বেশি, হল তিনটি শস্য—গম, ধান এবং জোয়ার। সমাজের জৈবসম্পদের বিষয়ে আমরা গার্ডিনের সাধারণ সম্পদের বিপদের (tragedy of the commons) মুখোমুখি এসে গেছি। বাজারি অর্থনীতিতে মানুষ নিজের জীবনকালের বাইরে সম্ভাব্য পরিণতির কথা বিবেচনা করতে চায় না। সুদূরপ্রসারী যে প্রতিক্রিয়া প্রকৃতিতে সৃষ্টি হচ্ছে, তার প্রতিফল কয়েক পুরুষ পরের প্রজন্মের উপর পড়বে, যেমন আমরা আজ বাতাসে কার্বনডাই অক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি গ্যাসের প্রভাবে উত্তপ্ত পৃথিবীর পরিবেশে প্রবেশ করছি। জৈবসম্পদ, পরিমণ্ডল সবই সমাজের সাধারণ সম্পদ। একে রক্ষা করতে হলে আধুনিক অর্থনীতিকে স্বার্থপরতার বাইরে চিন্তা করতে হবে।

পাদটীকা

১। " It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their humainty but to their self-love, and never talk to them of our own necessities but of their advantages."

Adam Smith. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.1776. Modern Library edn. 1973. p14

২। "Political economy, considered as a branch of the science of a statesman or legislator, proposes two distinct objects: first, to provide a plentiful revenue or subsistence for the people, or more properly to enable them to provide such a revenue or subsistence for themeselves, and secondly, to supply the state or common-wealth with a revenue sufficient for the public services. It proposes to enrich both the people and the sovereign."

Adam Smith.ibid

৩। "To provide a plentiful revenue for the people and to supply the state with a sufficient income are incentertably most worthy aims. If political economy helps to achieve this double purpose, it renders a signal service. But it seems to me that this is not, strictly speaking, the object of science. Indeed the distinguishing characteristic of a science is the complete indifference to consequences, good or bad, with which it carries the pursuit of pure truth....It must be pointed out that political economy is not quite what Adam Smith thought. The primary concern of the economy is not to provide a plentiful revenue for the people or to supply the state with an adequate income, but to pursue and master purely sceintific truths."

Leon Walras, Elements of Pure Economics. 1874. (London 1954. p 52)

গ্রন্থপঞ্জি

১। আকবর আলি খান (২০০০)। পরার্থপরতার অর্থনীতি, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

২। Leon Walras. 1954. Elements of Pure Economics. Trans. by W.Jaffe. George Allen & Unwin. London (original publication. 1874)

৩। Lionel Robbins. 1935. An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, 2nd edition : London, Macmillan

৪। Amartya Sen. 1987. On Ethics and Economics. Oxford, Oxford University Press.

৫। Garett Hardin. 1968. The Tragedy of Commons. Science, Vol 162. 1243-1248. 13 December 1968.

জিরাফের ভাষা

ভাস্কর চক্রবর্তী

৪

প্রথম দেখেছিলাম নিশ্চিত পাহাড়ি দেশে তোমাকে সুন্দরী।
সে দেশে কি শুধুই কুয়াশা ছিল? শুধুই শীতের বৃষ্টি? হিম?
স্কার্ট পরে ছিলে তুমি একষট্টি সালের জুন মাসে—
কী তোফা সৌন্দর্য তুমি কী যে উপহার তুমি রেখেছিলে বুক ভর্তি করে!
আজ শুধু একটা স্তব্ধতা আর দুটো-তিনটে স্তব্ধতার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি।

৫

আমি কি নিজেই তবে ইচ্ছাধীন এসেছি এতটা দূরে সরে?
এটা ঠিক, মুখ দিয়ে ছোটে না রক্ত শুধু—
ক্ষতগুলো দেখা যায় না, ক্ষতিগুলো উদাসীনতার বোবা শিশু—
এ ছাড়া সমস্ত কিছু স্বাভাবিক আমাদের—
গাছপালা সবুজ আর আকাশ প্রশান্ত নীল, মুখেরা ফ্যাকাশে।

শুশ্রূষা

সব্যসাচী দেব

তুমি যদি আজ এই রাত্রির শিয়রে এসে নিশ্চুপ দাঁড়াও
যদি দেখো আকাশ ভরানো ওই অন্ধকার নেমে আসে দ্রুত
শরীর ছোঁয়ার ছলে, যদি দেখো হাইওয়ে ডুবে যাচ্ছে ঘন
মেঘের আড়ালে, যদি তারপর আরও কিছু কথা বাকি থাকে
সে-কথা কি আর ফিরে বলা হবে! ফিরে পাবে তুমি কি কখনও
তোমার নিজস্ব ভাষা! নাকি বারবার অন্ধকার ঢুকে যাবে
তোমার শিরার মধ্যে!

শুশ্রূষা খুঁজবে তবে কীভাবে কোথায়!
দেখো ওই তমস্বিনী তার দীর্ঘ জটায় জটায় ঢেকে রাখে
সমস্ত সংলাপ আর তার যত গূঢ় উচ্চারণ। দেখো ওই
মেঘের ফাটল থেকে নেমে আসে প্রেতছায়া, আকুল কুন্তলা
তার দীর্ঘ চুম্বনের আকুল আশ্লেষ দিয়ে কাছে টেনে নেয়—
পটভূমি জুড়ে শুধু শোনা যায় বাদুড়ের ডানার ঝাপটানি।

রাত্রির শিয়রে শুধু চাঁদ ডুবে যায়। জ্যোৎস্নাহীন শব্দহীন
স্রোতে ভাসে তোমার হারানো স্বর। আজ তবে মৃত্যু-উৎসব!

গুপী গাইন, বাঘা বাইন

গণেশ ভট্টাচার্য

কোন এক স্বপ্ন থেকে উঠে এলাম—
গাছের পাতার ফাঁকে সবুজ মাথা নাড়ল
নিভৃত ধানখেত আমার পাশে বসল চুপ করে
একটি পাখি উড়তে উড়তে চলে গেল
এক সংসারী মানুষকে আমার
বাউল মনে হল।

তার পর
গভীর গর্ত ছেড়ে উঠে এলাম—
শুনেছি, আকাশে এখন আর শান্তি নেই
সেখানেও বোমারু বিমান, মহাকাশযান, কিছু মানুষের
উচ্চাকাঙ্ক্ষা ঘুরে বেড়ায়; সেখানেও সুনীল, গহন বাতাস
বলে কিছু নেই; ক্রমশ জঞ্জাল জমে তৈরি
হচ্ছে দূষণ।

যেন এক লজ্জা থেকে উঠে এলাম—
দেখলাম, সময়ের দেহে লেগে যাচ্ছে
যে কঠিন রক্ত, তা উপড়ে ফেলার কোনও মন্ত্র
আমার জানা নেই; আমি শুধু দীর্ঘশ্বাস
ফেলতে পারি, আমি শুধু কাঁদতে পারি।
কোনও ভূতের রাজার বর
আমার কাছে নেই
যা দিয়ে আমি
এনে দিতে পারি শান্তি পৃথিবীতে,
মুছে দিতে পারি সমস্ত অন্যায়।

জলদাপাড়া

বেণু দত্তরায়

এখানে ছুটির দিনে সকালে মেঘের আনাগোনা
এখানে আকাশিনীলে শুনশান অরণ্য নিঝুম
এখানে সবুজপাতা ক্লোরোফিলে স্নান করে ওঠে
এখানে সূর্যের রঙে চারিদিকে মুগ্ধ কাঁচা সোনা
ভোরের ভাঙায় ঘন-ঘুম
এ-সকাল স্বপ্ন নিয়ে খুশি খুশি চিঠি দিতে ছোটে

এখানে নিঃশব্দ ছুটি বনে-বনে ছড়ায় মোহর
পাতায় পাতায় নীল নির্জনতা সেতারের সুর
জলের জলসা ছুঁয়ে গান লেখে জ্যোছনার রঙ
গণ্ডারের চোখে কাঁপে শাল-বনে বিমুগ্ধ প্রহর
ঘাস-ঝোপ ঝিল-ঝোর।এবল্মফু ব
সবুজ জলের নদী বাতাসে নিঃশব্দ নাম ঃ হলঙ্ হলঙ্

কলকাতা থেকে ট্রেনে চাকায়-চাকায় উর্দ্ধশ্বাস
শব্দ নিয়ে ছুটে-ছুটে একটানা গ্রীষ্মের দুপুরে
এখানে এলাম, এই আকাশের মুগ্ধ প্রাণায়াম
অনায়াস দিনরাত্রি কী গভীর প্রসন্ন সুহাস
শান্তি ও শুদ্ধতা নিয়ে নিকটে কি দূরে—
এখানে বাতাসে ভাসে জলদাপাড়া জলদাপাড়া নাম

বাড়ি

বিকাশ নায়ক

যে-বাড়িটা আকাশ ছোঁয়া
যে-বাড়িটা সবার থেকে বড়—
তারই পাশে উড়ছে ধোঁয়া
তারই পাশে হাড়কাঁপুনি শীতে
ফুটপাতিয়া বাচ্চা জড়োসড়ো...

বাড়ির পাশে সকাল-বিকেল জীবন বাড়াবাড়ি—
অসহ্য সব
ওদের কি আর মানুষ বলা চলে!
তবু ওদের খিদের জ্বালা গোটায় না পাততাড়ি...
অসহ্য শব—
কোন বেআদব মৃতের কথা বলে?

মৃতের পাশে ইটের বাড়ি আকাশ গিলে খায়
আকাশ থেকে বিকেলবেলা আলোর রোশনাই
বাড়ির পাশে ধোঁয়ায় লেগে
দারুণ পাক খায়
পুবের দিকে পিছন ফিরে
ফিকের দিকে যায়—

বলে, আর যাব না বাড়ি
আজ বাড়ির সাথে আড়ি!

সময়

নন্দিতা সেন বন্দ্যোপাধ্যায়

সময় ঢুকে পড়ছে আরও
রহস্যময় হয়ে।
ঘন সকাল, মধ্যদুপুর, নিথর রাত্রিবেলা।
দিন চলে যায় দিনের মতো
একটু একটু সময় সাথে নিয়ে।
সাজিয়ে রাখছে নিজের মতো দৃশ্যাবলি দিয়ে।
ছাতার মতো সবুজ গাছ, দীঘল বাড়ি,
অতল গভীর জল।
ঘন সকাল, মধ্য দুপুর, নিথর রাত্রিবেলা।

গোল্লাছুট

সৌমনা দাশগুপ্ত

সূর্যের সঙ্গে রঙ রঙ খেলা। মেঘডুব
একবুক অবরুদ্ধ ফোকাস। গূঢ় উত্তাপে
গলে যায় তেলরঙ, ঝমঝম ঝিমঝিম
পা—সূর্যের সঙ্গে আজ গভীর খেলা।

কিন্তু ফাঁকি দিচ্ছ। এক নিঃশ্বাসে বুড়ি ছোঁবে।
চোরাদম আনাচে কানাচে। ফাঁকি দিচ্ছ।
আমি কিন্তু শুনতে পাচ্ছি এক গর্ত জলে তোমার
ছলাৎ। উল্লাস। তাপতাপ রঙরঙ, মাঝখানে
প্রশস্ত সূর্য—গোল্লা ছুট্ ছুট্ ছুট্।

'গুজরাট নগর পত্তন' অথবা 'নরেন জগৎ মাতাবে'

সেবন্তী ঘোষ

ছিল চাঁদ, হাঁড়ি ফুটা, গলিয়াছে পানি
আমি পথ, সে গোকুলে বাড়ে হিন্দুয়ানি।

অন্ধ তারা, দ্বন্দ্ব চোখে, হিংসা খাবি খায়
চিল নামে, দ্বিপ্রহরে, দালান-কোঠায়।

এ মন, বিপন্ন—সুখ নাই—শুধু চাই
সুখের সহজ পথ—বলি বা জবাই

এক ফোঁড়ে রক্ত ছিটে, লাল-লাল ঢেউ
ভ্রূণটিরে ছিঁড়ে নিল ত্রিশূলেতে কেউ।

হিংসা গোপন নেই, লজ্জা নাহি তাতে
সকলি 'উহা'-র দোষ, জানে সে আঘাতে।

'রমণী' রমণ অর্থে, 'সংঘ' মানে দল
কে-না-জানে জনগণ 'জননসম্বল'!

মন্দে দিও না কান, যে দেয় সে পাপী
বলেছেন শ্রীনরেন ঃ বেজায় আলাপি।

তোমা বিনে কানু নেই, তোমা বিনে গীত
এপিটাফে ভরে যায়, নগরীপিরিত।

**কবিকঙ্কন মুকুন্দ-র কালকেতু-ফুল্লরার উপাখ্যানের একটি অধ্যায়ের নাম— 'গুজরাট নগর পত্তন'; এবং পরমহংসদেব তাঁর প্রিয় শিষ্য সম্বর্ধে একবার বলেছিলেন— 'নরেন জগৎ মাতাবে।' অবশ্য, দু'টিই ভিন্ন অর্থে।

মৃত্যুর ফেরিওয়ালা

অভিমন্যু সারথি

কাল মন্টু চলে গেল।'

জানি।'

'পুণ্যাত্মা লোক ছিল ভাই।'

'যেমন?'

'সকালে ঘুম থেকে উঠে চা খেয়েছে, ব্রাস করেছে, মর্নিং ওয়াক করে ফিরে এসে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে পড়ে গেল।'

'ডাক্তার ডাকা হয়েছিল?'

'সেই সুযোগ দিলে তো, কী চমৎকার মৃত্যু ভাই, কোনও অসুখ হল না, বিছানায় শুয়ে থাকতে হল না, পূর্বজন্মে কর্ম ভাল করেছিল।'

'আর এই জন্মে কী করত?'

'খুব জপ-তপ করত।'

'ওর মর্নিং-ওয়াকে বেরনো নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে বাজারে অনেক গল্পো রটেছিল।'

'হ্যাঁ, সে সব আমিও জানি।'

'কাল ফিরে আসার পরে বউ তাই নিয়ে ওকে নাকি খুব ধমকেছিল, ওর ছেলেও বাবার শুধু গায়ে হাত দেয়নি।'

'তারাপদ, তুমি একটু বেশিই জেনেছ। কিংবা কেউ তোমাকে বাড়িয়ে বলেছে।'

'গঙ্গার ধারের এই সেলুনে কত খদ্দেরই তো আসে। আর তোমরা যাই কর না কেন গোপন থাকে না।'

'মন্টু কিন্তু ধার্মিক ছিল বরাবর।'

'ধার্মিক আমরা সকলেই। তুমি আমি কম ধার্মিক?'

'ধর্ম করলে শরীরে তার চিহ্ন থাকে। আমাদের শরীরে সেই চিহ্ন কই।'

'তার মানে?'

'এই দেখো না শীত না পড়তেই বাতের ব্যথায় কাবু। হাঁটু চনটন করে।'

'তাও তো বেশ চলছ ফিরছ। এখনওতো নিমন্ত্রণ বাড়ি পেলে ছাড় না।'

'সেটা অবশ্য ঠিক বলেছ। মন্টুদের বাড়িতে এই কাঁদন যাতায়াতটা রাখতে হবে,'

'কেন, শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে যাতে ওর ছেলেরা তোমাকে বাদ না দেয়।'

'সে তো এমনিতেই করবে। তুমি, আমি, সুখেন—মন্টুর ছেলেবেলার বন্ধু।'

'বাবার ছেলেবেলার বন্ধুদের ওরা কেন মনে রাখবে?'

'বাঃ সেটা কেমন কথা। বাবার মৃত্যুর পরে কাজ— সেখানে তো আমরাই প্রধান। আমি তো তোমার কথাও বলে এসেছি।'

'আমার কথা আবার কী বললে?'

'বললাম ওর ছেলে কাজলকে ক্ষৌরকার্যের কাজটা যেন তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দিয়ে না করায়।'

'সে সব তুমি আবার বলতে গেলে কেন?'

'জোর খাওয়া দাওয়া হবে। মাছ-ছোঁয়ানোর দিন তো অনেক রকমের মাছ হবে।'

'একটা দাঁতও তো ঠিক নেই। কাঁটা বেছে মাছ খেতে পারবে?'

'পেটে খিদে থাকলে মানুষ সব পারে, যত বয়স হচ্ছে আমার খিদেও বাড়ছে। খিদে পেলে আমি মনে হয় আগুনও খেতে পারি।'

'আমার তো খিদে হয় না। নিয়মিত পায়খানা হয় না।'

'তোমার ছেলে রোজগার করে, মিলিটারিতে আছে, সেলুনে আসছ অভ্যাসবশত, তেমন অভাব তো আর নেই।'

'ছেলে তো আসতে না করে। বাড়ি বসে করবটা কী। থাকলেই অশান্তি। তারপর আজকালকার ছোকরাদের ওপর ভরসা কতটুকু।

'সেটা ঠিকই বলেছ, রবিনবাবুদের বাড়িতে এখন কে থাকে?'

'রবিনবাবুর তো এক মেয়ে। সেই জামাইয়ের এক ভাগ্নে।

'ওরা কোথায় গেলেন—রবিনবাবু আর কণা দিদিমণি!'

'হিন্দমোটরে মেয়ের কাছে। জামাই তো কলেজের প্রফেসর।'

' তা জানি। মীরাও তো লেখাপড়ায় ভাল ছিল। ওরা কেমন আছেন—খবরটবর পাও?'

'তার চেয়ে বল না, জানতে চাও আর কতদিন আছে?'

'এ-কেমন ধারা কথা। তুমি বড় অন্য অর্থ করতে পার।'

'তুমি তো হে মৃত্যুর ফেরিওয়ালা। যেখানে মৃত্যুর খবর সেখানেই তুমি।'

'তা হলে আমি তো শকুন।'

'হ্যাঁ। তাই বটে। তবে উড়তে পার না এই যা। কতজনের শ্রাদ্ধ আর খাবে?'

'জানো খিদে যখন বেসামাল করে ফেলে মৃত্যুকে খুব ডাকি। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, ভালবাসা-বেদনা সব ভুলেই মৃত্যুকে ডাকি।'

'আসছে না তো। ফাঁক থেকে যায় যে। এখনও তো বেশ খেতে পার।'

'এর জন্যই তো কেউ আমাকে বিয়ে বাড়িতে ডাকে না। হরির একমাত্র মেয়ের বিয়েতে পাত থেকে তুলে দিল যে।'

'আজকাল তো ক্যাটারার। গুণতি খাবার। পাইনবাড়ির বিয়ে মনে আছে?'

'ওঃ সে ভোলা যায়! লোকের যেন সমুদ্র। তুমিও তো ছিলে।'

'আমিই তো ক্ষৌরকার্য করেছি। বনেদি বটে। একবারও বুঝতে দেয়নি আমি কী কাজ করতে গেছি।'

'জাত বড়লোক।'

'ঠিক বলেছ। তবে বিয়ে বাড়িতে আমাকে কেউ নিমন্ত্রণ করে না। হরির বাড়িতে কিন্তু আমার ডাক ছিল।'

'তা বলতে পারলে না? হরিকেও তো ডাকতে পারতে।'

'সে তখন বরযাত্রী নিয়ে ব্যস্ত। আর উপহারও তো নিতে পারিনি। সেটা থাকলে একটা জব্বর প্রমাণ হত।'

'টিউশনি আছে কয়েকটা?'

'সবই গেছে। নতুন সিলেবাস। সব সময় বদলাচ্ছে। আমরা সত্যিই পড়াতে পারি না।'

'এত বদল করে ঘোড়ার ডিম কী হচ্ছে।'

'আমার ছেলেরাও তো বদল চেয়েছিল, কী হল?'

'সোনার টুকরো ছেলে তোমার। কী ব্যবহার। আজও মনে গেঁথে আছে।'

'তুমি ভালবাসতে তাই মনে আছে। কেউ মনে রাখেনি। যারা মনে করে তারা এখন বলে, গুন্ডামি করে প্রাণ দিয়েছে।'

'কী চেয়েছিল ওরা?'

'এই পরিবর্তন। সবাই সমান হবে। এই যে তুমি আমায় একটু আগে বললে না "মৃত্যুর ফেরিওয়ালা।" ওরা ছিল সেই "মৃত্যুর ফেরিওয়ালা।"

'বেঁচে থাকলে তোমার এই দশা হত! কলকাতার খুব নাম করা কলেজেই তো পড়ত।'

'প্রেসিডেন্সি কলেজ, সুভাষ বোস যেখানে পড়তেন।'

'মাথাটা বিগড়ে গেল কেন?'

'আগুনখেকো রাজনীতি।'

'অথচ কী অমায়িক কথাবার্তা।'

'এত শ্রাদ্ধ বাড়িতে যাই কেন জানো। ওর লাশও তো দেখিনি। খিদের জন্যই যাই। বিয়েবাড়িতে ডাকে না বলেও যাই। কিন্তু সেই সঙ্গে মৃত ছেলেটাকেও মৃত্যু-নদী পার করে দিই। মনে মনে বলি ওর আত্মা শুদ্ধ হোক।'

'ওর আত্মা শুদ্ধই আছে।'

'জপ-তপ করত না যে। দেবতা মানত না।'

'মানুষকে ভালবাসত তো। বদল-টদল বুঝি না। স্বার্থপর ছিল না। আমাকেও বলত, "কাকা—আমরা যদি সফল হই, তুমিও কাজের ঠিক পারিশ্রমিক পাবে"।'

'পারল না তো। নিজেই তো মৃত্যুর গহ্বরে চলে গেল।'

'তুমি বলছিলে না মন্টু পুণ্যাত্মা—তাই কষ্ট পেল না। এটা ঠিক নয়। বরং মানুষের ভাল যারা চায় কষ্ট পেয়ে তারাই মরে। স্বার্থপরদের মৃত্যুটাও সুখের হয়।'

'আমরাও তো স্বার্থপর। অন্তত খোকার চেয়ে।'

'হ্যাঁ, আমরাও ভালই মরব, আমাদের লাশ তো হিন্দু ধর্ম মেনেই সৎকার হবে। আর যারা তোমার ছেলেদের মতন "মৃত্যুর ফেরিওয়ালা" সাজবে, লাশ গায়েব হবে।'

'কেন এমন হয়?'

'ওরা যে সকলের পরিবর্তন চেয়েছিল। সেটা কি হয় কখনও। তোমার মতন হাভাতেরা না থাকলে বিয়ে বাড়িও কি জমবে। আর শ্রাদ্ধবাড়িতে তুমি না গেলে অতিথি সৎকারের ঘটাটাও যে কম হয়ে যাবে।'

'তারাপদ, খোকাকে স্মরণ করতে করতে আমিও কেমন মৃত্যুর ফেরিওয়ালা হয়ে গেলাম। মৃতমানুষের শান্তিকামনাই আমার ব্রত হয়ে উঠল।'

'এই দু'টো এক নয়। আমাদের বেঁচে থাকাটা কেমন শামুকের মতন।'

'শেষবার যখন দমদম জেলে দেখা করতে গেছি, খোকা বলেছিল, "বাবা, ওরা তোমার উপরও খুব অত্যাচার করেছে"। চোখের তলায় কালি, দূর থেকেও বুঝতে পেরেছিলাম ওর শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্তমাখা ক্ষত। বিশ্বাস করো সেদিন বলেই ফেলেছিলাম। "আমার কথা ভেব না। তুমি লোকবিভু হয়ে ওঠো। অগ্নিমুখ তোমার সহায় হোন।" খোকাকে বুঝতে দিইনি ওরা কেমন আমার বুড়ো শরীরেও ডান্ডা ঢুকিয়ে ছেড়েছিল।'

'শ্যামাপ্রসন্ন ও সব কথা ভেবে কী লাভ। কষ্টই পাবে।'

'তোমাকে কেন বলি জানো—যারা তোমাকে শুধু ক্ষৌরকার বলে জানে তারা তো জানে না তুমি ছেলেবেলায় পড়াশুনায় কত ভাল ছিলে।'

'খুব শখ ছিল পড়ার। ছেলেটাও পড়াশুনা করলে না। যাই হোক, খেলার জোরে চাকরিটা পেয়েছে। তাই তোমার ছেলে যখন আমার সেলুনে আসত মনটা ভরে যেত। ওর কথা শুনতে আমার বেশ লাগত।'

'কণা দিদিমণির খবর জানো?'

'যাও না আছে হিন্দমোটরে।'

'মুড়ি-বাতাসা খাওয়ার টাকা জোটে না, তা আবার ট্রেনে টিকিট কেটে হিন্দমোটর যাব।'

'কণাদি কিন্তু তোমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন।'

'আবার 'বিশেষ' শব্দটা যোগ করলে কেন?'

'মনে হল তাই বললুম আর কি।'

'রবিনবাবু তো বরাবর কানপুরে থাকতেন। কণাদি সেখানে চুঁচড়া শহরে সেতার-বাদিকা হিসেবে বেশ নামডাক কুড়িয়ে ছিলেন। আমার তবলার হাত ছিল। তাই যেতাম সঙ্গে তবলচি কাম পুরুষ পাহারাদার হয়ে।'

'ভঞ্জবাবুও তো বেশ শৌখিন ছিলেন।'

কণাদির বাবা তো! সেই সময় বকুলতলার দুর্গাপুজার একটা আলাদা প্রাণ ছিল। ভঞ্জমেসোর বাড়িতে ছিল ক্লাবের ছেলেদের যাবতীয় আড্ডা।'

'রবিনবাবু একদম অন্য ধাতের। বাড়ির বাইরে প্রয়োজন ছাড়া একদম দেখা যেত না।'

'বকুলতলার সেই ভঞ্জবাড়িও গেল আমুল বদলে।'

'শ্যামাপ্রসন্ন, সব কিছুই বদলে গেছে। শুধু আমরা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে।'

'ঠিক তা নয়। আমরা আরও নেমে গেছি।'

'কেন জানো?'

'আসলে মানুষের নিজেকে শাসন করতে জানতে হয়। অতটা কাছাখোলা হওয়া ভাল নয়। তুমি যৌকাটা মেরে দিলে কণাদির তবলচি হয়ে। আর তোমার ছেলে— সে আবার অন্য ধারা। দিনের বদল চেয়ে নিজেকে সঁপে দিল আবেগের কাছে। তারও কিন্তু আত্মশাসনের প্রয়োজন ছিল।'

'প্রয়োজন ছিল বইকি। দমদম জেলে খোকাকে দেখে বুঝেছিলাম ওর একটা বড় পরাজয় হয়েছে। নিজের আদর্শের প্রতি আস্থা হারিয়েছে। আর যেন ফেরার উপায় নেই।'

'না হে, এই সব কথা শেষ হওয়ার নয়। বেলা দু'টো বাজে। এবার সেলুন বন্ধ করব।'

শ্যামাপ্রসন্ন উঠে দাঁড়ায় দিনটা জুড়ে এ সব স্মৃতি ভেসে ভেসে আসে। রাতে ও স্বপ্ন দেখে একটা পাহাড়ি পথ দিয়ে সে চলেছে। চারিদিকে ভেষজ উদ্ভিদ। তারপরে শুকনো নদীর উপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে। সেই ঝাঁকের মধ্যে একজনকে অনেক কষ্টে চিনতে পারল শ্যামাপ্রসন্ন। তার মৃত খোকা। তারাপদর মৃত্যুর ফেরিওয়ালা। ভয়হীন, নিরুদ্বেগে উড়ছে সেই পাখি। শুকনো নদী এবার প্রতীয়মান হল। জলের মধ্যে রক্তধারা। এবার পাখিগুলি টুপটাপ সেই রক্তনদীতে পড়ছে। এক সময় শ্যামাপ্রসন্নের পাখি হয়ে যাওয়া খোকাও সেই নদীতে পড়ে গেল। তবে পাখিদের মুখ থেকে রঙ-বেরঙের কিছু কাগজ হাওয়ায় উড়ে গেল। আর সেই কাগজ থেকে আবার এক ঝাঁক পাখি মৃত্যুনদী পার হচ্ছিল।

মন্টুবাবুর শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে শ্যামাপ্রসন্নকে দেখা যায়নি।

ওর খোঁজা, যাবতীয় প্রার্থনা সেদিনের স্বপ্নের পর কি শেষ হয়ে গেল?

অনুবাদ গল্প

মহাবলী

সুজাতা

মহিষাসুরমর্দিনী গুহার সামনে বাঙালি পর্যটকদের 'আসুন, আসুন' কথা বলাবলি, ফটো তোলার হিড়িক...। 'মা ইন্দিরা মহিলা উচ্চ বিদ্যালয়ে'র শিক্ষিকারা ভ্যান থেকে মহোৎসাহে নেমে পড়ে মহাবলিপুরমের ঐতিহাসিক মহত্ত্বকে বোঝাচ্ছে— 'এখানেই অমুক ফিল্মের নাচের সিন শুটিং করা হয়েছিল...'। শিল্পীদের বাটালির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। পাথরের গণেশ এবং পীনস্তনী সুন্দরীরা খদ্দেরদের অপেক্ষা করছে। কেউ জিজ্ঞেস করছে, 'এখানে কম্পোরল (এক ধরনের পাথরের হামান-দিস্তা যাতে ভেজা চাল ও কলাইডাল পেষা হয়, ইডলি-দোসা বানানোর জন্য) সস্তা পাওয়া যায় কি?'

এ সবে ভ্রুক্ষেপ নেই সে যুবকের। সে সমুদ্রতটের মন্দিরের কাছে এসে সমুদ্রের ধারে হাঁটতে লাগল। সে মন্দিরটা এক অশ্চর্য সৃষ্টি। বারশো বছর ধরে সমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাত ও নোনা হাওয়ার ঝাপটা উপেক্ষা করে এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

'ক্যামেরা চাই?...নিকোন জাপান?...রেবন চশমা? ...ইলেক্ট্রিক সেভার?...'

কিছু জবাব না দিয়ে এগিয়ে চলল যুবকটি।

'জুতো চাই?"...জোড়া মাত্র কুড়ি টাকায় ... কোলাপুরি...'

"কত দেবেন বলুন..."

.....

'আর কিছু চাই?...'

.....

'কথা বলবেন না?...কি মুশকিল!'

যুবকটির নিষ্কলুষ চেহারা স্কুলের পড়ুয়ার মতো। গায়ে নীল রঙের ঢিলা জামা তার ফরসা রঙকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। তার পিঠে একটি ব্যাগ বেল্ট দিয়ে শক্ত করে বাঁধা।

জুতো ফেরিওয়ালা ভাবল লোকটি হয়ত উত্তর ভারতের। বলল, 'পন্দ্রা রুপিয়ে মে লে লো...ব উনি।'

যুবকটি নীরবে তার দিকে তাকিয়ে তারপর আবার চলতে শুরু করল। সমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাতের হাত থেকে মন্দিরকে বাঁচাবার জন্য সারি সারি পাথরের চাঁই সাজানো ছিল। সেই পাথরের একটিতে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। যুবকটি তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'এক্সকিয়ুজ মি...'

ভদ্রলোকটি ফিরে তাকাতে যুবকটি বলল, 'প্রোফেসর চন্দ্রকুমার?'

'ইয়েস...'

'আমার নাম অজয়। আপনি সেক্রেটারির জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, আমি তার জবাবে চিঠি দিয়েছিলাম...'

'ও...তুমিই সে?...খুব ইয়ং দেখাচ্ছে!'

'আমার বয়স পঁচিশ....'

'আমার প্রায় সত্তর। চোখে ঝাপসা দেখি, রাতের বেলায় গাড়ি চালাতে পারছি না। নকল দাঁত...একবার বাইপাস হয়ে গেছে..ধার করা আয়ু...।'

'মডার্ন মেডিকেল সায়েন্স' যুবকটি বলল।

মন্দিরটার টাওয়ারকে অ্যাসিড দিয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে।

'অন্তত এক বছর সঙ্গে থাকবে, এই ভরসা দিলেই আমি তোমাকে রাখব। সার্টিফিকেটগুলো পরে দেখব। আমার বইটাকে তড়াতাড়ি শেষ করতে হবে...প্রকাশক খুব চাপ দিচ্ছে।'

'কী বই?'

ওরা ঘাস জমি আর গেট পেরিয়ে রাস্তার দিকে হাঁটতে শুরু করল।

'পল্লব যুগের শিল্পকলা নিয়ে একটি গভীর আলোচনা'।

বাসভর্তি ছাত্ররা নীচে নেমে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ছবি তুলছে, কথা বলছে, 'মাইরি, ফিগারগুলো সব একধারে সরে যাচ্ছে'।

'আপনি কি এদের জন্য শিল্পকলা নিয়ে বই লিখছেন?'

'কেন?'

'এই জায়গাটা ফেরিপ্লুজের যাত্রার বর্ণনায় এবং হিওয়ান সাংয়ের লেখায় উল্লিখিত হয়েছে, এখানে পিকনিক করতে এসে রেস্তোরাঁয় পরোটা খেয়ে মেয়েদের পেছনে দৌড়নো এই প্রজন্ম অন্তঃসারহীন। এদের কাছে সংস্কৃতির কোনও মূল্য নেই।..'

'তুমিও তো এই প্রজন্মের?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমি অন্য জাতের।'

ভদ্রলোক যুবকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি ফেরিপ্লুজ সম্পর্কে জান?'

'জানি যে এই বন্দর খ্রিস্টিয় প্রথম শতক থেকে আছে। পল্লব স্থাপত্যকলা সম্বন্ধেও জানি...'

তিনি ওকে সস্নেহে বললেন, 'আই লাইক ইউ।'

'আমি কবে চাকরিতে জয়েন করব?'

'এখনই এস, ...তোমার জিনিসপত্র কোথায়?'

'সব আমার পিঠে।'

'এইমাত্র?'

'এতেও বেশিরভাগই বই।'

'দাবা খেলতে পারো?'

'মোটামুটি।'

'মোটামুটি খেলে আমার কাছে যারা হারবে তাদেরই আমার দরকার। তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তোমাকে খুব ভাল লাগছে। ...লুইস টমাসও পড় না তো?'

'মেডুসা অ্যান্ড দ্য স্নেইল।'

'গ্রেট। ...ইয়ং ম্যান, তোমাকে আমার নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগবে। আমার মেয়ে বিনীতা মত দিলে তোমার সঙ্গে তার বিয়েও দিতে পারি।'

দু'জনেই রাস্তায় পৌঁছাল।

'তুমি মারুতি চালাতে পারো?'

'এমন কোনও গাড়ি নেই যেটা আমি চালাইনি' হাসতে হাসতে বলল সে।

'সিগারেট খাও?'

'নাহ্,'

'বিয়ে হয়েছে?'

'না।'

'পারফেক্ট!...মাইনে কত চাও?'

'আপনার খুশি।'

যুবকটি গাড়ির দরজা খুলে পিঠের বোঝাটা পেছনের সিটে ফেলে দিয়ে সামনের সিটে গিয়ে বসল।

'গাড়িটা চালাবে?'

'এই অঞ্চলটা আমার সম্পূর্ণ অজানা।'

'তোমার দেশ কোথায়?'

'আমার কোনও দেশ নেই।'

গাড়িটা অর্জুনের তপস্যার শিল্প পেরিয়ে কলপাক্কমের রাস্তা এড়িয়ে শহরের বাইরে জেলেদের নীল-হলুদ নাইলন জাল, মাছের আঁশটে গন্ধ পার হয়ে সমুদ্রের ধারের এক বাড়ির সামনে দাঁড়াল। সাদা লোমওয়ালা এক কুকুর বাইরে এসে লেজ নাড়তে লাগল।

'খুব নিরিবিলি জায়গা...। কুকুরটির নাম স্নো। এখানে থাকতে তোমার কোনও আপত্তি আছে?'

'নাহ্।'

'ঢেউয়ের আওয়াজ ক্রমশ সহ্য হয়ে যাবে।... দোতলায় আমার ছেলের ঘর আছে, সেখানে থাকতে পারো। ছেলেটা স্টেট্‌সে আছে, কাজ করে সেখানে...। মেয়েটি চেন্নাইয়ে পড়ছে, ছুটির সময় আসবে।'

যুবকটি ভিতরে ঢুকে পেন্টিংগুলি দেখতে লাগল। 'সেগাল কার ভাল লাগে?'

'আমার ... তোমার?'

'কোভিঙ্গকি...'

'বাঃ! কী একটা নিয়তি তোমাকে আমার কাছে এনে দিয়েছে...। আমি বহুদিন ধরে যেমনটি চাইছিলাম সেই আদর্শ যুবককে তোমার মধ্যে পেয়েছি।'

যুবকটি মুচকি হাসল—'এটা তো আপনার বাড়াবাড়ি।'

'তোমার পড়াশোনা কতদূর?'

'কলেজের পড়া শেষ করতে পারিনি...বি. এ. ইতিহাস পড়তাম...'

'কোথায়?'

'লন্ডনে।'

'কেন ছাড়লে?'

'বাবা-মা একটা দুর্ঘটনায় মারা গেলেন ... তাই...'

সে তার ব্যাগ থেকে জিনিসগুলো বের করল, বেশির ভাগই বই। '১০১ কবিতা', লয়াল ওয়াট্‌সনের প্রবন্ধ, একটি রেলওয়ে টাইমটেবল, দাবা খেলা নিয়ে ববি ফিশারের বই, 'দ্য তাও অফ পাওয়ার', মেকিয়াভেলির 'প্রিন্স্', মোদির 'জুরিসপ্রুডেন্স'...

'তোমাকে কোনও শ্রেণিভুক্ত করা যাচ্ছে না।'

যুবকটি নীরবে হাসল। বোঝা গেল যে যখন সে জবাব দিতে না চায়, তখন শুধু মুচকি হাসে।

'কবে শুরু করা যায়?'

'এখনই।' যুবকটি বলল।

***

একমাসের মধ্যেই তার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল। সে সকাল ছ'টায় উঠে কফি তৈরি করে, প্রোফেসরের জন্য মধু মেশানো লেমন কর্ডিয়াল দেয়, তাঁর আগের রাত্তিরের লেখাগুলোকে ইলেকট্রনিক টাইপরাইটারে পরিষ্কারভাবে টাইপ করে দেয়। তাতে দু'একটার বেশি ভুল থাকে না। কোনও দিন বইটার বিষয়বস্তু নিয়ে কথা বলে না। ওরা রোজ বিকেলে দাবা খেলে। একদিন সে হারে, আর এক দিন তিনি হেরে যান। কোনও কোনও দিন খেলা ড্র হয়ে যায়। রাত্তিরে তিনি চোখে ভাল দেখেন না বলে তাঁকে বই পড়ে শোনায়।

'তোমার কোনও বই থেকে কিছু পড়ে শোনাও না, ফর এ চেঞ্জ' ভদ্রলোক এক দিন বললেন।

'আমার বইগুলো আপনার ভাল লাগবে না।'

'আমার বই সম্বন্ধে তুমি কী ভাবো?'

'এ রকম বই আমাদের দেশের দরকার নেই।'

'এ কথা বলছ কেন?'

'মহেন্দ্রযুগের স্তম্ভ এবং রাজসিংহের স্তম্ভের মধ্যে পার্থক্য আলোচনায় আপনি একটা গোটা অধ্যায় লিখেছেন। এ রকম একটা বই থেকে আমার দেশের কী লাভ?'

'আমরা কি আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হব না?'

'পরিচিত হয়ে...?'

'এই ঐতিহ্যটাই আমাদের দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। এটা এখন দরকার নেই বলছ?'

'ভারত কোনও দিনই এক দেশ ছিল না। এই মহাবলিপুরম ছিল পল্লবদের রাজ্য, তার শত্রু ছিল পুলকেশি, তারপর চালুক্য রাজ্য তারপর চোলমণ্ডলম...চেঙ্গি...। তখন ভারত ছিল না। ভারত হচ্ছে ব্রিটিশদের সৃষ্টি।'

'কিন্তু আমাদের প্রজন্ম ও রকম ভাবে না। আমরা এই দেশের স্বাধীনতার জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করেছি।'

'তার কারণ আমাদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য বাইরের শত্রু একটা ছিল, কিন্তু এখন আমরাই আমাদের শত্রু।'

'তবু এই দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছে আমাদের সংস্কৃতি।'

'নাহ্...আমাদের দারিদ্র।'

'তুমি শিল্পকলা পছন্দ কর না?'

'সমুদ্রতীরের মন্দিরের স্থাপত্যকলা আমার ভাল লাগে, তাকে চাঁদের আলোয় দেখা আমার খুব পছন্দ, কিন্তু আমার হিরো হল সেই মন্দিরের অজ্ঞাতনামা স্থপতি, মহেন্দ্র বর্মা নয়।'

'তোমার মত পাল্টে যাবে' চন্দ্রকুমার বললেন মুচকি হেসে।

নিউ জার্সিতে ছেলেকে ফোন করলেন—'রামু, আমি এক যুবককে পেয়েছি সেক্রেটারি হিসেবে। ওকে পাওয়াটা আমার পূর্বজন্মের সৌভাগ্য বলতে হয়।' এভাবে পনেরো মিনিট ধরে যুবকটির প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, 'মাকে এখন পাঠাতে হবে না...আমার সেক্রেটারিই আমাকে ভালভাবে দেখাশুনা করছে, আইস-টি পর্যন্ত বানিয়ে দেয়।'

এ সব কথা যুবকটির সামনেই হল, তবু তার চেহারায় কোনও ভাব পরিবর্তন দেখা গেল না।

বিনীতা দশেরার ছুটিতে এসেছিল। চন্দ্রকুমার তাকে যুবকটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—'বিন্নি, দিস ইজ অজয়...এই আমার মেয়ে বিনীতা...।'

'হাই, ইউ লাইক মিউজিক?'

'হ্যাঁ।'

বিনীতা সাগ্রহে বলল, 'ফিল কলিন্স্?'

'মোৎসার্ট' যুবকের জবাব।

'ঈশ!...বুকস্...জেফরি আরচার?'

'ফিকশানে আমার এত রুচি নেই...আই রিড পোয়েমস্।'

'পোয়েমস্! মাই গড!'

'হায়, দেয়ার গোজ মাই মেরিয়েজ এলায়াঙ্গ্!' হেসে বললেন চন্দ্রকুমার।

বিনীতা বলল, 'বাবা, তুমি কোথা থেকে এই জন্তুকে ধরে এনেছ? হি ইজ নট নর্মাল'

এই দু'জনের মধ্যে শুধু একটি বিষয়ে মিল ছিল, দু'জনেরই মে মাসে জন্ম।

অজয় বিনীতার সঙ্গে খুব স্বাভাবিক ভাবে মিশল। তাকে কবিতা পড়িয়েই ছাড়ল। মোৎসার্টের জীবনকাহিনি ভি. ডি. ও-তে দেখাল।

একদিন বিকেলটা বিনীতার খুব একঘেয়ে লাগল। সে অজয়কে শহরের দিকে নিয়ে গেল। 'আমি ওয়াকম্যান নিয়ে সমুদ্রতটে হাঁটব, তুমিও সঙ্গে যাবে কবিতা পড়তে পড়তে। আসতে পারো।'

অজয় সম্মত হল।

বিনীতা বলল, 'আমি চাঁদের আলোয় মন্দিরটা দেখতে চাই।'

ওরা চলে গেল।

ওদের মেলামেশা দেখে চন্দ্রকুমার খুব খুশি। 'এর পরিবারের খবর নিতে হবে...এর মতো জামাই পাওয়া দুর্লভ।'

ওদের না থাকার জন্য বাড়িটা খাঁ খাঁ করছিল। চন্দ্রকুমার টেবিলের উপর রাখা বইটা তুলে নিলেন, তাতে কোণ-মোড়া পাতা খুললেন। এই কবিতাটাই অজয় বিনীতাকে পড়ে শোনাচ্ছিল যাবার আগে। কবিতার শিরোনামই আঘাত দেওয়ার মতো 'তুমি কী ভাবে মরলে?'

'মৃত্যু আসে কখনও বুকে হেঁটে,
অথবা লাফাতে লাফাতে ; ...
সে ধীরে আসুক বা তেড়ে আসুক,
তুমি মারা গেছ—এটা কোনও ব্যাপার নয়,
দেখতে হবে তুমি কী ভাবে মরলে।'

বাড়ির সামনে একটা জিপ থামল। জিপ থেকে একজন নেমে ঝাউবনের এদিকে ওদিকে তাকাতে তাকাতে চন্দ্রকুমারের কাছে এলেন।

'প্রোফেসর চন্দ্রকুমার?'

'ইয়েস্।'

'আই এম ফ্রম দ্য পুলিশ স্পেশাল ব্রাঞ্চ।' ভদ্রলোকটি তাঁর আইডেনটিটি কার্ড দেখালেন। তারপর একটা ফোটো বের করে বললেন, 'এই লোকটিকে চেনেন?'

চন্দ্রকুমার চশমা পরে ছবিটাকে আলোয় এনে দেখলেন। গোঁফ নেই, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, তবু নির্দ্বিধায় বলতে পারলেন, 'হ্যাঁ, এই হচ্ছে অজয়, আমার সেক্রেটারি।'

ভদ্রলোক উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'এর আসল নাম অজয় নয়। এখন এখানে আছে কি?'

'আমার মেয়ের সঙ্গে বেড়াতে গেছে, এখনই ফিরবে.... কিন্তু মনে হয় কোনও গোলমাল হয়েছে...।'

ভদ্রলোক চট করে রেডিওতে বললেন, 'চার্লি, দিস ইজ্ দ্য প্রেস। উই হ্যাভ গট হিম।'

'ব্যাপারটা কী বলুন?' চন্দ্রকুমারের জিজ্ঞাসা।

'এই যুবকটি কে জানেন? মাই গড।'

'ইনসপেকটর, কোথাও একটা ভুল হয়েছে। আমার এই সেক্রেটারি খুব ভাল ছেলে...।'

'প্রোফেসর, এই লোকটা একজন সাংঘাতিক সন্ত্রাসবাদী। পুলিশ একে অনেক জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছে, এর বিরুদ্ধে মোট আঠারোটা খুনের কেস...।'

হাসি পেল চন্দ্রকুমারের—পুলিশ এত বোকা হতে পারে। বললেন, 'ইনসপেকটর, দেয়ার ইজ্ সামথিং রং। হয়ত ছবিটা ভুল।'

'সে এখানেই আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কোন ঘরে?'

'দোতলায় আমার ছেলের ঘরে।'

'আপনার ছেলেও এখানে থাকে?'

'নাহ্, সে আছে স্টেট্সে।'

'আমার সঙ্গে আসুন।' বলতে বলতে ইনসপেকটর উপরে উঠলেন। চন্দ্রকুমার তাঁর পেছনে পেছনে গিয়ে প্রথম বার অজয়ের ঘরে ঢুকলেন। বলতে লাগলেন, 'আমার সেক্রেটারি সম্বন্ধে আপনি জানেন না, খুব ভাল ছেলে, আশ্চর্য মেধা। নান্দনিক ভাবাপন্ন, বিস্তর পড়াশোনা...। মৌলিক চিন্তার শক্তিযুক্ত।'

তাঁর কথা হয়ত ইনসপেকটরের কানেই যায়নি। তিনি শিকার-সন্ধানী সিংহের মতো ঘরের মধ্যে ঢুকলেন।

পরিপাটি করে সাজানো ঘর। দেয়ালের উপর খুব সুন্দর মডার্ন পেন্টিং। সেলেফে বইগুলো পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজানো, টেবিলের উপর কাগজগুলোও তাই। জানলায় ফুলদানিতে গোলাপ।

এই সব পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতাকে গ্রাহ্যই করলেন না ইনসপেকটর। তিনি টেবিলের ড্রয়ারগুলোকে সজোরে খুললেন, কাগজগুলোকে ওলটপালট করলেন, তালাগুলো ভাঙলেন।

'প্রোফেসর, এসে দেখুন না। আপনার সেক্রেটারির জিনিসপত্রকে।'

চন্দ্রকুমার কাছে গেলেন।

'এটা তো আপনার নয়?' টেবিলের একটি ড্রয়ারে রাখা ছোট পিস্তল দেখিয়ে বললেন ইনসপেকটর। নীচের ড্রয়ারে একটি কলসনিকোভ রাইফেলের স্পেয়ার পার্টস্ এবং কিছু ম্যাগাজিন ছিল। সঙ্গে একটা রেডিও ট্রান্সমিটারও।

'আই কান্ট বিলিভ ইট...দিস ইজ ইম্পসিবল।'

'এর আসল নাম অজয় নয়, টোনু।...কিছুক্ষণ চুপ করে থাকুন আমরা দেখে নেব। সে আপনার মেয়ের সঙ্গে কোথায় গেছে?'

'বললাম তো, সমুদ্রতটে বেড়াতে।'

'আপনি উৎকণ্ঠিত হবেন না। সে জানে না আমরা তার খোঁজে এসেছি। তাদের ফেরা পর্যন্ত আমরা এখানেই লুকিয়ে থাকব।'

ইনসপেকটর জিপকে চলে যেতে বললেন। দশজন পুলিশ গট গট করে বাড়ির ভিতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

'ওয়েট। ... ইউ কান্ট ডু দিস্ ... হয়ত আর কাউকে বাঁচাতে...'

'সাট আপ ওল্ডম্যান, কিপ কোয়েট! আপনি একজন ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদীকে আশ্রয় দিয়েছেন।...চুপ করে দেখতে থাকুন, কী ঘটছে!'

'কী করবেন? ...ওহ্ গড্! ...আমার মেয়ে আছে ওর সঙ্গে।'

'আমরা ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করব...'

'হোয়াট ডু ইউ মিন?'

বলতে বলতে চন্দ্রকুমার ইন্সনসপেকটরের কাছে যেতেই একজন পুলিশ ধমক দিল, 'দাদু, এক কোনায় গিয়ে চুপ করে বসুন, না হলে মারা যাবেন।'

চন্দ্রকুমার কাঁপতে লাগলেন। মনে হল একটি সরবিটল খেলে ভাল হয়, জিভ শুকিয়ে গেল। কী একটা মস্ত ভুল হয়েছে, আইডেনটিটির গোলমাল। নিশ্চয়ই অজয় অপরাধী নয়, হতেই পারে না।

'ওরা আসছে... সকলে তৈরি থাকো, দরকার না হলে গুলি চালাতে হবে না। ...আমি বললে তবেই গুলি ছুঁড়বে।'

চন্দ্রকুমার তখনই দেখলেন প্রত্যেকের হাতে রাইফেল রয়েছে। জানলা দিয়ে দেখলেন, বিনীতা ও অজয় কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। তাদের হাতে হাত মেলানো। মাঝে মাঝে বিনীতা অজয়ের কাঁধে চাপড় দিয়ে অট্টহাসি হাসছে।

'রেডি।'

একমুহূর্তের জন্য পৃথিবীটা যেন স্তব্ধ। এ দিকে ট্রিগারকে তৈরি রাখার আওয়াজ পরিষ্কার শোনা গেল। বাড়ির দিকে আসতে আসতে অজয় দেখল মাটিটা কোথাও কোথাও ভেজা ভেজা, তাতে বুটের ছাপ...।

সে দাঁড়িয়ে পড়ল, বিনীতাকে কী বলল। ও আশ্চর্য হয়ে নীচের দিকে তাকাল।

'ও বুঝতে পেরেছে আমরা এসেছি... গেট আউট। দৌড়োও...ওকে ধরো...।'

এর মধ্যে অজয় বিনীতাকে টেনে নিয়ে নিজে তার আড়ালে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর তার দিকে এগিয়ে আসা পুলিশকে বলল, 'স্টপ।... তোমরা আর এগুলে এই মেয়েটি মরে যাবে।' এখন তার হাতের একটা পিস্তল বিনীতার কপালের উপর ঠেকানো।

চন্দ্রকুমার ভাবলেন, এ রকম দৃশ্য তো শুধু সিনেমায় দেখা যায়। তিনি এ-ও ভাবলেন স্বপ্ন দেখছেন, যে কোনও সময় ঘুম থেকে জেগে উঠবেন।

যুবকটি বিনীতাকে জোর করে টেনে নিয়ে মারুতির মধ্যে পুরে গাড়িটা স্টার্ট করে দিল। ইনসপেকটর ওয়াকিটকিতে হুকুম দিলেন, 'কুইক। সেন্ড দ্য জিপ। হি ইজ রানিং।...'

সকলে ছুটল। কুকুরটা লেজ নাড়তে নাড়তে ওদের পেছনে গেট পর্যন্ত গেল। চন্দ্রকুমার কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে বললেন, 'আমার মেয়ে।...আমার মেয়েকে বাঁচান।...'

ধুলোর পর্দাটা আস্তে আস্তে নেমে গেল। প্রোফেসর নিষ্পলকে সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন। পূর্ব দিকে চন্দন রঙের চাঁদ আকাশে দেখা দিল।

রাত আটটায় পুলিশ ফিরে এলে প্রোফেসরকে সমুদ্রতটে নিয়ে গেল।

'কী হয়েছে... আমার মেয়ের কী হয়েছে?...'

'সি ইজ অলরাইট।'

'ছেলেটি?'

'গুলি করতেই হল....'

ওরা অকুস্থলে পৌঁছতেই বিনীতা তার বাবার দিকে ছুটে এল। চন্দ্রকুমার ওকে জড়িয়ে ধরে ওর কপালে চুমো খেলেন। 'বিন্নি, বেঁচে গেলে?...আর ইউ অলরাইট? কোথাও আঘাত লাগেনি তো?'

'না বাবা, ... ও আমাকে কিছুই করেনি...।'

'কিছুই করেনি?'

'নাহ্, শুধু বলল, 'আমি ধরা পড়েছি... ওরা নিশ্চয়ই আমাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু মরবার আগে আরেক বার চাঁদের আলোয় মন্দিরটি দেখতে চাই...।' সে জন্যই ও আমাকে পণবন্দি করে নিয়ে গিয়েছিল। এখানে এসেই আমাকে ছেড়ে দিল।' চন্দ্রকুমার মন্দিরের দিকে তাকালেন। মন্দিরের কোনাগুলো রূপোর মতো চমকায়। দূরে ঢেউগুলির কানায় কানায় রূপোর ঝলকানি। ঢেউগুলির আওয়াজ আসে বারে বারে।

'বাবা, ওরা ওকে ...ওকে...।' বিনীতা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল।

মন্দিরটির পাশে বালির উপর সে শুয়েছিল, চাঁদের আলোয় ভেজা। মারুতির হেডলাইটের আলোয় দেখা যায় তার বুকের ক্ষতে জমাট রক্ত। চন্দ্রকুমার তার কাছে গিয়ে দেখলেন।

'আমাদের ঐক্যবদ্ধ করতে একটা বাইরের শত্রু ছিল... এখন আমাদের শত্রু আমরাই...।'

বললেন, 'মাই গড। হোয়াট ওয়েস্ট রং।'

'কী বললেন?'

'আমাদেরই যুবকদের আমাদেরই সমুদ্রতটে আমরাই গুলি করছি। কোথায় কোন পর্যায়ে আমরা—এই দেশের পরিণত বয়স্করা কি ভুল করেছি? ...ভালভাবেই তো শুরু করলাম, ভুল হল কোথায়? ...'

'এ সব প্রশ্ন আমরা করি না।' বললেন ইনসপেকটর।

[আধুনিক তামিল কথাসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম সুজাতা (আসল নাম — রঙ্গরাজন)। নানা ধরনের ছোটগল্প ও উপন্যাস লিখেছেন—সামাজিক, রোমাঞ্চকর, গোয়েন্দা, বিজ্ঞানভিত্তিক ইত্যাদি। রচনা করেছেন বহু প্রবন্ধ ও নাটক এবং কমপিউটার নিয়ে গ্রন্থ। চটকদার ভাষা এবং সাবলীল চটুল ভঙ্গি হল তাঁর বৈশিষ্ট্য।]

অনুবাদ ঃ **সুব্রহ্মণ্যিয়ন কৃষ্ণমূর্তি**

ধারাবাহিক স্মৃতিচারণ

ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

পূর্বপ্রকাশিতের পর

উদ্যোক্তারা সাধারণ দর্শক ও আমন্ত্রিত দর্শকদের মধ্যে কিছুটা ব্যবধান রেখেছিলেন। রিপোর্টার হিসাবে আমন্ত্রিত দর্শকদের মধ্যে গিয়ে বসেছি। বসতেই দেখি অমল হোম, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী হাত-পা ছড়িয়ে খোসগল্প করছেন। এরপরে এলেন নীহাররঞ্জন রায়। তারপর এলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী অলকা উকিল। শিল্পীমহলে এবং শিল্প-সংস্কৃতিচর্চায় তখন অলকা উকিলের বেশ পরিচিতি ছিল। তাঁর দাদা ড. অমূল্য উকিল সে সময়কার কলকাতার এক নম্বর ডাক্তারদের একজন। এঁরা সকলে তখন গোল হয়ে বসে একটি বৃত্ত তৈরি করে ফেললেন। আমি কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে এঁদের আলোচনা শুনছি। ওঁরা কথাবার্তা বলছিলেন রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উপন্যাস নিয়ে যেখানে 'সেক্স' কোথাও সুস্পষ্ট এবং কোথাও প্রচ্ছন্ন প্রভাব ফেলেছে। ওঁদের আলোচনার মধ্যে ছিল 'চোখের বালি' ও 'ঘরে বাইরে'। ওঁরা যখন কথাবার্তা আরম্ভ করেছেন, তখন খুব চমৎকার কোঁচানো ধুতি এবং হাফ পাঞ্জাবি ও হাফ ফতুয়া ধরনের জামা পরে, মুখে পান ও হাতে সিগারেটের কৌটা নিয়ে এক ভদ্রলোক হাজির হলেন। ধূমপান নিষেধ, সুতরাং বুঝে নিলাম ওই কৌটা পানের পিক ফেলার জন্য। এই ভদ্রলোককে এই প্রথম দেখলাম। তিনি এসে আলোচনায় অংশগ্রহণের চেষ্টা করলেন। আলোচনার যাঁরা সূত্রপাত করেছেন, তাঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথকে 'রবীন্দ্রনাথ' বলছেন কিন্তু ওই ভদ্রলোক 'গুরুদেব' বলছেন। কিছুক্ষণ বাদে ভদ্রলোক খুব জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'না, না এ সব আপনারা বানিয়ে বলছেন...গুরুদেব এসব 'অবসিন' কথা লিখতে পারেন না...।' ভদ্রলোক একাধিকবার এ কথাগুলি বলতে আলোচনাকারীদের মুখমণ্ডলে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। আলোচনা থেমে গেল। এই সময় অমল হোম ওই ভদ্রলোকের কাঁধে হাত রাখলেন। এরপর ধীরে ধীরে বললেন, "ভায়া সুকুমল, গুরুদেবের 'সিন' ও 'অবসিন' এ দু'টোই তোমার 'আনসিন'।" এ রকম বুদ্ধিদীপ্ত শ্লেষ আমি ড. রামমনোহর লোহিয়া ছাড়া আর কারও কাছ থেকে শুনতে পাইনি। পরে কৌতূহলবশত জেনে নিলাম ওই ভদ্রলোকের নাম। তিনি হলেন সুকুমলকান্তি ঘোষ, 'অমৃতবাজার', 'যুগান্তর' পত্রিকাগোষ্ঠীর একজন কর্ণধার। এক সময় তিনি আমার সম্পাদক হয়েছিলেন। মানুষটি খুব সরল সাদাসিধে প্রকৃতির ছিলেন। কিন্তু একটা বড় দোষ ছিল, যে বিষয়ে তাঁর কিছু জানা নেই, সে বিষয়ের আলোচনায় নিজেকে যুক্ত করা। আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং ড. নীহাররঞ্জন রায়ের আলোচনার পর দু'জন শিল্পী আলাদা আলাদাভাবে দু'খানি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেন। এ দু'জনের মধ্যে একজন পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগতে প্রভূত সুনাম অর্জন করেছেন। তখন তিনি আঠারো উনিশ বছরের সদ্য তরুণী। নাম সুমিত্রা দাশগুপ্তা (পরবর্তী জীবনে সুমিত্রা সেন)। তিনি গেয়েছিলেন 'ভালবেসে সখি নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো...'।

যে-গানের মধ্য দিয়ে গায়িকা তাঁর সমগ্র সত্তাকে উৎসারিত করতে পারেন, তা শ্রোতার মনকে বেশি মুগ্ধ করে তোলে। সেদিনের সুমিত্রা দাশগুপ্তা আমার চিত্তে সেই দাগই কেটেছিলেন। আর একজন, যিনি গেয়েছিলেন কীর্তনের ঢঙে রবীন্দ্রনাথের সেই গানটি 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে...' সেই গায়িকা ছিলেন মৃণ্ময়ী দত্ত। রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগৎ থেকে তিনি একেবারেই হারিয়ে গেছেন। অসাধারণ কণ্ঠ ছিল মৃণ্ময়ীর। ওই সময় উত্তর কলকাতায় বহু রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরে তিনি গান গাইতেন। ছোট্ খাটো চেহারা, দারুণ স্মার্ট। বয়সে আমার চেয়ে বড় ছিলেন। শ্রোতা হিসাবে আমার মুখটা বোধহয় ওঁর কিছুটা চেনা হয়েছিল। একদিন কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় মুখোমুখি দেখা। দু'জনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মৃণ্ময়ী দত্ত কিছু বলার আগে আমিই বললাম, 'আমি আপনার গান শুনে থাকি।' আমার কথার মধ্যেই উনি আমাকে যাচাই করে নিয়েছেন যে আমি ওঁর চেয়ে বয়সে ছোট। তাই অবলীলাক্রমে আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করলেন। বললেন, 'কোথায় থাকো?' আমার জবাব পেয়ে বললেন, 'আরে সে তো আমার বাড়ির খুব কাছে। আমি থাকি আমহার্স্ট স্ট্রিট ডাকঘরের উল্টোদিকে কোরিস চার্চ লেনে।' প্রথম দিনেই মৃণ্ময়ীদি আমাকে ওঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন, চা খাওয়ালেন। বউদি ও গোটা তিনেক বোনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। গান শোনালেন একখানা। মৃণ্ময়ীদি সে বছর বাংলায় এম.এ. পরীক্ষা

দিয়েছিলেন। এর কয়েকমাস পরে মৃণ্ময়ীদি বিলেত চলে গেলেন সমাজবিজ্ঞান পড়তে। দেশে ফিরেছেন বহু বছর পরে। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগতে ফিরলেন না। লোকমুখে শুনেছি, যাদবপুরে রামঠাকুরের আশ্রমে প্রতি সন্ধ্যায় মৃণ্ময়ীদির কীর্তন গান শুনতে অসংখ্য ভক্তেরা ভিড় করে। মৃণ্ময়ীদিরা নোয়াখালি জেলার লোক। রামঠাকুর ফরিদপুর জেলার লোক হলেও নোয়াখালির চৌমোহনি ছিল তাঁর সাধনার সিদ্ধস্থান। সম্ভবত রবীন্দ্রসঙ্গীতের চেয়ে রামঠাকুরে সমর্পণ মৃণ্ময়ীদির জীবনে অনেক বেশি কাঙ্ক্ষিত ছিল।

ওই বছরে অর্থাৎ ১৯৫১ সালে মহাজাতি সদনে রবীন্দ্রজন্মোৎসবের সময় আর একটি স্মরণীয় অনুষ্ঠান ছিল 'শ্যামা'নৃত্যনাট্যে 'শ্যামা'র ভূমিকায় সেবা মিত্রের নৃত্যাভিনয়। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা এই উপলক্ষে যে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন তাতে ১৯৩৯/৪০ সালের শান্তিনিকেতনের একটি ঘটনার উল্লেখ ছিল সেবা মিত্রকে নিয়ে। অসুস্থতার জন্য রবীন্দ্রনাথ তখন বেশিরভাগ সময় ঘরেই থাকতেন। কিন্তু সন্ধ্যায় গীতবাদ্যানুষ্ঠানে তিনি নিজে উপস্থিত থাকতেন। ইজি চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় তিনি ওই অনুষ্ঠানগুলি উপভোগ করতেন। ওই রকম সময় 'শ্যামা'র আয়োজন করা হল। রবীন্দ্রনাথ যথারীতি উপস্থিত। 'শ্যামা'র ভূমিকায় সেবা। তাঁর বয়স তখন পনেরো ষোলো। বিমুগ্ধ চিত্তে রবীন্দ্রনাথ সেবার দিকে তাকিয়ে উদ্বেল হয়ে উঠলেন। অভিনয় শেষে সেবা 'শ্যামা'র অঙ্গ সজ্জাসমেত রবীন্দ্রনাথের পায়ের কাছে এসে বসে পড়লেন। উদ্বেলিত রবীন্দ্রনাথ সেবার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, 'তুই আমার আসল শ্যামাকে ফিরিয়ে এনেছিস।' সেদিন আমি জীবনে প্রথম ও শেষ সেবা মিত্রের শ্যামা দেখলাম। তাঁর শ্রীমণ্ডিত অঙ্গসুষমা, তাঁর কণ্ঠের গান আজ অর্ধশতাব্দী পরেও আমার স্মৃতিকে আলোড়িত করে। সেবার সঙ্গে বজ্রসেনের ভূমিকায় ছিলেন একজন দক্ষিণভারতীয়, নাম ভুলে গেছি। সে সময় কলকাতার কোনও পেশাদার মঞ্চে বিশেষ করে নিউ এম্পায়ারে সেবা মিত্র 'শ্যামা'র অভিনয় করলে একদিনেই সব টিকিট বিক্রি হয়ে যেত। সেবা মিত্র শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক জীবনে ছিলেন সেবা মাইতি। পরে নিউ থিয়েটার্সের বিখ্যাত মঞ্চসজ্জা বিশেষজ্ঞ সুনীতি মিত্রের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু সেবা বেশিদিন বাঁচলেন না। ১৯৫২/৫৩ সালে সেবা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় কলকাতা শহরের বাইরে রবীন্দ্রজন্মোৎসবের অনুষ্ঠানে 'শ্যামা' পরিবেশন করছিলেন। মঞ্চেই তিনি রক্তক্ষরণে অচেতন হয়ে পড়েন। সেখান থেকে তাঁকে কলকাতার হাসপাতালে আনার পথে তাঁর অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে সেবা 'শ্যামা'র অঙ্গসজ্জা নিয়েই পরপারে চলে গেলেন।

১৯৫১ সালের পুজোর পর থেকে 'লোকসেবক' পত্রিকার আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হতে আরম্ভ করে। অবশ্য এই পত্রিকার আর্থিক অবস্থা কখনওই ভাল ছিল না। সাংবাদিক ও অসাংবাদিক কর্মচারিদের অধিকাংশই ছিলেন পার্ট-টাইমার। তাদের অন্য একটা জীবিকা থাকার ফলে তারা অনিয়মিত টাকা পেলেও তাদের অসুবিধা কম হত। কিন্তু আমার মতো যে দুটিনজন বলতে গেলে পুরো সময়ের শিক্ষানবীশ তাদের অসুবিধা বেশি ছিল। তাদের মধ্যে আমার অবস্থা ছিল সবচেয়ে খারাপ। আমি অতি দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে থাকতাম। সেখানে থাকার সমস্যা খুব প্রকট হয়ে দেখা দিল। এ দিকে 'লোকসেবক' থেকে ১৮/২০ টাকা নিয়মিত পাচ্ছি না। এই সময়ে আমাকে প্রায়ই 'হিন্দু হস্টেলে' থাকতে হত। 'হিন্দু হস্টেলে' আমার যে সব ছাত্রবন্ধুদের কাছে থেকে অপরিমিত সাহায্য পেয়েছি তাঁরা আজ প্রায় সকলেই পরপারে চলে গিয়েছেন। কয়েকজন স্থায়ীভাবে বিদেশে চলে গিয়েছেন। এই সময় 'লোকসেবক' ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছি। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বাড়ি যাওয়া অনেকটা অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। হেমেন্দ্রপ্রসাদের বাড়িতেই একদিন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার (মাসিক) সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। মানুষটিকে আমার খুব ভাল লেগেছিল। তিনিও আমাকে তাঁর পত্রিকা অফিসে যেতে বলেছিলেন।

একদিন 'ভারতবর্ষ' অফিসে ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে চলে গেলাম। বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত এবং এক সময়কার অন্যতম বৃহৎ প্রকাশনা সংস্থা 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স'-এর ঐতিহাসিক বাড়ির দোতলায় ছিল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার অফিস। একতলায় বইয়ের দোকান। (কর্নওয়ালিস স্ট্রিট ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থলের কাছে এই বাড়িটি এখন একটি ব্যাংকের অফিস)। শরৎচন্দ্রের প্রায় সকল উপন্যাসেরই প্রকাশক ছিল এই সংস্থা। 'পথের দাবী' প্রকাশ করে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন গুরুদাসবাবু। 'পথের দাবীর' পাণ্ডুলিপি ইংরাজ সরকার এখান থেকেই বাজেয়াপ্ত করেছিল। এ ছাড়া অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'সিরাজদৌল্লার'র প্রকাশক ছিলেন গুরুদাস চট্টোপধ্যায়। এই বই ছাপার জন্যও তিনি গ্রেফতার হয়েছিলেন। 'সিরাজদৌল্লার' পাণ্ডুলিপিও পুলিস বাজেয়াপ্ত করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালেরও নাটক, হাসির গান ও ব্যঙ্গাত্মক রচনার প্রকাশক ছিল এই সংস্থা। এ সব লেখার অমূল্য পাণ্ডুলিপিগুলিকেও এঁরা একতলায় কাঁচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখতেন।

দামি কঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলাম। দোতলার হলঘরে একটি সুবৃহৎ নয়নাভিরাম টেবিল সামনে নিয়ে 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বসে আছেন। ফণীন্দ্রনাথবাবু চোখে খুব কম দেখতেন। তাঁর চশমার কাঁচ দু'খানা যেন পাথরের মতো মোটা। টেবিলের ওপরে দু'তিনটে বিভিন্ন আকারের ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সঙ্গে রয়েছে একটি জোরালো টেবিলল্যাম্প। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মুখ তুলে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি বুঝতে পারছিলাম যে উনি আমাকে ঠাহর করে নিচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরে খুব আস্তে কিন্তু স্মিত হাস্যে বললেন, 'ও তুমি'। উনি বসতে বলার পর ওর মুখোমুখি চেয়ারে বসে পড়লাম। উনি চা আনতে বললেন একজনকে। উনি লক্ষ করছিলেন আমি টেবিলের গায়ে হাত বোলাচ্ছি। উনি বললেন, কি টেবিলটা দেখছ? আমি বললাম, 'কাঠটা এত মসৃণ এবং কেমন যেন ঠান্ডা ঠান্ডা।' এ বার উনি একটু জোরে হেসে বললেন, 'এই টেবিলটা ছিল লর্ড কার্জনের। ভাইসরয় হিসাবে তিনি এই টেবিলেই কাজ করতেন।' ১৯১১ সালে রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লি চলে গেলে কার্জনের ব্যবহৃত বহু আসবাবপত্র নিলাম ডাকে সরকার। এই টেবিল এবং ল্যাম্পসেটটি ওই নিলাম থেকে কিনে নিয়েছিলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

আমি চা খেতে খেতে ওঁকে বললাম এই টেবিলেই কি 'ভারতবর্ষ'-এর প্রথম সম্পাদক জলধর সেনমশাই বসতেন? ফণীন্দ্রনাথবাবু বললেন, 'হ্যাঁ জলধরদাও এখানে বসে কাজ করেছেন। কিন্তু কেন বলো তো তোমার এই প্রশ্ন?' আমি বিষণ্ণভাবেই বললাম, 'শুনেছি জলধরবাবুও চোখে খুবই কম দেখতেন এবং মৃত্যুর আগে একেবারেই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।' এবার উনি হেসে বললেন, 'আমার চোখ দেখে তুমি ভাবছ টেবিলটা অপয়া?' এবার ফণীন্দ্রনাথবাবু আমাকে একটা লেখার কাজ দিলেন। কাজটা হল এই, সে সময় চিনা সৈন্যরা তিব্বতে ঢুকে পড়েছে। ভারতীয় পার্লামেন্টে তোলপাড় করছেন আচার্য কৃপালনি ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। চিনের এই তিব্বত দখল নিয়ে আমাকে একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতে বরাত দিলেন 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক। তখনকার বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা 'ভারতবর্ষ'-এ আমার প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হল চিনের তিব্বত দখল নিয়ে। লেখার জন্য আমি দক্ষিণা পেয়েছিলাম দশ টাকা। লেখা প্রকাশ হওয়ার আগেই ফণীদা আমাকে টাকা দিয়েছিলেন। উনি বুঝতে পেরেছিলেন আমার প্রয়োজন।

'লোকসেবক' পত্রিকায় আমার দিন প্রায় শেষ হয়ে আসছে। নিতান্ত অল্প-মাইনের টাকাও দিতে পারছিলেন না কর্তৃপক্ষ। ওই সময় 'পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা' নামে একটি বাংলা দৈনিকের পুনঃপ্রকাশ আরম্ভ হল। বউবাজারের ফিরিঙ্গি কালীবাড়ির পাশের গলি ধরে উত্তর দিকে কিছুটা এগিয়ে গেলে সামনে এক বিস্তীর্ণ সবুজ লনের ওপর পূর্ব পশ্চিমে লম্বা একটা বেঢপ বাড়ি থেকে ওই পত্রিকা প্রকাশ হচ্ছিল। 'লোকসেবক'-এর বেশ কয়েকজন সাংবাদিক ওই কাগজে পার্ট-টাইম কাজ আরম্ভ করলেন। এঁদের মধ্যে বার্তাসম্পাদক শৈলেন রায়ও ছিলেন। শৈলেনদা আমাকেও 'যা পাওয়া যায়' এই ভিত্তিতে ওখানে কাজ করতে বললেন। আমি দিন কয়েক 'পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা'য় কাজও করেছিলাম। কিন্তু আমি ওই কয়েকদিনেই বুঝে নিয়েছিলাম যে এই পত্রিকার আয়ু বেশিদিন নেই। আমি ওখান থেকে কেটে পড়লাম। এখানে অজিত মিত্র নামে একজন সাংবাদিকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। অজিতবাবু ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর ধনাঢ্য এবং মনস্বী পণ্ডিত রাজা স্যার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাতি। অজিতদার বিত্ত ছিল, হৃদয়ের উদারতা ছিল আরও বেশি। কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপান তাঁকে জীবনে কোনও শৃঙ্খলা দেয়নি। '৭০-'৭১ সালেও তিনি 'যুগান্তর' অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। কারও হয়ত কৌতূহল হতে পারে যে 'পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা' কে প্রকাশ করেছিলেন? তিনি হলেন হেমন্তকুমার সরকার। নদীয়া জেলার এক জমিদার পরিবারের সন্তান। অকসফোর্ডে ইংরাজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনো করেছেন। বিলাতের প্রবাসজীবনে তিনি কিরণশঙ্কর রায়, শরৎচন্দ্র বসু, ড. শাহিদ সুরাবর্দি, জওহরলাল নেহরু, দিলীপকুমার রায়দের সমসাময়িক ছিলেন। দেশে ফিরে দেশবন্ধুর রাজনৈতিক শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং স্বরাজ্যপার্টি ও দেশবন্ধুর 'ফরওয়ার্ড' কাগজে সহ-সম্পাদকের পদে যোগ দেন। দেশবন্ধুর সান্নিধ্যে এসে হেমন্তবাবু তাঁর মেয়েদের কোনও একজনের প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁকে বিয়ে করতে পারেননি। ফলে তিনি নিঃসংসারী জীবনযাপন করেন। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় 'নিউবেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন' নামে যে একটি সংগঠন গড়ে উঠেছিল, তিনি তার একজন কর্ণধার ছিলেন। ওই সময়েই তিনি 'পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা' প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির এক তীব্র 'বাঙাল'বিরোধী ভূমিকা ছিল। ফলে পত্রিকাটি কখনওই বাজার পায়নি। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর কয়েক মাস কাগজটি চালিয়ে হেমন্ত সরকার তা বন্ধ করে দেন। প্রায় চার বছর পর ১৯৫১ সালে তিনি আর একবার কাগজটি চালাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন দ্বিতীয়বারও।

১৯৫১ সালে পূজার মরশুমের ছুটি চলছে। আর কয়েকমাস পরেই দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। রাজনৈতিক হাওয়া তপ্ত হতে আরম্ভ করেছে। কালীপূজার কয়েকদিন আগে 'ভারতবর্ষ' অফিসে গেলাম। উপলক্ষ্য ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে বিজয়ার প্রণাম। আসল লক্ষ্য ছিল যদি ফণীদা নতুন কোনও একটা লেখার বরাত দেন। তখনকার কলকাতায় কার্তিকের মাঝামাঝি সময় থেকেই আকাশের চেহারা বদলাত। অপরাহ্নের রোদ তির্যক ও নিস্তেজ হয়ে শীতের জানান দিত। ফণীদা এত নিরহংকারী সরল মানুষ ছিলেন যে আমাকে সিঁড়ির শেষ ধাপে দেখেই তিনি চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এলেন আমাকে আলিঙ্গনের জন্য। ফলে আগে আলিঙ্গন পরে প্রণাম। চা খেতে খেতে ফণীদা বললেন, 'অতুল্য ঘোষের কাগজে কাজ করবে? ওদের কয়েকজন কিছু কাজ জানা লোকের দরকার।' পশ্চিমবাংলা প্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষ মাস পাঁচেক আগে মে মাসে 'জনসেবক' নাম দিয়ে একটি দৈনিক কাগজ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছেন ১৮ এ হরিতকী বাগান লেন থেকে। আমি জবাব দিলাম, 'আপত্তি নেই। তবে এক 'সেবক' থেকে আর এক 'সেবক' এই যা।' আমার বলা শেষ হওয়ার আগেই 'ভারতবর্ষ'-এর লেটারহেডে একটি ছোট্ট চিঠি লিখে ফেললেন। চিঠি আরম্ভ করেছেন 'কল্যাণীয়েষু স্নেহের শান্তি' বলে। চিঠিটা আমাকে দিয়ে বললেন, 'এখান থেকে হেঁটে হরিতকী বাগান লেন মিনিট সাতেক লাগবে। এখনই ঘুরে এসো।'

'লোকসেবক' থেকে বিদায় নেওয়ার সময় হল। এ সময়ের কয়েকটি কথা বলতে চাই, যা আগে বলিনি। আমি যে সময় ওই পত্রিকায় কাজ শিখতে ঢুকলাম, তার কয়েক মাস পরেই প্রায় আমার সমবয়সী একটি ফুটফুটে দারুণ সুন্দর ছেলে আমাদের দলে এল। ওর সৌন্দর্যে একটু মেয়েলি ভাব ছিল। কিন্তু ভয়ানক স্মার্ট এবং বাকপটুতায় অসাধারণ। ক্রীড়া-সম্পাদক পরেশ নন্দী ওকে দিয়ে খেলার রিপোর্ট করাতে চাইলেন। এক রকম জোর করেই পরেশ নন্দী ছেলেটিকে খেলার জগতে নিয়ে গেলেন। এই ছেলেটির নাম নিমাই ভট্টাচার্য। কিন্তু কয়েকমাস পরেই নিমাই সাধারণ রিপোর্টারের কাজে চলে এল। ১৯৬০ সাল থেকে পরবর্তী পঁচিশ বছর নিমাই ভট্টাচার্য দেশের বাঙালি সাংবাদিকদের মধ্যে খুবই পরিচিত হয়েছিল দিল্লির প্রবাসী জীবনে। যাট ও সত্তরের যুগে রাষ্ট্রপতি থেকে আরম্ভ করে যন্তরমন্তর রোডের কংগ্রেসের ঐতিহাসিক সদর দপ্তরের দারোয়ান পর্যন্ত নিমাইকে চিনতেন। উপরাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রপতি হিসাবে সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ নিমাইয়ের বাড়িতে গিয়েছেন। লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, যশবন্ত রাও চবন, সঞ্জীব রেড্ডি, কৃষ্ণমাচারি, কৃষ্ণ মেনন এমনকী মোরারজি দেশাই নিমাইয়ের দিল্লির বাড়িতে গিয়েছেন। নিমাই লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পরিবারের প্রায় ঘরের লোকের মতো ছিল। দিল্লির কূটনৈতিক মহলেও নিমাই খুব পরিচিত ছিল। আমার অর্ধশতাব্দীর সাংবাদিক জীবনে এত যোগাযোগের বাঙালি সাংবাদিক খুব কমই দেখেছি। সম্ভবত তাঁর এই অপরিসীম যোগাযোগের জন্য দিল্লির বাঙালি সাংবাদিকদের কাছে সে মোটেই জনপ্রিয় ছিল না। ফলে কোনও বড় বাংলা বা ইংরাজি কাগজে তার কাজ করা সম্ভব হয়নি। তবে সাহিত্য তাকে এই শূন্যতা ভরিয়ে দিয়েছে। দিল্লির মানুষের জীবন নিয়ে নিমাই বহু গল্প উপন্যাস লিখেছে। তার দু'একটি উপন্যাস সিনেমা হয়েছে। পঞ্চাশ বছর আগে আমরা যারা খবরের কাগজের জগতে পদার্পণ করেছিলাম, নিমাই তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নাম করেছে।

এ বার একটি শোকসভা রিপোর্ট করার ঘটনা বলছি। সেটি হল ১৯৫০ সালে নভেম্বরের শেষে অথবা ডিসেম্বরের গোড়ায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শোকসভা। এই শোকসভার সংগঠক কারা ছিলেন মনে করতে পারছি না। তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক সেনেট হলে এই সভা হয়েছিল। সেনেট হলের বাঁধানো সিমেন্টের মঞ্চে সতরঞ্চির ওপর সাদা কাপড় বিছিয়ে তার ওপর একটি জলচৌকি রাখা হল। ওই জলচৌকির সামনে বসে সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পাশে বসে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সম্ভবত তখনও ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রামতনু লাহিড়ি অধ্যাপক। হল লোকেলোকারণ্য। কিন্তু একেবারে নিঃশব্দ। শোকস্তব্ধ বলতে যা বোঝায় তাই। সেনেট হলের পুবদিকের খোলা বারান্দায় গায়ে-গা-লাগিয়ে লোক দাঁড়িয়ে। ভিড় উপচে পড়ছে ট্রাম লাইনে ও কলেজ স্কোয়ারের ফুটপাথে। আমার সাংবাদিক জীবনে একজন সাহিত্যিকের শোকসভায় এত শোকাকুল লোক আমি আর কখনও দেখিনি। এদিকে মঞ্চের দু'পাশের দেয়ালে যে দু'টি বালব লাগানো, সেগুলোর 'কানেকশন লুজ' থাকার জন্য জ্বলছিল ও নিভছিল। অস্বস্তিকর অবস্থা, কিন্তু এর জন্য কোনও গুঞ্জন নেই। শ্রোতাদের মধ্যে থেকে কেউ বলে উঠলেন, 'বিদ্যুতের আলো নিভিয়ে প্রদীপের আলো জ্বালানো হোক, যে আলো বিভূতিবাবু ভালবাসতেন।' সে সময় সেনেট হল ভবনের নীচে উত্তরদিকে কয়েকজন দারোয়ান পরিবার নিয়ে বাস করতেন। দারোয়ানদের কেউ তখনই দ্রুত তাঁদের ঘরের ঠাকুরের কাছে জ্বালানো প্রদীপ নিয়ে এসে তারাশঙ্করবাবুর সামনে বসিয়ে দিলেন। বিদ্যুতের আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। অতবড় সেনেট হলে ছোট একটি প্রদীপের ম্লান দীপশিখা সমগ্র পরিবেশকে আরও শোকাকুল করে তুলল। সভাপতি তারাশঙ্করবাবু প্রথমে

ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে বক্তৃতা করতে বললেন। তারাশঙ্করবাবু বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলা সাহিত্যের 'এক স্নিগ্ধ অমলিন ঘৃত দীপ' বলে আখ্যায়িত করলেন। কিন্তু অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য যখন বলতে উঠলেন, তখন তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। চোখের জলের শক্তি অনেক। জগদীশবাবুর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ শ্রোতাদের চোখের জল টেনে আনল। আর যখন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চোখের জলে ভেসে যেতে যেতে বলতে লাগলেন, তখন সমস্ত শ্রোতা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। এমন দৃশ্য আমি জীবনে আর কখনও দেখিনি। নারায়ণবাবু যখন বক্তৃতা শেষ করলেন, তখন তাঁর জামার সামনের পুরোটা চোখের জলে ভেজা। ওই অবস্থায় জগদীশবাবু নারায়ণবাবুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। দু'জনের চোখের জল দু'জনকে ভিজিয়ে দিল। প্রায় অর্ধশতাব্দীর রিপোর্টার জীবনে অনেক বড়বড় রাজনৈতিক নেতার শোকসভা ও শোক মিছিলের রিপোর্ট করেছি। কিন্তু এমন চোখের জলে-ভেজা শোকসভার রিপোর্ট আর কখনও করিনি। এই একটি ঘটনা প্রমাণ করে যে বাঙালি বিভূতি-সাহিত্যকে হৃদয়ের সবটুকু উষ্ণতা দিয়ে গ্রহণ করেছে। এই প্রসঙ্গে একটু ব্যক্তিগত কথা বলে রাখি যে বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পরের রবিবার 'লোকসেবক' পত্রিকার সাহিত্য বিষয়ক পাতায় 'বিভূতিভূষণ ঃ শিক্ষক ও মানুষ'—এই শিরোনামে আমার লেখা বেরিয়েছিল। বিভূতিবাবু আমার শিক্ষক ছিলেন। গোপালনগর হরিপদ ইনস্টিটিউশনে। তাঁর জন্মশতবর্ষে 'বর্তমান' কাগজের 'সাপ্তাহিক বর্তমান'-এ বিভূতিভূষণকে নিয়ে আমার একটি বড় লেখা প্রকাশিত হয়। এই লেখার জন্য অসংখ্য পাঠক 'বর্তমান' সম্পাদককে চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের চিঠি নিয়ে ১৮ এ হরিতকী বাগান লেনের বাড়িতে গেলাম কালীপূজার (১৯৫১ সাল) কয়েকদিন আগে। এই বাড়ি থেকে দৈনিক 'জনসেবক' পত্রিকার প্রকাশ ঘটে পঁচিশে বৈশাখ তারিখে (ইংরাজি ১৯৫১ সালের ৮/৯ মে)। এই বাড়িটি জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। সে কথা পরে বলছি। আমি বিকালের দিকে ওই বাড়িতে গেলাম। ফণীন্দ্রবাবু চিঠি লিখেছেন ওই পত্রিকার বার্তা সম্পাদক শান্তিকুমার মিত্রকে। শান্তিবাবু মোটা খদ্দরের ফতুয়া গায়ে বসেছিলেন। পাশেই টেলিপ্রিন্টার বেজে চলেছে খটখট শব্দে। আমি শান্তিবাবুর হাতে চিঠিটা দিলাম শান্তিবাবু চিঠিটা নিয়ে আমাকে বসতে বললেন। শান্তিবাবু চিঠি পড়ে বললেন, 'আপনি তো খবরের কাগজের কাজ জানেন। আমাদের কাজ জানা লোককেই দরকার।' একটু ইতস্তত করে, শান্তিবাবু আমাকে বললেন, 'আজই একটু কাজ করে দিন।' আমি রাজি হলাম। সে সময় কলকাতায় সব খবরের কাগজের অফিসেই দোয়াতের কালি ও কলম থাকত। সুতরাং আমার নিজের পেন না থাকলেও আমার কাজ করতে অসুবিধা হল না। ঘণ্টা দেড়েক কাজ করার পর সন্ধ্যা হয়ে এল। এর মধ্যে আরও দু'তিন জন কাজের লোক এসে গেলে শান্তিবাবু আমাকে নিয়ে বেরিয়ে বড় রাস্তায় অর্থাৎ বিডন স্ট্রিটে এলেন। গলির মোড় থেকে একটু পুব দিকে এগিয়ে গেলেন। এগিয়ে এসেই দেখলাম একটি ছোট দোতলা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। বাড়িটি তৈরি প্রায় শেষ। বাড়িটিকে দেখিয়ে শান্তিবাবু বললেন, 'এই বাড়িতে 'জনসেবক' অফিস চলে আসবে। আমরা ঐ বাড়ির দোতলায় বসব। একতলায় থাকবে কম্পোজ ও মেশিনঘর।' এই নতুন বাড়িটি হরিতকী বাগান লেনের বাড়ির পিছনের জমিতে তৈরি হয়েছে। ওইদিন রাতে আমার খুব জ্বর এল। আমি শান্তিবাবুকে ফোন করে আমার অবস্থা বললাম। শান্তিবাবু শুনে বললেন, 'তা হলে একেবারে সুস্থ না হয়ে বাড়িতেই চলে আসবেন।' আমি পুরো সুস্থ হওয়ার আগেই নতুন জায়গায় এসে কাজ করতে শুরু করলাম। মাইনে আপাতত ঠিক হল মাসে ৬৫ টাকা। টাকার কথা উল্লেখ করে শান্তিবাবু আমাকে বললেন, 'আপনার থাকার যখনই কোনও অসুবিধা হবে, আপনি জিনিসপত্র নিয়ে চলে আসবেন। অফিসের পিছনের ঘরে আমার সঙ্গে থাকবেন।' ওই সময় আমি কলেজ স্ট্রিটে চিন্তামণি দাস লেনে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের উল্টোদিকে একটা মেসে থাকছি। তখনই আমি 'জনসেবক' অফিসে থাকা আরম্ভকরিনি। কিন্তু শান্তিদার এই উদার সহৃদয়তা আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

১৮-এ হরিতকী বাগান লেনের যে বাড়িতে 'জনসেবক' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ হয়েছিল, সেই বাড়ির মালিক হলেন সুশীলচন্দ্র দে। গোয়াবাগান অঞ্চলে সুশীলবাবুর অনেক সুসম্পত্তি ছিল। ১৯৩০/৩১ সাল থেকে এ বাড়ির সঙ্গে কংগ্রেস সংগঠনের যোগ—বিশেষ করে হুগলি, হাওড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের কংগ্রেস কর্মীদের আস্তানা ছিল এই বাড়িটি। এই বাড়ির একতলায় একটি ছাপাখানা ছিল। 'জুপিটার প্রিন্টিং ওয়ার্কস' নামে। এই ছাপাখানায় কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রচারপুস্তিকা এবং আন্দোলনের সময় বিভিন্ন গুপ্ত বুলেটিন ছাপা হত। বাড়ির একতলায় নাটমন্দির ছিল। এই নাটমন্দিরটি বিখ্যাত হয়েছিল কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে। ১৯৪১ সালের শেষের দিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তুঙ্গ অবস্থায় হিটলারের সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শরিকি ধরনায় যোগ দিল। পার্টির নেতৃত্বে জন্ম নিল 'গণনাট্য সঙ্ঘ' এবং 'গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সঙ্ঘ'।

এই দু'টি সংগঠনেরই মূল আক্রমণের লক্ষ্য ছিল একদিকে সুভাষচন্দ্র বসু ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। বিভিন্ন থিয়েটার, পথনাটিকা, এবং বুদ্ধিজীবীদের প্রচারপুস্তিকা মারফত ওই দুটি সংগঠন কংগ্রেস ও কংগ্রেস-কর্মীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ অভিযান চালাত। ১৯৪৪-৪৫ সালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, প্রমথনাথ বিশী, সুবোধ ঘোষ, প্রবোধ সান্যাল, সুকৃতি সেন প্রমুখেরা 'কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। বউবাজারে নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাড়ি এবং হরিতকী বাগান লেনের সুশীলচন্দ্র দে'র ১৮-এ নম্বরের বাড়ি কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল। কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের প্রযোজনায় সেই সময় সৃষ্টি হয়েছিল অবিস্মরণীয় 'অভ্যুদয়' নাটক। এই নাটকে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের এবং প্রবোধ সান্যালের কণ্ঠ এবং তারাশঙ্করের ও সুবোধ ঘোষের ভূমিকা সেই সময় জাতীয় আন্দোলনকে খুবই উজ্জীবিত করেছিল। ১৮-এ হরিতকী বাগান লেনের বাড়িতে এই নাটকের রিহার্সাল হত। বাড়ির গৃহকর্ত্রী লীলাময়ী দে দিনের পর দিন এই নাটকের অংশগ্রহণকারীদের হাসিমুখে আপ্যায়ন করে যেতেন। 'অভ্যুদয়' নাটকে অংশগ্রহণকারী দু'জন নৃত্যশিল্পী তখন খুব নাম করেছিলেন। একজন দীপ্তি সান্যাল (পরবর্তীকালে তিনি দীপ্তি ত্রিপাঠি, অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর স্ত্রী) দীর্ঘদিন বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা ছিলেন। আর একজনের নাম মনে করতে পারছি না। তবে তিনি ছিলেন বিখ্যাত অ্যালজেব্রা গণিতজ্ঞ কে পি বসুর নাতনি। পরে আমেরিকা-প্রবাসী হয়েছিলেন। তাঁর স্বামী হিতব্রত রায় একজন স্বাধীনতাসংগ্রামী এবং কাশুকবি রজনীকান্তের দৌহিত্র। হরিতকী বাগান লেনের এই বাড়িতে কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষ 'স্বাধীনতার আগে 'নির্ণয়' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় অতুল্য ঘোষের একটি বিখ্যাত লেখা ধারাবাহিক প্রকাশিত হত। লেখাটি ছিল 'গান্ধীবাদ ও নৈরাজ্যবাদ'। পরে এটি পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে চট্টগ্রামের বিপ্লবী এবং স্মরণীয় গান্ধীবাদী নেতা চারুবিকাশ দত্তের সম্পাদনায় অতুল্য ঘোষ এই বাড়ি থেকে সাপ্তাহিক 'জনসেবক' পত্রিকা বের করেন। এটিই পরে দৈনিকে রূপান্তরিত হল। দৈনিক 'জনসেবক' এর মুদ্রাকর ছিল জুপিটার প্রিন্টিং ওয়ার্কস। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন অতুল্য ঘোষ এবং প্রকাশক ছিলেন নির্মলেন্দু দে। এই নির্মলেন্দু দে'র পিতা হলেন বাড়ির মালিক সুশীলচন্দ্র দে। নির্মলেন্দু দে 'বদুবাবু' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে প্রায় এক দশক কংগ্রেস রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।

বিডন স্ট্রিটে (২৭ বি বিডন স্ট্রিট) 'জনসেবক' পত্রিকার নতুন বাড়িতে অফিস স্থানান্তরিত হলে সেখানে একটি আলাদা ঘরে এসে বসতেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, সজনীকান্ত দাস, সুমথনাথ ঘোষ। এঁরা প্রথম দু'তিন বছর সম্পাদকীয় লিখতেন। 'সপ্তডিঙা' নামে ছোটদের একটি বিভাগ ছিল। এটি দেখতেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র। ১৯৫২ সালে প্রথম নির্বাচনের পর তারাশঙ্করবাবু বিধান পরিষদের (অর্থাৎ আপার হাউস) সদস্য হলেন। প্রমথনাথ বিশী দিল্লিতে রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির মনোনীত সদস্য হলেন। ১৯৫৩ সালের পর এঁরা কেউ বিশেষ 'জনসেবক' পত্রিকা অফিসে যাতায়াত করতেন না। তবে লেখা পাঠাতেন। একমাত্র সপ্তাহে একদিন নিয়মিত আসতেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র। বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও সম্পাদকীয় লেখার দায়িত্বও শান্তিবাবুকে বেশিরভাগ দিন বহন করতে হত। অতুল্যবাবু বাড়ি ফেরার পথে (কারবালা ট্যাঙ্ক লেন) প্রায় প্রতিদিনি রাত্রে অফিসে আসতেন। পরিবর্তন ও পরিবর্ধন দুই-ই করে দিতেন। ১৯৫৪ সাল থেকে শান্তিবাবুর ওপর থেকে কাজের চাপ কমানোর জন্য অতুল্যবাবু দেশবিভাগকালীন সময়কার বিখ্যাত বাংলা দৈনিক 'ভারত'-এর সম্পাদক প্রভাতকুমার গাঙ্গুলিকে এই পত্রিকায় নিয়ে এলেন। প্রভাত গাঙ্গুলির একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। উনিশ শতকের বাংলায় নারী-শিক্ষা প্রবর্তন প্রচার ও নারী-স্বাধীনতার আগ্রহী পুরুষ দ্বারিক গাঙ্গুলিমশাই-র পুত্র হলেন এই প্রভাতবাবু এবং প্রভাতবাবুর মাতৃদেবী কাদম্বরী গাঙ্গুলিই প্রথম বাঙালি মহিলা ডাক্তার। প্রভাতবাবুর মা যেদিন কলকাতা মেডিকেল কলেজে মৃতদেহ ডিসেকসন করেছিলেন সেদিন ফোর্ট উইলিয়ম থেকে তোপধ্বনি করে এই মহিলাকে সম্মান দেখানো হয়েছিল। প্রভাতদার সঙ্গে প্রায় পাঁচবছর কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার কাছে আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। পরে প্রভাতদার প্রসঙ্গে আসব।

আমার সাংবাদিক জীবনে এই 'জনসেবক' পত্রিকায় কাজের মধ্য দিয়ে আমি বড় হলেও এটিকে আমি কখনও একমাত্র খবরের কাগজ হিসাবে দেখিনি। আমি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুম হিসাবেও দেখেছি। এই কাগজের জনবল খুব কম ছিল। বার্তা সম্পাদকসহ সাবএডিটর এবং রিপোর্টার মিলে সর্বসাকুল্যে দশজন। আমি ও সাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ছাড়া বাকিরা সব কোনও না কোনও ভাবে কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সাবএডিটর হিসাবে আমার প্রধান কাজ ছিল বিদেশি সংবাদের সম্পাদনা করা। এ ছাড়া রিপোর্টার হিসাবে আমার কাজ ছিল শিক্ষা সংক্রান্ত, বিশেষ করে কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের খবরাখবর এবং সেনেটের সভার রিপোর্ট করা। এ ছাড়া মাঝে মাঝে বিধানপরিষদ ও বিধানসভার রিপোর্ট করা। এই কাজে আমার বার্তাসম্পাদক আমাকে অপরিসীম স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

এই কাগজে প্রথম দু'বছরে আমি যে সব ঐতিহাসিক বিদেশি সংবাদের বাংলা তর্জমা ও সম্পাদনা করেছি তার মধ্যে আলোচ্য ছিল ইরানের প্রধানমন্ত্রী ড. মহম্মদ মোসাদেকের অ্যাংলো ইরানিয়ান অয়েল (Anglo Iranian Oil Company)। জাতীয়করণ ঘোষণা। এই কোম্পানি সেই সময় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় তেল শোধনাগার ও সরবরাহ কোম্পানি ছিল। ড. মোসাদেকের এই ইংরাজ কোম্পানি জাতীয়করণ করায় মধ্যপ্রাচ্যে প্রায় যুদ্ধের উপক্রম হয়েছিল। ব্রিটিশ রণতরীগুলি উপসাগরীয় অঞ্চল অবরোধ করে ফেলেছিল। কিন্তু আমেরিকা ব্রিটিশ সরকারকে নিরস্ত্র করেছিল। আমেরিকার মধ্যস্থতায় ইরান ও ইংরাজ কোম্পানিকে কিস্তিতে ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয়। কিন্তু এই জাতীয়করণের ঘটনা এশিয়া ও আরবভূখণ্ডে ইংরাজদের শতাব্দীপ্রাচীন অর্থনৈতিক আধিপত্যের পশ্চাদপসরণের সূচনা।

এটা ইতিহাসগত ভাবে অনস্বীকার্য যে অ্যাংলো ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানি জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে সমাজবাদী চিন্তাধারার স্ফুরণ ঘটেছিল। এই চিন্তানায়ক ছিলেন ইরানের সেই সময়কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হোসেন ফাতেমি। লন্ডনের রয়্যাল ইনসটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ারস থেকে ডকটরেট করা এই রাজনীতিবিদ খুব সহজ স্টাইলিশ ইংরাজি বলতেন। ড. মোসাদেকের ইংরাজিও খুব সহজ ও সুন্দর ছিল। এঁদের বলা ইংরাজির বাংলা তর্জমার জন্য আমাকে কখনওই ডিকশনারি ব্যবহার করতে হয়নি। মহম্মদ মোসাদেক এক অসাধারণ মানুষ ছিলেন। মুখাবয়ব ছিল নেহরুর মতো। একজন স্নেহপ্রবণ আবেগময় ব্যক্তি এই মোসাদেক। তিনি ইরানিয়ান মজলিসে (পার্লামেন্ট) আসতেন নাতনিকে কোলে করে। তিনি যেদিন অ্যাংলো ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানির জাতীয়করণের যুগান্তকারী ঘোষণা করলেন ইরানের মজলিসে, তখন তাঁর নাতনি প্রধানমন্ত্রীর টেবিলে বসে খেলছিল। বক্তৃতার সময় মোসাদেকের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। দাদুর চোখে জল দেখে বিহ্বল হয়ে নাতনি দাদুর কোলে ওঠবার জন্য দু'হাত বাড়িয়ে দিল। মোসাদেক হাত বাড়িয়ে নাতনিকে কোলে তুলে তার মুখ চুম্বন করে কখনও হেসে কখনও কেঁদে তাঁর জাতীয়করণের ঘোষণা শেষ করেছিলেন। এর কিছুদিন পরে ১৯৫২ সালের মাঝামাঝি সময়ে সম্ভবত জুলাই মাসে মিশরে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হল। আর একটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটল মধ্যপ্রাচ্যে। এটা ছিল এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থান, যা সাধারণত মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রে কখনও ঘটে না। জেনারেল নজিব ও কর্নেল নাসের যখন মিশরের ক্ষমতা দখল করলেন তখন রাজা ফারুক তাঁর দেশের এক সমুদ্রসৈকতে জলকেলি করছিলেন। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা রাজা ফারুককে খবর দিল যে তাঁর রাজত্ব খতম। ফারুক জল থেকে উঠে ধীরে সুস্থে জামা কাপড় পরলেন। অসম্ভব মোটা ছিলেন তিনি। ওই সমুদ্র সৈকত থেকে তিনি অভ্যুত্থানের নায়কদের সঙ্গে কথা বললেন। ওদের তিনি জানিয়ে দিলেন যে রাজতন্ত্রে তাঁর আর কোনও মোহ নেই। তবে তিনি শেষবারের মতো কায়রোর প্রাসাদে যেতে চান। কিছু জিনিসপত্র গুছিয়ে পাড়ি দেবেন। অভ্যুত্থানের নেতারা তাতে রাজি হলেন। রাজা ফারুক প্রাসাদে ফিরলেন। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলেন। তাঁর কোনও স্ত্রীই সঙ্গে ছিল না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিজের বিমানে করে প্যারিস চলে গেলেন রাজা ফারুক। যাবার সময় সাংবাদিকদের বলে গেলেন, 'এখন থেকে পৃথিবীতে কেবল একটাই রাজা থাকবে 'কিং অব স্পেড' (তাসের রাজা)। যে-সন্ধ্যায় মিশরে এই ঘটনাটি ঘটছিল, সেদিন বিকাল থেকে কলকাতা শহরে চলেছে প্রবল বৃষ্টি। শহরে এই দুর্যোগের মধ্যে মারা গেলেন কবি মোহিতলাল মজুমদার।

কবি মোহিতলাল খুব দুর্মুখ ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের কাব্য জগতে যে সময় রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারও অস্তিত্ব স্বীকার করা হত না, সে সময়ে মোহিতলালের আবির্ভাব যেন দুয়ার ভেঙে ঘরে চলে আসা। তাঁর দুর্মদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে তিনি সমুজ্জ্বল। ইউনিভার্সিটি ইনসটিটিউট হলে তাঁর জন্য শোকসভার আয়োজন করা হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু বিদগ্ধ অধ্যাপক ও ছাত্র এই সভায় এসেছিলেন। কারণ মোহিতলাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রধান ছিলেন। স্যার আশুতোষ যেমন কুমিল্লা শহরের একটি স্কুল থেকে বাংলার শিক্ষক দীনেশচন্দ্র সেনকে এনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধানের পদে বসিয়েছিলেন, তেমনই ঢাকার নবাব স্যার সলিমউল্লাহ্ হুগলি জেলার একটি গ্রামের স্কুল থেকে বাংলার মাস্টারমশাই মোহিতলাল মজুমদারকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই পদে বসিয়েছিলেন। দীনেশ সেনের ক্ষেত্রে এই আপত্তি উঠেছিল যে একজন গ্র্যাজুয়েট কি বিভাগের প্রধান হতে পারেন? কিন্তু দীনেশবাবুর ক্ষেত্রে স্যার আশুতোষ চ্যান্সেলার গভর্নর দিয়ে ওই ব্যতিক্রম ঘটিয়েছিলেন। মোহিতলালের ক্ষেত্রেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই একই আপত্তি উঠেছিল। মোহিতবাবুর ক্ষেত্রে ওই একইভাবে ব্যতিক্রম ঘটানো

হয়েছিল। এই শোকসভায় অন্য অনেকের মধ্যে অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী ছিলেন। প্রথিতযশা এই অধ্যাপক তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষোভ ও বেদনাকে এই শোকসভায় প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। মোহিতলালের আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রধান ছিলেন অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী। এই আত্মভোলা অধ্যাপককে হঠাৎ একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাংলাবিভাগের প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দিলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন মোহিতলাল মজুমদার। ফলে জনার্দনবাবুকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। সেই সময় এই বিরল অধ্যাপক এক চক্রান্তের শিকার হয়ে শেষ পর্যন্ত সরকারের 'বেঙ্গল জুনিয়র এডুকেশন সার্ভিস'-এ যোগ দিয়ে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে পড়াতে চলে গেলেন। জনার্দনবাবু মাইকেল মধুসূদন-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি যখন পড়াতেন 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়.....' তখন তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত। তিনি কখনওই 'মাইকেল' উচ্চারণ করতেন না। তিনি বলতেন, 'দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন'। জনার্দনবাবু ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলে বাংলা অনার্সের ছাত্ররা পরিহাস করে বলত 'চক্রকুলোদ্ভব কবি শ্রীজনার্দন।' এই উক্তি মাঝে মাঝে জনার্দনবাবুর কানেও আসত। মধুসূদনের প্রতি জনার্দনবাবুর আত্মনিবেদনের সম্ভবত এটাও একটি কারণ যে জনার্দনবাবুও যশোর জেলার লোক এবং তাঁরও পৈতৃক ভিটা সাগরদাঁড়ির সন্নিকটে ছিল।

এরপর ১৯৫৩ সালের গোড়ায় সম্ভবত এপ্রিল মাসে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বড় ঘটনা মার্শাল যোসেফ স্তালিনের মৃত্যু। স্তালিনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পি টি আই এবং ইউ পি আই এই দু'টি নিউজ এজেন্সির টেলিপ্রিন্টারে যেভাবে সংবাদ আসছিল, তাতে টেলিপ্রিন্টার থেকে কাগজ ছিঁড়ে সাজিয়ে রাখাটাই ছিল নিদেনপক্ষে দশটা লোকের কাজ। সে সময় নিউজ এজেন্সিগুলির নিজস্ব এডিটিং ব্যবস্থা খুব ভাল ছিল। খুব বড় খবরের ক্ষেত্রে পি টি আই তিন রকমের 'রাউন্ড আপ' দিত। খবরের কাগজের পরিভাষায় সেগুলিকে বলা হত (১) ইভিনিং রাউন্ড আপ, (২) নাইট রাউন্ড আপ (৩) রাউন্ড আপ ফর মর্নিংগারস অর্থাৎ সকালে যে কাগজগুলি বের হবে তাদের জন্য।

এই ব্যবস্থা ছোট কাগজগুলির পক্ষে খুব সহায়ক ছিল। স্তালিনের মৃত্যুর দিন দুপুর বারোটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত সংবাদ ঝাড়াই বাছাই করে আমাদের কাজ করতে হয়েছে। এর মধ্যে আবার ভিন্ন স্বাদের খবর এল একটি। জন ফস্টার ডালেস তখন আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী। বিশ্বরাজনীতির এক পরাক্রমশালী নেতা। তিনি ওয়াশিংটনে সোভিয়েত দূতাবাসে গিয়ে স্তালিনের শোক পুস্তিকায় লিখে এলেন, 'মাত্র একটি মানুষ পৃথিবীর মানবজাতির কী অপূরণীয় ক্ষতি করতে পরে, যোসেফ স্তালিন তার একমাত্র প্রমাণ।' কিন্তু এর সাড়ে তিন বছর পর ১৯৫৬ সালের শেষে সোভিয়েত পার্টি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ স্তালিনের রোমহর্ষক নিষ্ঠুরতার যে দলিল প্রকাশ করলেন, তখন মনে হয়েছিল জন ফস্টার ডালেসের উক্তি কতখানি মর্মান্তিক সত্য।

আমি আগেই বলেছি যে খবরের কাগজের এক আলাদা জগৎ আছে, যে-জগতের খবর অন্তত সে সময় বাইরের লোকদের কাছে পৌঁছত না। 'বসুমতী' পত্রিকাগোষ্ঠীর মালিকদের একটি বড় অংশ এই খবরের কাগজটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য হেমেন্দ্রপ্রসাদের দ্বারস্থ হলেন। যতদূর মনে পড়ে সেটা ১৯৫২ সালের শেষের দিকে হবে। এই সময় বারীন্দ্রনাথ ঘোষ ওই পত্রিকার সম্পাদক। বারীনবাবুকে সম্পাদকের পদ ছেড়ে দিতে বলা হল। কিন্তু তিনি তাতে নারাজ। ফলে একদিন শেষ রাতে কাগজ ছাপতে যাওয়ার আগে প্রিন্টার্স লাইন পরিবর্তন করা হল। বারীন্দ্রনাথ ঘোষের বদলে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের নাম ছাপা হল। রাত্রি ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হেমেন্দ্র প্রসাদ 'বসুমতী' অফিসে চলে গেলেন। সকালে বারীনবাবুর লোকেরা বারীনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে অফিসে ঢুকতে এসে বাধা পেলেন। আরম্ভ হল মারামারি। লাঠিসোটা ও ইঁটপাটকেলের যথেচ্ছ ব্যবহার। বারীন ঘোষ গুরুতর আহত হলেন। ধস্তাধস্তিতে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষেরও বহু জায়গা কেটে ছিঁড়ে গিয়েছে। শান্তিরক্ষার জন্য পুলিস পিকেট বসল। ব্যাপারটা মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় পর্যন্ত গড়াল। তিনি বারীনবাবুর চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন। কিন্তু 'বসুমতী'র সম্পাদক হিসাবে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের পক্ষই অবলম্বন করলেন। শেষ পর্যন্ত বিধানবাবু বারীন ঘোষের মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিলেন। এই সময় একদিন সকালে আহত হেমেন্দ্রপ্রসাদকে দেখতে গেলাম। খালি গায়ে ছিলেন। দেহের বহু জায়গায় পুলটিস লাগানো। দিব্যি হাসিখুশি। আমাকে বললেন, 'তুমি ভেবেছিলে আমি বুঝি শয্যা নিয়েছি!' এই সময় থেকে ওঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ অনেকটা কমে গিয়েছিল। করণ তিনি তখন বিকাল থেকে রাত নটা-দশটা পর্যন্ত 'বসুমতী' অফিসেই থাকতেন। সম্ভবত ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত তিনি 'বসুমতী' পত্রিকায় (দ্বিতীয় দফায়) কাজ করে গিয়েছেন। এই সময় ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'বসুমতী' পত্রিকায় হেমেন্দ্রপ্রসাদের একটি বিখ্যাত সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল। সেটি ছিল নেহরু-নুন চুক্তি প্রসঙ্গে। স্যার মালিক ফিরোজ খাঁ নুন তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমণের জন্য চুক্তি করতে তিনি ভারতে আসেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী বেগম নুন। বেগম নুন দিল্লির

এক ব্রিস্টান পরিবারের মেয়ে। দেখতে বেশ সুন্দরী ছিলেন। দেশবিভাগের আগে দিল্লি সেক্রেটারিয়েটে পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের স্টেনোগ্রাফার ছিলেন। ফিরোজ খাঁ নুন ওই দপ্তরেই অফিসার ছিলেন। জওহরলাল নেহরুও ওই সময় থেকে ভদ্রমহিলাকে চিনতেন। যা হোক পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খাঁ নুন বেগমকে নিয়ে যখন দিল্লিতে এলেন তখন বিমানের সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় বেগমসাহেবার পায়ের এক পাটি স্লিপার ফসকে সিঁড়ির একেবারে নীচের ধাপে চলে আসে। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন নেহরু। বেগম অপ্রস্তুত। এক পা খালি আর এক পায়ে স্লিপার। পাকপ্রধানমন্ত্রীও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এই সময় নেহরু দ্রুত হাত বাড়িয়ে বেগম নুনের এক পাটি স্লিপার তুলে নিয়ে তাঁর পায়ে পরিয়ে দিলেন। এই খবরটি পরের দিন ভারত ও পাকিস্তানের সব খবরের কাগজে প্রকাশিত হল। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'বসুমতী'তে এক তীব্র শ্লেষাত্মক সম্পাদকীয় লিখলেন। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল—'কি আর রেখেছো বাকিরে।' সম্পাদকীয় তিনি আরম্ভ করেছিলেন এই ভাষায়ঃ 'বেগম ফিরোজ খাঁ নুনের ত্যক্ত পাদুকা বহনকারী জওহরলাল নেহরু.....'। সম্পাদকীয়টি নেহরুর পাকিস্তান নীতির বিরোধিতায় পূর্ণ ছিল। সম্ভবত এটি ছিল তাঁর শেষ উল্লেখযোগ্য সম্পাদকীয়। ১৯৫৯ সাল থেকে তাঁর শরীর খারাপ হতে আরম্ভ করে। 'বসুমতী' পত্রিকার আর্থিক অবস্থাও দিন দিন খারাপ হতে থাকে। সাংবাদিক ও অসাংবাদিক কর্মীরা তাঁদের শৃঙ্খলাবোধ হারিয়ে ফেলেন। পত্রিকার প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'বসুমতী' থেকে বিদায় নেন। সেটে বোধহয় ১৯৬৩ সালের শেষের দিক হবে। এরপর তিনি আর বছর তিনেক বেঁচে ছিলেন। এই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন সাংবাদিক ভারতের সাংবাদিকতার ইতিহাসে বিরল। কিন্তু তাঁকে নিয়ে বলতে গেলে কিছুই লেখা হয়নি। মৃত্যুর দিন নিমতলা শ্মশানে দাঁড়িয়ে একমাত্র বড় সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ওই কথাই বলেছিলেন।

স্তালিনের মৃত্যুর দশ-বারোদিনের মধ্যে একদিন দুপুরে (১৯৫৩) এক সাংঘাতিক খবর এল। স্তালিনের অতি বিশ্বস্ত সোভিয়েত গুপ্ত পুলিশের (কে জি বি) প্রধান নায়ক ল্যাভরেন্তি বেরিয়াকে মেরে ফেলেছে ক্রুশ্চেভ, বুলগানিন ও মালেনকভ, সোভিয়েত ইউনিয়নের এই ত্রয়ী নেতৃত্ব। মালেনকভ তখন প্রধানমন্ত্রী। বেরিয়ার হত্যা বিশ্বরাজনীতিতে তুমুল আলোড়ন তুলল। কারণ ব্যক্তিগত নিষ্ঠুরতায় বেরিয়ার জুড়ি ছিল না। সোভিয়েত রাজনীতিতে ট্রটস্কি, বুখারিনসহ স্তালিনের সকল প্রতিপক্ষকে খতম করে দিয়েছিলেন এই বেরিয়া। এম এন রায় এক অভাবনীয় ক্ষিপ্রতার জন্য বেরিয়ার হাত থেকে রেহাই পেয়ে যান। স্তালিনের মৃত্যুর পর পশ্চিমী কূটনীতিকেরা ভেবেছিলেন বেরিয়াই সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বেসর্বা হবেন। কিন্তু ক্রুশ্চেভ এক দারুণ তৎপরতার সঙ্গে বেরিয়াকে কোণঠাসা করে দ্রুত তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলেন। দেরি হলেই ক্রুশ্চেভ, বুলগানিন, মালেনকভ, মলোটোভ ও ভিসিনিস্কিকে পৃথিবী থেকে সরে যেতে হত!

এর মধ্যে ১৯৫২ সালের একটি বড় ঘটনার কথা বলা হয়নি। দেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের শেষ পর্ব পশ্চিমবাংলায় শেষ হয়েছে। আমি পারিবারিক কারণে কয়েক দিনের জন্য খুলনা গিয়েছিলাম। তখনও পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার মধ্যে পাসপোর্ট হয়নি। শিয়ালদা থেকে টিকিট কেটে ট্রেনে উঠলেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাওয়া যেত। আমি খুলনা থেকে যেদিন কলকাতা ফিরব সেদিন ছিল ২১ ফেব্রুয়ারি। খুলনা থেকে তখনও রাত সাড়ে আটটা নাগাদ যে ট্রেন ছাড়ত, তার নাম ছিল 'বরিশাল মেল'। ট্রেন নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছু পরে ছাড়ল। যশোর স্টেশনে ট্রেন যখন এসে থামল, তখন রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। তবু গাড়ি থেকে নেমে প্লাটফরমে দাঁড়ালাম। হঠাৎ প্লাটফরমের বাইরে থেকে চোঙা ফুঁকে ঘোষণা কানে এল 'শহরে অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হল'। ভয় পেয়ে গেলাম, তা হলে কি শহরে কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। দ্রুত কামরায় উঠবার জন্য পা বাড়ালাম। কালো কোট পরা রেলের দু'জন চেকার ফিসফিস করে বললেন ঢাকায় খুব হাঙ্গামা চলছে। ওই কথাগুলি কানে নিয়ে ট্রেনের মধ্যে বসে রইলাম। ট্রেনটা যখন দমদম ক্যান্টনমেন্টে থামল, তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনের তখন বাংলা নাম ছিল 'দমদম ছাউনি'। দমদম জংশন স্টেশনে গাড়ি থামলে খবরের কাগজের হকার পেলাম। বাংলা খবরের কাগজগুলিতে ব্যানার হেড লাইন ঃ ঢাকায় ছাত্র মিছিলে পুলিসের গুলি, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি, ছাত্রদের শহিদের মৃত্যুবরণ। কিন্তু দুপুরে স্কুল-কলেজ খোলার পরও কলকাতার ছাত্রদের মধ্যে তেমন কোনও উত্তেজনা দেখা গেল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরও ছিল উত্তেজনাহীন। সম্ভবত মাত্র দু'বছর আগে পূর্ববাংলার হিন্দুবিরোধী দাঙ্গায় লক্ষ লক্ষ হিন্দুর বাস্তুত্যাগ এই ঔদাসীন্যের কারণ। কারণ তখন কলকাতা উদ্বাস্তু নগরীতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। তবে কলকাতার বাংলা খবরের কাগজগুলি তাদের কর্তব্য পালনে কেউই পিছিয়ে ছিল না।

রম্য-সংলাপ

বিংশ-একবিংশ সংবাদ

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

বিংশ ঃ একবিংশবাবু, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলিবার বড় বাসনা। কিন্তু কথা বলিব কী করিয়া, আমি তো নাই।

একবিংশ ঃ আপনার কথার অর্থ ঠিক বুঝিলাম না। আপনি বলিতেছেন যে আপনি নাই অথচ আমি দেখিতেছি আপনি আছেন এবং আমাকে সম্বোধন করিতেছেন।

বিংশ ঃ বিংশ শতাব্দী গত হইয়াছে, এই কথা মনে রাখিয়াই আমি বলিয়াছি আমি নাই। আমার ভয় আপনি ভূতের কণ্ঠস্বর শুনিতেছেন।

একবিংশ ঃ না, আমি তাহা ভাবিব না। আপনি ভূত নন। আপনি অতীত। মনুষ্যসভ্যতার ইতিহাসে অতীত বর্তমানের সহোদর, ভবিষ্যতের পিতামহ।

বিংশ ঃ আপনার এই কথা শুনিয়া আমি বড় আশ্বস্ত বোধ করিতেছি। কালক্রমে আমি নাই, তবুও যে আমি আছি ইহা শুনিয়া আমার বড় আহ্লাদ হইতেছে।

একবিংশ ঃ আমি বলি, হে অতীত কথা কও।

বিংশ ঃ বেশি কথা আমার ঝুলিতে নাই। আমি একটি কথা বলার জন্যেই ব্যস্ত হইয়াছি।

একবিংশ ঃ সেই কথাটি আপনি প্রাণ ভরিয়া বলিতে পারেন, আমি শুনিয়া ধন্য হইব।

বিংশ ঃ কথাটি এই যে সম্প্রতি এক বঙ্গীয় কবির সত্তর বছর পূর্ণ হইল। আমার কালের এক বঙ্গীয় কবিরও সত্তর বছর পূর্ণ হইয়াছিল। আমার জিজ্ঞাসা এই, তখন বাঙালি সেই কবিকে লইয়া যত উৎসব করিয়াছিল, তেমন উৎসব একবিংশ শতাব্দীর সত্তর বছরের এই কবিকে লইয়া হইতেছে কি না।

একবিংশ ঃ এই প্রশ্নের কী উত্তর দিব জানি না। ১৯৩১ সালে এক বঙ্গীয় কবিকে লইয়া বাঙালি যে কী করিয়াছিল তাহা আমি দেখি নাই। আপনি দেখিয়াছেন, প্রায় পঁচাত্তর বছর পূর্বে সেই কালের বঙ্গীয় কবিকে কীভাবে সম্বর্ধনা জানাইয়াছে তাহা আপনিই বলিতে পারেন।

বিংশ ঃ আমাদের কালের সেই কবি যেমন বিংশের কবি তেমন উনবিংশেরও কবি। তাঁহার জীবনের প্রায় অর্ধেক উনবিংশ, আর বাকি অর্ধেক বিংশ। যে বঙ্গীয় কবি সম্প্রতি সত্তর বছর পূর্ণ করিলেন তিনি সাতষট্টি বছর বিংশের মানুষ ছিলেন।

একবিংশ ঃ তাহা হইলে আপনি কি বলিতে চাহিতেছেন যে তিনি অতীতের কবি।

বিংশ ঃ না, আমি তেমন কথা বলিতে পারি না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এখনও রচিত হয় নাই। এমনও হইতে পারে যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতা এই একবিংশেই রচিত হইবে। তাঁহার প্রবন্ধ সম্বন্ধেও হয়ত এই একই কথা বলিবেন। উনবিংশ এবং বিংশের কবি যখন সত্তর হইলেন তখন তিনি এমন কথা বলেন নাই। একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করিয়া তিনি সত্তর হইবার প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে বিশ্বখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

একবিংশ ঃ আমাদের এই একবিংশের কবিও কিন্তু বিশ্বখ্যাতি লাভ করিতেছেন, অমিতবল এক বঙ্গীয় ইংরাজি লেখক তাঁহার বাংলা কবিতা ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের আরও ইংরাজি অনুবাদ হইয়াছে। আমি জানি না আপনার কালের বঙ্গীয় কবি তাঁহার মতো একজন গণ্যমান্য মানুষ হইয়া উঠিয়াছিলেন কি না। তিনি কলিকাতার শেরিফ হইয়াছিলেন।

বিংশ ঃ আমি স্বীকার করি আমাদের কবিকে শেরিফ কবি বলিতে পারি না। ইনি স্রেফ কবি।

একবিংশ ঃ একবিংশের এই কবির অনন্ত সম্ভাবনা, আমাদের আশা তিনি অচিরেই ভারতের রাজ্যসভার সদস্য হইবেন। তখন আমরা তাঁহাকে ভারতরাষ্ট্রের সভাকবি বা রাজকবি আখ্যা দিতে পারিব। আমাদের আশা এই সম্মানলাভের অল্পকাল পরেই তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করিবেন। এ নহে কাহিনি এ নহে স্বপন, আসিবে, সেদিন আসিবে। আপনাদের কবি সত্তর বছর পূর্ণ করিলে তিনি কী সম্বর্ধনা পাইয়াছিলেন, আপনার কাছে শুনিব। কিন্তু আমাদের কবির জয়ন্তীউৎসবে যত বঙ্গসন্তান একত্র হইয়া ভূরিভোজন করিয়াছিলেন সেরকম ভোজ বোধ হয় আপনাদের কবির সম্বর্ধনায় হয় নাই।

বিংশ ঃ আমি কোনও ভোজের সংবাদ দিতে পারিব না, আমি কেবল জয়ন্তী-উৎসব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা উপস্থিত করিতে পারি।

একবিংশ ঃ আপনি আপনাদের কবির জয়ন্তী-উৎসবের সব চাইতে চমকপ্রদ অনুষ্ঠানের কথাটি বলিতে পারেন।

বিংশ ঃ সেকালের সেই জয়ন্তী-উৎসবের কাহিনি বোধ হয় এখন সম্পূর্ণ বিস্মৃত। আর একালের বহু জ্ঞানীগুণী লেখক,

মার্কসবাদী বিপ্লবী এবং আরও অনেকে বিংশের এই শ্রেষ্ঠ কবিকে নানা ভাবে ছোট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আপনাদের এই কবিও রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন। এই কাজ তিনি এমনভাবে করিয়াছেন যে তাঁহাকে আমরা বিভূতিভূষণ বলিতে পারি। তাঁহার সারা অঙ্গে রবীন্দ্রভস্ম। ইহা ঠিক যে বহু শিক্ষিত রুচিসম্পন্ন বাঙালি তাঁহার এই কাজকে ছ্যাবলামি বলিয়া তুচ্ছ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখ এই যে বঙ্গদেশে আজ ছ্যাবলার বড় অভাব নাই।

একবিংশ ঃ আপনি আমাদের কবি সম্বন্ধে কটু কথা বলিতেছেন। অতীতের কথা কটু কথা হইবে না, সুকথা হইবে, মঙ্গল কাহিনি হইবে।

বিংশ ঃ আমি আপনার কাছে মূল সম্বর্ধনা সভার কথাই বলিতেছি। এই সভা ১৯৩১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় কলিকাতার মেয়র বিধানচন্দ্র রায় কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। ইহার পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ওই পরিষদের অভিনন্দনপত্র উপস্থিত করেন। ইহার পর হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষ হইতে একটি অভিনন্দনপত্র পঠিত হয়। রবীন্দ্র-জয়ন্তীপরিষদের অভিনন্দন পত্রটি লিখিয়াছিলেন সেকালের এক শ্রেষ্ঠ লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উহা পাঠ করিয়াছিলেন কামিনী রায়। এই সভাতেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'The Golden Book of Tagore' গ্রন্থখানি কবিকে প্রদান করা হয়। এই প্রসঙ্গে আমি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত অভিনন্দনপত্রের প্রথম পংক্তিটি উচ্চারণ করিতেছি—

'কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।' কথাটি শুনিয়া তখন মনে হইয়াছে যেন বাংলার নদনদী, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ-লতা-গুল্ম, বাংলার অবারিত মাঠ, গগনললাট কবি সম্বন্ধে মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

একবিংশ ঃ শরৎচন্দ্রের কথাটি সত্যই বড় সুন্দর। ইহা এক মহৎ কবি সম্বন্ধে একটি মহৎ কথা।

বিংশ ঃ আমি জানি না আপনাদের এই কবি যখন পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার কোনও সম্বর্ধনা হইয়াছিল কি না। আমাদের কবির পঞ্চাশ বৎসর পূর্তিতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কবিকে সম্বর্ধনা জানাইবার জন্য এক বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরিষদের সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অভিনন্দনপত্রখানি পাঠ করিয়াছিলেন। কবির ষাট বছর পূর্ণ হইলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। এই অভিনন্দনপত্রে বলা হইয়াছিল : 'সঙ্গীতের সহিত সাহিত্যের মিলনে তোমার হাতে উভয়ের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, তোমাকে যশোমন্দিরের উচ্চচূড়ায় তুলিয়া দিয়াছে।'

একবিংশ ঃ আপনার সকল কথা শুনিলাম, সকল কথা বুঝিলাম ; কিন্তু আমাদের কবির সকল কথা আমরা এখনও শুনি নাই। আশা করিয়া বসিয়া আছি এখন হইতে বিশ বছরের মধ্যে তাঁহার সকল কথা বলা হইবে। তিনি তখন সারা বিশ্বের এক সর্বজনপূজ্য লেখক বলিয়া গণ্য হইবেন। আমাদের লেখক নিজেই বলিয়াছেন যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এখনও লিখিত হয় নাই। এই উক্তি শুনিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতাও এখনও লিখিত হয় নাই। তাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধও ভবিষ্যতে লিখিত হইবে।

বিংশ ঃ যে-বঙ্গীয় কবি বিংশ শতাব্দীতে সত্তর বৎসর পূর্ণ করিয়াছিলেন তিনি তাঁহার জীবনের বাকি দশ বৎসরে পঞ্চাশখানির অধিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কোনও একখানি তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কি না জানি না। তবে তাঁহার জীবনের শেষ দশ বৎসরে তিনি যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কয়েকখানি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিতে পারি। কাব্যগ্রন্থের মধ্যে এই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহার 'পরিশেষ', 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'বীথিকা', পত্রপুট', 'শ্যামলী', 'ছড়ায় ছবি', 'প্রান্তিক', 'সেঁজুতি', 'প্রভাসিনী', 'আকাশ-প্রদীপ', 'নবজাতক', 'সানাই', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে'। এই দশ বৎসরে প্রকাশিত উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখ করিতে পারি—'দুইবোন', 'মালঞ্চ ', 'চার অধ্যায়', প্রবন্ধের মধ্যে এই সময় প্রকাশিত হয় 'মানুষের ধর্ম', 'সাহিত্যের পথে', 'কালান্তর', 'সভ্যতার সঙ্কট'।

একবিংশ ঃ আমাদের কবির লেখার হিসাব আর কি দিব। তিনি বলিয়াছেন তাঁহার রচনার পরিমাণ বিংশ শতাব্দীর কবির রচনার পরিমাণ ছাড়াইয়া গিয়াছে।

বিংশ ঃ একবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবির সম্বর্ধনায় অনেক বিশিষ্ট কবি তাঁহার সম্বন্ধে কত স্মরণীয় কথা বলিয়াছেন। অনেক বিশিষ্ট কবি তাঁহার প্রতিভার বিচিত্র প্রকাশের আলোচনা করিয়াছেন। আশা করি শীঘ্রই এইসব বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে। আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাসা এই যে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি সম্বন্ধে ওই কালের বিশিষ্ট বঙ্গীয় কবি এবং লেখকেরা তাঁহার সম্বন্ধে যে সব কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন তাহার সঙ্গে একালের বঙ্গজনের কোনও পরিচয় আছে কি না। ১৯৩১ সালের ১১ই পৌষ প্রকাশিত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত ৫০০ পৃষ্ঠার রবীন্দ্রজয়ন্তী গ্রন্থখানি এখন একখানি বিস্মৃত গ্রন্থ। এই গ্রন্থের লেখকদের মধ্যে আছেন জগদীশচন্দ্র বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, রাজশেখর বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ, মোহিতলাল মজুমদার, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বইখানি পড়িয়া মনে হইবে যেন বঙ্গদেশের সমস্ত প্রতিভাবান মানুষ সমস্বরে কবি সম্বন্ধে কথা বলিতেছেন। জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন 'বিশ্বজগতের ঐক্যতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের কবি-দৃষ্টির নিকটে ধরা দিয়াছে।' কামিনী রায় তাঁহার কবিতায় লিখিয়াছেন:

'স্নিগ্ধ রক্তরাগ রথে পূরব অম্বরে
বালারুণ রূপে যবে রবীন্দ্র উদয়,
উঠেছিল দিক্ বধূ গাহি জয় জয়,

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার প্রবন্ধে বলিয়াছেন : 'রবীন্দ্রনাথের স্বাজাতিকতা কখনও তাঁহার বিশ্বমানবিকতার বিরোধী ছিল না।' অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন : 'পৃথিবীর লিরিক কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান সবার উপরে।' রাজশেখর বসু তাঁহার প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথেরই একটি কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন :

সেই সত্য যা রচিবে তুমি
ঘটে যা তা সব সত্য নহে।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিলেন : 'বিশ্বপ্রেমের হোতারূপে তাঁহার আবির্ভাব :—ইতিহাসের অনন্ত আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলে তাঁহার স্থান চিরকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল।' অবশেষে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উক্তিটি উপস্থিত করি : 'সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও সাহিত্য ; এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ওই ক'খানা বই-ই বারবার করে পড়েছি.....সুদূর প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হ'তেই পারে না।' আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাসা এই যে এমন একখানি গ্রন্থ আপানাদের কবি সম্বন্ধে প্রকাশিত হইবে কি না।

একবিংশ ঃ অবশ্যই হইবে। তবে একটি কথা আপনাকে বলিতে চাহিতেছি। কথাটি এই যে কাব্যসংসারে রবীন্দ্রনাথের যুগ শেষ হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশে এখন কোনও রবীন্দ্রনাথ নাই, কোনও জগদীশচন্দ্র, রামানন্দ, প্রফুল্লচন্দ্র নাই। এখন এক নূতন যুগ আসিয়াছে। আমাদের কবি সেই নূতন যুগের কবি। তাঁহার ভাব ভিন্ন, ভাষা ভিন্ন, তাঁহার সব কিছুই ভিন্ন। তাঁহাকে বলিতে পারি তিনি এক নূতন যুগের নূতন রবীন্দ্রনাথ। সেই রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথ নহে।

বিংশ ঃ আপনি কি বলিতে চাহিতেছেন যে গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথ এখন মৃত।

একবিংশ ঃ 'মৃত' শব্দটি ব্যবহার করিতে সংকোচ হয়। বলিতে পারি গীতাঞ্জলির কবির যুগ শেষ হইয়াছে।

বিংশ ঃ আপনার কথা শুনিয়া ভাবিতেছি কাব্যের যুগই শেষ হইয়াছে কি না। গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হইবার প্রায় আঠারো বছর পূর্বে জার্মান মনীষী Oswald Spengler দুই খণ্ডের একখানি বই লিখিয়াছিলেন, যাহার নাম দিয়াছিলেন The Decline of the West। এই গ্রন্থে Spengler বলিয়াছিলেন কাব্যের যুগ শেষ হইয়াছে, যন্ত্রের যুগ আসিয়াছে। কবিতা রচনার চেষ্টা করিও না, যন্ত্র নির্মাণ করো। ১৮২৫ সালে Macaulay তাঁহার Milton সম্বন্ধে প্রবন্ধে প্রায় এই কথাই বলিয়াছিলেন : 'As civilization advances poetry almost necessarily declines'। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁহার 'মহাকাব্যের লক্ষণ' প্রবন্ধে ওই একই কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন সভ্যতার সঙ্গে মহাকাব্যের অহি-নকুল সম্পর্ক। Oswald Spengler-এর গ্রন্থখানি পড়িয়া বিনয়কুমার সরকার বলিয়াছিলেন 'If winter comes can spring be far behind'।

একবিংশ ঃ আমার মনে হয় না কাব্যের যুগ শেষ হইয়া গিয়াছে। কাব্যের গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সারা পৃথিবীতে এক নূতন যুগের আবির্ভাব হইয়াছে। আমাদের কবি সেই নূতন যুগের এক শ্রেষ্ঠ কবি।

বিংশ ঃ জীবনানন্দ দাশও এক নূতন যুগের নূতন কবি।

একবিংশ ঃ আমাদের কবি এক নূতনতর যুগের নূতনতর কবি। অমল হোম অনেক আধুনিক কবিকে 'অতি আধুনিক' বলিতেন। আমাদের কবি অতি আধুনিক কবি।

বিংশ ঃ আপনার কথা বুঝিলাম এবং মানিলাম। এই একবিংশ শতাব্দীতে অতি আধুনিক কবির অন্ত নাই। জীবনানন্দ বলিতেন 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি'। এখন দেখি কেউ কেউ কবি নয় সকলেই কবি।

একবিংশ ঃ আপনার এই কথাটি আমি মানিয়া লইতে পারি না। এ কথা ঠিক কবির সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে কবি আর কয়জন। দেশের বেকার মানুষের সংখ্যা অবশ্যই বাড়িতেছে। কিন্তু কবির সংখ্যা বেকারের সংখ্যার চাইতে অনেক কম।

বিংশ ঃ কাব্য সম্বন্ধে এমন গভীর কথার মধ্যে আমি যাইতে চাহিতেছি না। আমি কেবল জানিতে ইচ্ছা করি বিংশ শতাব্দীতে আমাদের কবির সত্তর বৎসর পূর্ণ হইলে বঙ্গদেশে যে আলোড়ন ঘটিয়াছিল ঠিক সেই রকম আলোড়ন আপনার কবিকে লইয়া হইয়াছে কি না।

একবিংশ ঃ এই প্রশ্নটি আমি অবান্তর বলিয়া মনে করি। বিংশ শতাব্দীর কবির সত্তর বৎসর পূর্ণ হইলে যে ঘটা হইয়াছিল তাহা একবিংশ শতাব্দীর কবিকে লইয়া হইতে পারে না।

একবিংশের বাঙালির বিচিত্র কর্ম, বিচিত্র ভাব এক বহুমুখী জীবনের সৃষ্টি করিয়াছে। এখন বাঙালি একজন কবিকে লইয়া মাতামাতি করিতে পারে না। আর একটি কথা এই আপনাদের কবিকে লইয়া বাঙালি মাতামাতি করিবার বিশেষ কারণ এই যে তিনি নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন। আমাদের কবি এখনও নোবেল পুরস্কার পান নাই। অবশ্য তিনি যে এই পুরস্কার পাইবেন সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

বিশে ঃ আপনার এই কথাটি উপেক্ষা করিতে পারি না। কিন্তু তবু জিজ্ঞাসা করি একালের কবি সম্বন্ধে দেশ বিদেশের মানুষ কী বলিতেছেন।

একবিংশ ঃ দেশ-বিদেশের মানুষ আমাদের কবি সম্বন্ধে কী বলিতেছেন তাহার হিসাব এখন দিতে পারি না। তবে আমাদের কবি যে বিংশ শতাব্দীর কবিকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন তাহা কিন্তু আপনাদের কবি এক রকম স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :

কালিদাস তো নামেই আছেন
আমি আছি বেঁচে
তাহার কালের স্বাদ গন্ধ
আমি তো পাই মৃদুমন্দ
আমার কালের কণামাত্র
পাননি মহাকবি।

বিশে ঃ কথাটি সুন্দর এবং অর্থবহও বটে। কালিদাসকে শ্রেষ্ঠ কবি বলি, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় কবিকে শ্রেষ্ঠতর কবি বলিতে দ্বিধাবোধ করি না। আপনি কি বলিতে চাহিতেছেন যে যে কোনও আধুনিক কবি ইতিহাসের বিধানে যে কোনও পূর্বকালের কবি হইতে শ্রেষ্ঠ। Shakespeare-এর পরে কত ইংরাজ কবি কত উৎকৃষ্ট কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু Shakespeare-এর সঙ্গে তাহাদের তুলনা করিতে পারি না। তিনি অতুলনীয়। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবিকেও আমরা অতুলনীয় মনে করি।

একবিংশ ঃ একবিংশের বঙ্গীয় কবিও একদিন অতুলনীয় বলিয়া গণ্য হইবেন।

বিশে ঃ তাহা হইতেই পারে। আপনাদের এই কবি নোবেল পুরস্কার লাভ করিবার পর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন কিন্তু আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে তিনি একালের কোন কবিকে কীরকম মুগ্ধ করিয়াছেন। একবিংশের সকল কণ্ঠস্বর আমার কানে পৌঁছায় নাই। তবে বিংশ শতাব্দীর সকল কণ্ঠস্বরই আমি শুনিয়াছি। এই শতাব্দীর অন্তে আপনাদের কবি সাতষট্টি বৎসর পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু আমি বুঝিয়াছি যে তাঁহার কাব্যের কোনও পংক্তি বঙ্গদেশে আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইতেছে না। বিংশের বঙ্গীয় কবির কত কথা বঙ্গদেশের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইতেছে। আকাশে কান পাতিলেই যেন তাঁহার গান শুনিতে পাই।

'আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনি লীলা তব' অথবা 'তোরা শুনিস্‌নি কি পায়ের ধ্বনি সে যে আসে আসে আসে' অথবা 'ঐ মহামানব আসে' প্রভৃতি উচ্চারণ যেন বঙ্গদেশের আকাশ বাতাস পাহাড় নদ-নদী বৃক্ষ লতাগুল্ম হইতে উৎসারিত হইতেছে।

একবিংশ ঃ আমাদের কবি মানুষের কবি। তাঁহার কণ্ঠস্বর —মানুষের কণ্ঠস্বর। আর একটি কথা আপনাকে বুঝাইতে চাহিতেছি, সেই কথাটি এই যে আমাদের কবি আধ্যাত্মিকতার কবি নহেন।

বিশে ঃ আপনার এই কথা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু এই বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের বার্তার মধ্যে যে কী গভীর দার্শনিকতা তাহাকে কী করিয়া উপেক্ষা করি। রাজা রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ ইহাদের সকলের বাণী বেদান্তের বাণী। গীতাঞ্জলির কবি দ্বৈতবাদী কবি। এই কাব্যে কবির কথা 'আমি ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট বলিয়াছেন যে ভারতীয় দর্শনের মূল তত্ত্ব অদ্বৈতের তত্ত্ব। তাঁহার শেষজীবনের কাব্যগ্রন্থ জন্মদিনের একটি কবিতার উল্লেখ করিতে পারি—

আমি চলিলাম
যেথা নাই নাম
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়
নাই আর আছে
এক হয়ে মিশিয়াছে
যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন
আমার আমির ধারা যেথা মিশে যাবে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগরসঙ্গমে।

রবীন্দ্রনাথের দর্শন বুঝিতে হইলে তাঁহার সমগ্র রচনা যত্ন করিয়া পড়িতে হইবে। তাঁহার অনেক কথাই রহস্যময়। যেমন উপনিষদের অনেক কথাই রহস্যময়। কিন্তু এই রহস্যের অন্তঃস্থলে একটি পরিচ্ছন্ন তত্ত্ব উপস্থিত—

'তুমি অশেষ তাই শূন্য সেজে শেষ করে দাও আপনাকে যে'। অর্থাৎ শূন্যও একটা সাজ। যে কোনও বস্তুর একটি সীমা আছে। ঈশ্বর অসীম হইয়া ব্রহ্ম। কিন্তু ঈশ্বরকে কবি অবস্তু বলিলেন না। অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যও ব্রহ্মকে অবস্তু বলেন

নাই। শঙ্করের ব্রহ্ম সৎ চিৎ আনন্দ। শঙ্করাচার্য তাহা হইলে নির্বিশেষ ব্রহ্মকে বিশেষিত করিয়াছেন। আমি এতগুলি কথা বলিলাম এই জন্য যে আমি জানিতে চাই আপনাদের কবির কোনও দর্শন আছে কি না এবং তাঁহার চিন্তা সম্বন্ধে কোনও চিন্তাশীল মনীষী কিছু লিখিয়াছেন কি না। রঙ্গদেশের এক শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সেই গ্রন্থের নাম রবিদীপিকা। আমাদের কালের এক বিশিষ্ট মনীষী আবু সয়ীদ আইয়ুব রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একাধিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে একখানি গ্রন্থের নাম 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৮)। এই গ্রন্থের ভূমিকায় আইয়ুব লিখিয়াছেন, কবিকে সংস্কৃত অর্থেও কবি হতে হয়। অর্থাৎ সত্যদ্রষ্টা। সেই কথাটা ভেবে বোধ করি কোলরিজ বলেছিলেন—'No man was ever yet a great poet without being at the same time a profound philosopher.' আপনার কাছে আমার প্রশ্ন এই যে আপনাদের এই কবির চিন্তাজগৎ সম্বন্ধে কোনও প্রবন্ধ বা গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে কি না।

একবিংশ ঃ আমাদের কবি এখনও তাঁহার পরিপূর্ণতা লাভ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এখনও অলিখিত। সেই গ্রন্থ লিখিত হইবার পর তাঁহার জীবন-দর্শন সম্বন্ধে নিশ্চয় অনেক গ্রন্থ, প্রবন্ধ রচিত হইবে। আপনাদের বিংশের কবি বাহান্ন বছর বয়সেই নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আমাদের কবি এখনও এই পুরস্কার লাভ করেন নাই। সারা পৃথিবীতে এখন কবির বড় ভিড়। প্রতি বৎসর এই পুরস্কারের জন্য দীর্ঘ লাইনের সৃষ্টি হয়। সেই জন্যই আমাদের কবির এই পুরস্কার লাভ করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতেছে। মনে হয় এখন আর দেরি নয়। রাজ্যসভায় মনোনীত সদস্য হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এই পুরস্কার লাভ করিবেন।

বিশে ঃ আপনার কথা বুঝিলাম এবং মানিয়া লইলাম। তবে জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে আপনাদের কবি কীভাবে ইংরাজিভাষী জগতে গৃহীত হইয়াছেন। কবি বহুবার ইংরাজিভাষী জগতে ভ্রমণ করিয়াছেন, বহু ইংরাজিভাষী কবির সাহিধ্য লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার বহু কবিতা ইংরাজিতে অনূদিত হইয়াছে এবং ছাপা হইয়াছে। আমি একজন ইংরাজ অথবা মার্কিন কবির তাঁহার সম্বন্ধে অভিমত জানিতে ইচ্ছা করি। Golden Book of Tagore গ্রন্থে বহু বিদেশি কবির আমাদের কবি সম্বন্ধে অভিমত মুদ্রিত হইয়াছে। আমি মাত্র নরওয়ের কবি Johan Bojer-এর কবি সম্বন্ধে উক্তিটি উল্লেখ করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন : Tagore is India bringing to Europe a new divine symbol, not the cross but the Lotus.'

একবিংশ ঃ Divine Symbol, Cross, Lotus ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের কবির কোনও চিন্তা নাই। তিনি আধুনিক কালের আধুনিক কবি। তাঁহার কাব্যের বিষয় আধুনিক মানুষ। তাঁহার কাব্যের মূল বস্তু আধুনিকতা।

বিশে ঃ আপনার কথা বুঝিলাম। তবে আধুনিক কালের সঙ্গে পূর্বকালের একটা রক্তের সম্পর্ক থাকিয়াই যায়। শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁহার ত্রয়ী গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে বাল্মীকি, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ এক অখণ্ড-এর বিচিত্র প্রকাশ। কোনও কবি, তিনি যতই মৌলিক হন, একেবারে শূন্যে ঝুলিতেছেন এমন হইতে পারে না। ভারতবর্ষের চিন্তারাজ্যেও দেখি ঋগ্বেদের ভাব উপনিষদের ভাবে পরিণত হইতেছে এবং উপনিষদের ভাব পরবর্তীকালের কাব্যে এক নূতন রূপ, নূতন ভাষায় উপস্থিত। বৈষ্ণব কাব্য, শাক্ত কাব্য, ব্রহ্মসঙ্গীত, বাউলের গান, রবীন্দ্র-সঙ্গীত ইত্যাদি মনে হয় একই সূত্রে গাঁথা। গীতাঞ্জলির গানে কবিরের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাই। আবার রামানুজের বেদান্তে তামিল আলওয়ার গানের প্রভাব দেখিতে পাই।

একবিংশ ঃ আপনি গানের কথা বলিতেছেন। আমাদের কবি সঙ্গীত রচয়িতা নন। তিনি কবি ; আধুনিক কবি। একালের কোনও কাব্যই সঙ্গীত হয়ে উঠে না।

বিশে ঃ আপনার কথাই ঠিক। আমি আপনাদের কবির কোনও কবিতা কোনও গায়কের কণ্ঠে শুনি নাই। অর্থাৎ আপনাদের কবিকে কখনওই রোমান্টিক কবি বলিতে পারি না। এখন প্রশ্ন হইল এই যে রোমান্টিকতা বর্জন করিয়া কোনও কবি যথার্থ কাব্য সৃষ্টি করিতে পারেন কি না। আবু সয়ীদ আইয়ুব বলিয়াছেন— 'রোমান্টিকতার মোহ থেকে মুক্তিলাভের ঐকান্তিক সাধনায় আধুনিক কবিরা এমন-কিছু থেকে নিজের মনকে বিমুক্ত করেছেন যাতে কবির চিরন্তন এবং অব্যর্থ পরিচয়'। এই অ্যান্টি-রোমান্টিকতার আদি কবি অর্থাৎ বাল্মীকি হইলেন ফরাসি কবি বোদলেয়র। বোদলেয়রের ব্যক্তিগত জীবন হইতে বুঝি বদ না হইলে বোদলেয়র হওয়া অসম্ভব। T.S. Eliot বোদলেয়রকে 'Symbol of morbidity' আখ্যা দিয়াছেন। বোদলেয়র সম্বন্ধে আইয়ুবের কথাটি স্মরণীয়—'বোদলেয়রের বিশ্বিতৃষ্ণাকে তাঁর ব্যধিগ্রস্ত মনের অভিব্যক্তি জ্ঞান করা যেতে পারে।' আমি আপনাদের কবিকে ভাবে বা স্বভাবে একজন বঙ্গীয় বোদলেয়র বলি না। তিনি সজ্ঞন এবং বোদলেয়রের বিশ্ববিতৃষ্ণা তাঁহার কাব্যে অনুপস্থিত। আমি কেবল বলিতে চাহিতেছি যে বোদলেয়রের রোমান্টিকতা-বিরোধী ভাব আপনি যাহাকে আধুনিকতা বলিতেছেন তাহা হইতে অভিন্ন। ফরাসি কবি মালার্মেও আধুনিক কবি। তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে ফরাসি মনীষী

Maritain বলিয়াছেন যে ইহা হইল 'an elaboration of pure artefact mirroring only the void.' ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ ফরাসিরাই বর্জন করিয়াছিল। কিন্তু সে আদর্শ পৃথিবীর ইতিহাসে এক নূতন যুগ আনিয়াছে। কিন্তু সাহিত্যে বোদলেয়র যে বিপ্লব আনিয়াছে তাহা সর্বনাশা। যাহাকে আপনি আধুনিক কাব্য বলেন তাহা এক শব্দসর্বস্ব কাব্য। এখন কবি মাত্রই যেন শব্দের কবি, ভাবের কবি নয়। এ কালে যে কবি ভাবের কাব্যকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন তিনি শঙ্খ ঘোষ। এই শঙ্খই বাংলা কাব্যের মঙ্গলশঙ্খ।

একবিংশ ঃ পৃথিবীর কাব্যের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আপনি যাহা বলিলেন তাহা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আধুনিক-কালে বাস করিয়া আধুনিকতাকে এড়াই কী করিয়া? উপনিষদের আধ্যাত্মিকতা এ কালে অচল। এ কালের কবি এক নূতন উপনিষদের সৃষ্টি করিয়াছেন।

বিংশ ঃ আমাদের কবিও এক নূতন উপনিষদের সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁহার 'উপনিষদের আলোকে রবীন্দ্রনাথ' এবং হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ ও উপনিষদ' গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে আমাদের কবির উপনিষদের সঙ্গে প্রাচীন উপনিষদের এক নাড়ির যোগ রহিয়া গিয়াছে। ইহাকেই আমরা বলি tradition। রবীন্দ্রনাথ বলিতেন অতীতের ভাব বর্তমানের ভাবের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

তারা মোর মাঝে সদাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তাঁর বিচিত্র সুর।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও তাঁহার বারাণসী কবিতায় বৈদিক ভাবের সঙ্গে উপনিষদের ভাবের সম্পর্ক বড় সুন্দর দেখাইয়াছেন। বারাণসী কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন :

অগ্নিহোত্রী মিলেছে হেথায় ব্রহ্মবিদের সাথে
বেদের জ্যোৎস্না-নিশি মিশে গেছে উপনিষদের প্রাতে।

একবিংশ ঃ আপনি কাব্য প্রসঙ্গে বেদ, উপনিষদের কথা তুলিতেছেন, এ কালে বেদ উপনিষদের স্থান কোথায়? এখন কেহই বেদ-বেদান্ত সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নহে।

বিংশ ঃ আমি বলি বেদ-বেদান্ত আমাদের সকল ভাবের উৎস। ষষ্ঠ শতাব্দীর তামিল কাব্য হইতে নানক, কবির, সুরদাস তুলসী সকলের গানেই বেদান্তের তত্ত্ব উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন দ্বৈত-বেদান্ত, অদ্বৈত-বেদান্ত দুই-ই বেদান্ত। বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের কথাও তাই। বাঙালি যেদিন উপনিষদবিমুখ হইবে সে দিন সে জীবনবিমুখ হইবে। আমার জিজ্ঞাস্য আপনার কবির কাব্যে বা গদ্যরচনায় বেদান্তের ভাব কতখানি উপস্থিত।

একবিংশ ঃ আমাদের কবি শুধুই কবি ; তিনি দার্শনিক নন।

বিংশ ঃ আমি তাঁহাকে দার্শনিক আখ্যা দিতে চাহিতেছি না। তবু বলি যে কোনও মহৎ কবির রচনায় একটা জীবনদর্শন বা বিশ্বদর্শন উপস্থিত থাকে। আমাদের কবি নূতন ভারতের নূতন উপনিষদ। ইউরোপীয় কাব্যেও দেখি যে কোনও মহৎ কবি তাহার কাব্যে একটি মহৎ জীবনদর্শন উপস্থিত করিতেছেন। George Santiyna ইউরোপের তিন কবি Lucretius, Dante এবং Goethe-এর কাব্য সম্বন্ধে ১৯১০ সালে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। সেই গ্রন্থের নাম Three Philosophical Poets। ১৯১৮ সালে ভারতীয় দার্শনিক সর্বেপল্লি রাধাকৃষ্ণণ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন এবং সেই গ্রন্থের নাম The Philosophy of Rabindranath Tagore। আপনাদের কবি সম্বন্ধে এই ধরনের কোনও গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে কি না জানি না।

একবিংশ ঃ আমাদের কবি সম্বন্ধে এই রকম কোনও গ্রন্থ লিখিবার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আমি আবার বলি আমাদের কবি শুধুই কবি, তিনি দার্শনিক নন।

বিংশ ঃ এই কথার অবশ্য উত্তর নাই। বোধ হয় এখন পৃথিবীর কোনও দেশে কোনও কবি দার্শনিক নন। Oswald Spengler-এর উক্তিটি স্মরণ করিয়া বলিতে হয় সারা পৃথিবীতেই এখন কাব্যের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

একবিংশ ঃ আমি দর্শন সম্বন্ধে কিছু জানি না। তবে আপনার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে আধুনিক জগতে যদি কাব্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে দর্শনেরও মৃত্যু ঘ,য়াছে।

বিংশ ঃ Plato-র রচনা কাব্যময়। অথচ এই Plato-ই তাঁহার Republic হইতে কবিদের নির্বাসিত করিয়াছেন। Plato-র এই কাব্যবিরোধিতা সম্বন্ধে Milton তাঁহার একটি Latin কবিতায় বড় মজার কথা বলিয়াছেন। তিনি Plato-কে বলিয়াছেন, Plato তুমি কবিদের নির্বাসন হইতে ফিরাইয়া আনো, কারণ তুমি নিজে একজন কবি। তবে ইহা ঠিক এ কালের কোনও দার্শনিকের মধ্যে কোনও কাব্যভাব নাই। এ কালের এক বিশিষ্ট ইংরাজ দার্শনিক Metaphysics কে nonsense বলিয়াছেন। মনে হয় এ কালের কাব্য ও দর্শনের সহমরণ ঘটিয়াছে।

একবিংশ ঃ আমি আপনার কথা ঠিক বুঝিতেছি না। আমি এ কালের দর্শন সম্বন্ধে কিছুই বড় জানি না। কিন্তু কাব্যের মৃত্যু ঘটিয়াছে এমন কথা বলিতে পারি না। আমাদের কবি এক মহাকবি হইয়া উঠিতেছেন। এ কথা ঠিক সারা পৃথিবী তাঁহাকে এখনও মহাকবি বলিয়া বরণ করিয়া লয় নাই। তাঁহার যে রচনা এখনও লিখিত হয় নাই সেই রচনা লিখিত এবং প্রকাশিত হইলে তিনি মহাকবি বলিয়া স্বীকৃত হইবেন। এ কথা ঠিক যে তাঁহার যে রচনা এখনও লিখিত হয় নাই সে রচনা একটি

উপন্যাস। কিন্তু উপন্যাস এখন মহাকাব্য বলিয়া গণ্য হইতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজ ঔপন্যাসিক তাঁহার একখানি উপন্যাসকে comic epic in prose আখ্যা দিয়াছেন। এই সূত্র ধরিয়া Cambridge-এর পণ্ডিত E. M. W. Tillyard তাঁহার একটি গ্রন্থে Gibbon-এর 'The Decline and Fall of Roman Empire' গ্রন্থটিকে যেমন মহাকাব্য আখ্যা দিয়াছেন তেমন আবার Tolstoy-এর 'War and Peace' উপন্যাসটিকে মহাকাব্য বলিয়াছেন। আমাদের কবি তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসটি লিখিবার পর তিনিও এক মহাকাব্যের রচয়িতা বলিয়া সারা পৃথিবীতে গণ্য হইবেন। তাঁহার কাব্য ও গদ্যরচনা একত্রে এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যরূপে স্বীকৃত হইবে।

বিংশ ঃ তাহা যদি হয় বাঙালির গৌরবের আর অন্ত থাকিবে না। আপনাদের কবির নাম, রবীন্দ্রনাথের নাম এবং অমর্ত্য সেনের নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হইবে।

একবিংশ ঃ সেই শুভক্ষণ আসিতে একটু বিলম্ব হইবে। প্রথম কথা তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসখানি প্রকাশিত হওয়া চাই। তাহার পর তিনি ভারতের রাজ্যসভায় সদস্য হইবেন। সর্বশেষে নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়া তিনি জগতের সাহিত্যসভায় এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া গণ্য হইবেন।

বিংশ ঃ বঙ্গদেশের এবং সারা পৃথিবীর এখন যা অবস্থা তাহা দেখিয়া মনে হয়—

'এ নহে স্বপন এ নহে কাহিনি আসিবে সেদিন আসিবে'।

একবিংশ ঃ আপনার কথায় একটি ব্যঙ্গের সুর লক্ষ করিতেছি। আশা করি আপনি রবীন্দ্রভক্ত হিসাবে আমাদের কবিকে তুচ্ছ করিতেছেন না।

বিংশ ঃ আমাকে আপনি রবীন্দ্রভক্ত বলিতেছেন। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব এ কালে রবীন্দ্রভক্ত আর ক্যজন। সমকালীন বঙ্গদেশ রবীন্দ্রনাথের দেশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এখন সবই যেন বড় এলোমেলো হইয়া গিয়াছে, সকলেই যেন লুটিয়াপুটিয়া খাইতেছে। এক নূতন মহাকাব্যের যুগ আসিয়াছে। আপনাদের কবি সেই মহাকাব্যের রচয়িতা হইলে আশ্চর্য হইব না।

একবিংশ ঃ আমি আবার আপনার কথায় একটি ব্যঙ্গের সুর লক্ষ করিতেছি, আপনি যেন বলিতে চাহিতেছেন যে আমাদের কবি এক হতভাগা দেশের হতভাগ্য মহাকবি।

বিংশ ঃ আমি মোটেই সে কথা বলিতেছি না। আমি বিংশ শতাব্দীর কথাই বলিতেছি। বঙ্গদেশে এই বিংশ শতাব্দীর মানুষ বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র বিভূতিভূষণ জগদীশচন্দ্র শ্রী অরবিন্দ প্রভৃতি যে-কবিকে মহাকবি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, ঠিক সেই রকম এক কবি একবিংশ শতাব্দীতে মহাকবি বলিয়া গণ্য হইবেন আমি মনে করি না। নূতন যুগের নূতন মহাকবি এ কথা মানিয়া লইতেই হইবে। ইংলন্ডে যেমন এখন এক T.S. Eliot নাই, Bertrand Russell নাই, Winston Churchill নাই, তেমন বঙ্গদেশেও সেই ধরনের মানুষ দেখি না।

একবিংশ ঃ আপনার কথায় একটা হতাশার ভাব লক্ষ করিতেছি। কাব্য সম্বন্ধে Macaulay, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, Oswald Spengler, যাহা বলিয়াছেন, আপনি যেন তাহাই বলিতেছেন। আপনি বিনয় সরকারের কথাটি ভুলিয়া যাইতেছেন : If winter comes can spring be far behind। আমাদের কবি বঙ্গদেশে এক নূতন বসন্ত আনিয়াছেন। এই বসন্তে ফুল ফুটিতেছে। কাহাকেও বলিতে হইতেছে না, ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত। বঙ্গ দেশের কাননে এখন সব কুসুমকলি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আপনি পুরাতন শুষ্ক ফুল লইয়া বসিয়া আছেন বলিয়া এই ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনী বঙ্গদেশকে দেখিতেছেন না।

বিংশ ঃ আপনার কথা সত্য হইতে পারে। বঙ্গীয় গ্রিক পণ্ডিত কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলিতেন— You read all kinds of rubbish ; I read only Homer. তিনি আরও বলিতেন— Tragedy perished with the Greeks, not even Shakespeare could revive it. যাহারা পুরাতন লইয়া বসিয়া থাকে তাহারা নূতনের মর্যাদা বুঝিতে পারে না।

একবিংশ ঃ আমিও তাহাই বলি। এক ইংরাজ কবির বচন দিয়া এই আলাপন শেষ করি— Old order changeth yielding place to the new.

খোঁজ পরিষদ ঃ একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

১৯৪৬ এর শেষ দিকে আমরা সাতজন সোস্যালিস্ট সমাজবাণী লিমিটেড নাম দিয়ে একটি কোম্পানি করলাম। জয়প্রকাশ নারায়ণের উৎসাহে হেমেন দত্তদের কাছ থেকে, যাদের ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ও মহালক্ষ্মী কটন মিল ছিল, আমরা দৈনিক কৃষক পত্রিকা কিনেছিলাম।

আনন্দবাজারের মনোরঞ্জন গুহ, ক্ষেমেন সেন, কানাইলাল সরকারও ছিলেন ওই সাতজনের মধ্যে। এঁদের মধ্যে আমি ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ। বেশ চলছিল কাগজ। কিন্তু সর্বনাশ হয়ে গেল। ১৯৪৮-এর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ১৪টি বাঙালি পরিচালিত ব্যাঙ্ক ফেল করল। আমরা একটা 'মিলি মেশিন' কিনেছিলাম ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের কাছ থেকে, হাইপোথেটিক করা ছিল। ৩৫০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। ৫০০০ টাকা বাকি। নভেম্বরে দিতে হবে। হাইকোর্ট ব্যাঙ্কের সম্পত্তি ধরে নিয়ে 'সিল' করে দিল প্রেস। আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপনা সব শেষ। আমাদের দৈনিক কৃষক পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু দমবার পাত্র নয় ড. রামমনোহর লোহিয়া। জে. পি. ও লোহিয়ার চেষ্টায় তৈরি হল একটি রিসার্চ সেন্টার। লোহিয়া নাম দিলেন 'খোঁজ পরিষদ'। ডাইরেক্টর হলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও দুই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. ধারিক ঘোষ ও ড. অমিয় দাশগুপ্ত। সময় হল ১৯৪৮-এর নভেম্বর।

ছয়জন গবেষকের মধ্যে তিনজন কাজ করতে লাগলেন 'ডলার' নিয়ে আর বাকি তিনজন 'কোল' নিয়ে। সপ্তাহে দু'টি করে সেমিনার। বহু ভাল ভাল ছেলে খুবই উৎসাহে মেতে উঠল। তিনজনকে বিশেষ করে মনে আছে। একজন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন সব্যসাচী মুখার্জি, একজন এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জির ছেলে আর একজন একজন চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভের প্রথম জেনারেল ম্যানেজার পি. সি. মুখার্জির ছেলে।

একটা রিসার্চ সেন্টার চালাতে যে পরিমাণ টাকার দরকার তা ভাল করে জোটানো যাচ্ছে না। যা একটুকু জোগাড় হয় তা ফুরোতে দেরি লাগে না। জে. পি. ১৯৪৯-এর কোনও সময়ে একটি চিঠিতে আমাকে লিখলেন, মার্টিন বার্ন ও ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টিলের কর্ণধার স্যার বীরেনের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে। স্যার বীরেন মঙ্গল ও শুক্রবার বার্নপুর থেকে এসে মার্টিন বার্নে বসতেন। এক মঙ্গলবার সকাল ১০টায় গেলাম। স্লিপে লিখলাম —জয়প্রকাশ নারায়ণ। কাজেই কোনও অসুবিধা হল না। স্যার বীরেন ডেকে পাঠালেন। জীবনে ওই রকম অফিসে যাইনি, পাগুলো কার্পেটে ডুবে যেতে লাগল। বললাম জে.পির কথা। উনি বললেন হোয়াট ফর? বললাম, আমি জানি না। ঠিক আছে আমি তো সপ্তাহে দু'দিন আসি। বললাম, দিন পনেরো পরে একটা ডেট দিন, আমি তো জে.পিকে লিখে জানাব। ঠিক আছে, বলে ডায়েরি দেখে ১৮ দিন পরে একটা ডেট দিলেন, হ্যারিংটন স্ট্রিটের বাড়িতে, সকালে ব্রেকফাস্টে। ভদ্রতা করে বললেন তুমিও এসো। যথা সময়ে জে. পির সঙ্গে আমিও গেছি। জে. পি বললেন, 'খোঁজ পরিষদে'র কথা। গবেষণার কথা। দু'টি বই-এর কাজ অনেক এগিয়েছে। গবেষকদের কিছু টাকা দিতে হবে আর বই দুটোও বের করতে হবে তার জন্যও টাকার দরকার। অথচ টাকা যা জোগাড় হয়েছিল সব ফুরিয়ে গেছে। তাই আপনার কাছে কিছু সাহায্য চাই। স্যার বীরেন সব শুনে খুব খুশি। বললেন, এতে আমার উৎসাহ আছে। বিশেষ করে এই রকম ধরনের রিসার্চের কাজ। ঠিক আছে। চা-টা আগে শেষ করা যাক।

রানুদির সঙ্গে আমার একটু পরিচয় আগের থেকেই ছিল, এখন যখন দেখলেন জয়প্রকাশ নারায়ণের আমি সঙ্গী তখন পরিচয়টা গাঢ় হল। এবং গত পঞ্চাশ বছর ধরে রানুদি আমাকে স্নেহভাজন বন্ধু হিসাবেই দেখে এসেছেন। স্যার বীরেন তখনকার দিনে ৪০০০০ টাকা দিয়েছিলেন খোঁজ পরিষদের জন্য।

দু'বছরের মধ্যে আমাদের গবেষকদের দু'টি বই বের হল—'ডলার প্রবলেম অ্যান্ড ডি-ভ্যালুয়েশন' আর একটি 'কোল ইন ইন্ডিয়া'। বিশেষ করে 'কোল ইন ইন্ডিয়া' ভারত সরকারের খুবই প্রশংসা পেয়েছিল। এই সঙ্গে একটা মজার ঘটনার উল্লেখ করছি এই জন্য যে তাতে 'খোঁজ পরিষদে'র কথা আছে। 'খোঁজ পরিষদ' সংলগ্ন ফ্ল্যাটে আমার ডেরা। একদিন রবিবার সকালে শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই সত্যেন বোস এসে হাজির। বললেন, কফি খাওয়া। একটি ইজিচেয়ারে ফতুয়াটা খুলে গা এলিয়ে দিলেন। এই ইজিচেয়ারে বসেছেন—অচ্যুত পটবর্ধন, লোহিয়া, জয়প্রকাশ নারায়ণ, অরুণা আসফ আলি, বিশ্বেশ্বর কৈরালা (যিনি নেপালের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন), 'লেডি রানু, বিপ্লবী ত্রৈলোক্য মহারাজ, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, মাখনলাল সেন, সৌমেন ঠাকুর, লীলা রায় প্রভৃতি দিকপালেরা। ইজি চেয়ারটা এখনও আছে। কথা বলতে বলতে ঘণ্টাখানেক কেটেছে। কফি খাওয়া শেষ। ইতিমধ্যে রাজ্যপালের এডিকং এল। স্যালুট ঠুকে বলল—স্যার, হিজ একসেলেন্সি (তখন তাই বলা রেওয়াজ ছিল) আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন। মাস্টারমশাই বললেন, তুমি যাও, আমি পরে যাচ্ছি। এডিকং চলে যাওয়ার মিনিট পনেরো পরে বললেন, চল্ যাওয়া যাক। রাস্তায় এসে বললাম, একটা ট্যাক্সি ডাকি। বললেন, সকাল থেকে মনটা বেরিয়ে পড়ি বেরিয়ে পড়ি করছিল। তাই তো তোর কাছে চলে এলাম। চল এই সবুজ মাঠটুকু হাঁটতে হাঁটতে যাই। সামনেই মনোহর দাস তড়াগ, বলতে কি চৌরঙ্গি তখন সত্যিই মনোহর ছিল। ওই উদোম শরীরে, ভুঁড়ি নিয়ে হেলতে দুলতে চলেছেন, আর আমাকে বোঝাচ্ছেন কী করলে 'খোঁজ পরিষদ'-কে একটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায়।

মনুমেন্টের পাশ দিয়ে, এসপ্লানেড ম্যানসনের গা-ঘেঁষে পৌঁছলাম লাটভবনের উত্তর দিকের গেটে। পুলিশ অফিসাররা এগিয়ে এসে নমস্কার করল। বললাম, মাস্টারমশাই, এবার ফতুয়াটা পরে নিন। বললেন, যাঁর কাছে যাচ্ছি, তাঁর কাছে ফতুয়া পরার দরকার নেই। তর্ককরে বললাম সেকী মাস্টারমশাই, উনি গভর্নর। ডেকোরেম বলে একটা কথা আছে। ঘাড়টা কাত করে, ড্যাব্‌ড্যাব্ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তা হলে বলছিস। তবে দে পরিয়ে। দু'হাত প্রসারিত করে দিলেন, পুলিশদের সামনে। রাজভবনের গেটে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে আমি ফতুয়া পরাচ্ছি। জগৎজোড়া খ্যাতি, কিন্তু বাচ্চাছেলের মতো সরল। আমার জীবনে এ এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। আরও আশ্চর্য হয়েছিলাম এই ভেবে যে এত বড় বিজ্ঞানী, কিন্তু তাঁর মনে 'খোঁজ পরিষদে'র মতো একটা ছোট্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতি কী গভীর অনুরাগ। এবং একে বড় করার জন্য কত চিন্তা।

ড. ধারিক ঘোষ অসুস্থ হয়ে গেলেন। আর অমিয়দাও বিদেশে চলে গেলেন। ঝিমিয়ে পড়ল 'খোঁজ পরিষদ'। তারপরে অর্থাভাব। ১৯৫২ পর্যন্ত কোনও রকমে চলে বন্ধ হয়ে গেল। দৈনিক কৃষক পত্রিকা আর 'খোঁজ পরিষদ' বন্ধ হওয়ায় খুবই মর্মাহত হয়েছিলাম। কারণ এ দু'টির জন্য আপ্রাণ খেটেছিলাম। তবু মনটা এই ভেবে খুশি যে তখনকার বাঙালির একটি রিসার্চ সেন্টার দেশকে দু'টি গবেষণাগ্রন্থ উপহার দিয়েছিল—'ডলার প্রবলেম অ্যান্ড ডি-ভ্যালুয়েশন' আর 'কোল ইন ইন্ডিয়া'।

গ্রন্থসমালোচনামূলক প্রবন্ধ

ভারত-বিভাজনের কিছু স্বল্পজ্ঞাত তথ্য

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের মতো ভারতীয় উপমহাদেশের তিনটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের কাছে তো বটেই, আধুনিক ইতিহাসের যে কোনও নিবিষ্ট পাঠক-গবেষকের পক্ষেও ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট দিনটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তার পশ্চাদপটেই নিহিত রয়েছে দক্ষিণ এশিয়া খণ্ডের অধিবাসী ১২৫ কোটিরও উপর নর-নারীর বাসভূমি এই অঞ্চলের প্রবল রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা—যা যে কোনও মুহূর্তে পারমাণবিক যুদ্ধের রূপ নিতে পারে। তার কারণ, ভারত বিভাজনরূপী অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার—যা হত্যা, লুণ্ঠন, নারীনিগ্রহ এবং সর্বোপরি কোটি কোটি নরনারীর বহু শতাব্দীর বাসভূমি ছেড়ে উদ্বাস্তু হবার ঘটনায় বিশ্বইতিহাসে নজিরবিহীন—পটভূমিকা না জানলে মানবোন্নয়নের মানের সূচিতে বিশ্বে একেবারে নীচের সারিতে যে সব রাষ্ট্রের স্থান, তারাই কেন দীর্ঘ পঞ্চান্ন বৎসর যাবৎ জাতীয় আয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সামরিক প্রস্তুতির জন্য ব্যয় করে চলেছে তা কোনও দিনই বোঝা সম্ভব নয়। ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ও প্রশাসকদের মধ্যে ক্রিয়াশীল এই সামাজিক আত্মহত্যার মানসিকতার চাবিকাঠি রয়েছে দেশভাগের ঘটনাবলির নেপথ্যে।

ভারতবিভাগের ইতিহাস দেশি ও বিদেশি গবেষক-লেখকদের দ্বারা প্রায় ওই সময় থেকেই লেখা হয়ে আসছে। বিশেষ করে ব্রিটিশ সরকার রয়াল আকারের সহস্রাধিক পৃষ্ঠার বারোটি খণ্ডের প্রত্যেকটি খণ্ডে তাঁদের দপ্তরে উপলব্ধ যে সব দস্তাবেজ প্রকাশ করেছেন, তা এই প্রচণ্ড বিয়োগান্তক ঘটনার পটভূমিকার তথ্যের আকর স্বরূপ। কিন্তু তা-ও এক দিক থেকে অপূর্ণ। কারণ প্রথমত সে সব দস্তাবেজের কালসীমা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালীন। সেই জন্য প্রদীপ জ্বালার পূর্বপ্রস্তুতি সলতে পাকানোর তথ্য তাতে নেই। দ্বিতীয়ত, ওই সব দস্তাবেজ কেবল সরকারের দপ্তরে যা সংগ্রহ হয়েছিল, তার বেশি নয়। ওই সময়কার কুশীলবদের ব্যক্তিগত কাগজপত্র এবং যাঁরা ডায়েরি রাখতেন, তাঁদের দিনলিপিসমূহও এ ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান। জিন্নার পটভূমিকায় এ কাহিনি লেখার সময়ে (১৩৯৪ সন) এই লেখক বাঙালি পাঠকমহলে তখনও পর্যন্ত সবিশেষ অচর্চিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করেন। ওই তথ্যগুলি পাঠকমহলে প্রচলিত এই ধারণার পুনর্বিচারের সহায়ক হয় যে ইংরেজ শাসকশক্তি যুদ্ধোত্তর কালে হতশক্তি বা সদিচ্ছাপ্রবণ হয়ে ভারতকে ক্ষমতাহস্তান্তর করেন এবং এই প্রক্রিয়ায় তাঁদের ভূমিকা বিবদমান দল দু'টির মধ্যে নিরপেক্ষ 'রেফারির' মতোই ছিল। যাবার পূর্বেও যে সাম্রাজ্যবাদ মরণকামড় দিয়ে যায় তার প্রমাণ চার্চিলের বহু বৎসর যাবত জিন্নার সঙ্গে সাঙ্কেতিক সূত্রের মাধ্যমে গোপন সম্পর্ক (তাঁর সরকারি জীবনীর ভিত্তিতে)। সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর কানিংহাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কংগ্রেসের অসহযোগিতার প্রতিশোধ নিতে ওই প্রদেশে সীমান্ত গান্ধী ও ডা. খান সাহেবের প্রভাব খণ্ডনের জন্য সর্ব প্রকারে ইসলামি মৌলবাদের প্রসারের ব্যবস্থা করেন (ওয়ালি খানের Facts are Facts গ্রন্থে উদ্ধৃত কানিংহামের ডায়েরি ও অন্যান্য দস্তাবেজ) এবং কুশলী প্রচারবিদদের কারণে ভারতবন্ধু রূপে চিহ্নিত ভারতের শেষ বড়লাট মাউন্টব্যাটেনেরও মূলত ব্রিটিশ বণিকস্বার্থের সংরক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ (তাঁর সরকারি জীবনীর তথ্য)। সাম্রাজ্যবাদী ও বণিকস্বার্থের এই একই কাহিনি প্রায় পঞ্চান্ন বছর যাবত ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে একটানা বিবাদ এবং হাজার হাজার নিরীহ জম্মু-কাশ্মীরবাসী নরনারীর রক্তমোক্ষণকারী ওই রাজ্যের ক্ষেত্রেও সমান সত্য। ব্রিটিশ সরকারের মহাফেজখানা কর্তৃক সম্প্রতি লোকচক্ষে আনীত দলিল দস্তাবেজের সাহায্যে ভারতের পররাষ্ট্র বিভাগের ভূতপূর্ব উচ্চাধিকারী ও একদা ইউরোপীয় ইউনিয়নে ভারত সরকারের দূত চন্দ্রশেখর দাশগুপ্ত এ সত্য তুলে ধরেছেন তাঁর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থে : War and Diplomacy in Kashmir : 1947-48

তবে ধর্মের কল যে বাতাসে নড়ে, এ ক্ষেত্রে তার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রমাণ হল বিগত ২০০২ খ্রি. নভেম্বরে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব জ্যাক স্ট্র-এর প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি যে ভারতসহ বহু ভূতপূর্ব ব্রিটিশ উপনিবেশে বর্তমানে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, তার মূলে আছে তদানীন্তন ইংরাজ সরকারের ভ্রান্ত নীতি।

দিল্লীবাসী গবেষক-লেখক বরেন রায়ও ভারত বিভাগরূপী বিয়োগান্তক ঘটনার উপর দীর্ঘকাল নব-নব আলোকসম্পাত করে আসছেন। তাঁর গবেষণার বিশেষ ক্ষেত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তানের মতো পণ্ডিত মহলে অপেক্ষাকৃত অনালোচিত অঞ্চলের কাহিনি। যদিচ পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের ট্রাজিডি নিয়েও ইতিপূর্বে তিনি যথেষ্ট আলোচনা করেছেন এবং 'সার্বভৌমবঙ্গে'র আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে তাঁর এক সংক্ষিপ্ত পত্র-প্রবন্ধ বর্তমান গ্রন্থে* আছে। বাঙালি হিসাবে শেষোক্ত বিষয়ে আমাদের বিশেষ আগ্রহ থাকলেও সঙ্গত কারণে আমরা সর্বাগ্রে আমাদের কাছে অপক্ষোকৃত অজ্ঞাত অঞ্চল—উত্তর-পূর্ব সীমান্তপ্রদেশ ও বালুচিস্তানে সাম্রাজ্যবাদের অপকীর্তির কাহিনির সমীক্ষা করব বরেন রায় প্রদত্ত তথ্যাবলির সাহায্যে।

॥ ২॥

গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধটি [For a New Thinking on The Partition] ব্রিটিশ সরকারের ভারত-শাসন পদ্ধতি (যাতে ভারত বিভাজনের বীজ ধর্মীয় সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক গোষ্ঠীর রূপ দেবার প্রথা সর্বপ্রথম এ দেশে প্রবর্তিত) এবং চার্চিল, ক্রিপস ও জওহরলাল প্রমুখ ভারত-বিভাজনের প্রধান কুশীলবদের বিশেষ ভূমিকা ও মুসলিম লিগের ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠার পিছনে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের গোপন হস্তের ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়াও এই প্রবন্ধে ১৯৪৬ খ্রি. ১০ই জুলাই-এর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উপর আলোকপাত করা হয়েছে মৌলানা আজাদের India Wins Freedom গ্রন্থের আমেরিকান সংস্করণে প্রকাশিত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বন্ধু সাংবাদিক লুই ফিশারের ভূমিকা থেকে। ভারতবিভাজনের শেষ পর্বের ইতিহাসের পাঠকেরা জানেন যে ক্যাবিনেট মিশন লিগের ভারতবিভাগের দাবি রদ করার সঙ্গে সঙ্গে এক আপোস ফর্মুলায় (আজাদের সহযোগিতায়) জিন্নাকে রাজি করান যাতে তিনটি স্ব-শাসিত ফেডারেশনের ভিত্তিতে ভারতে একটি সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব ছিল। কিন্তু কংগ্রেস-সভাপতি হিসাবে আজাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েই ১৯৪৬ খ্রি ওই ১০ই জুলাই নেহরু কংগ্রেস কর্তৃক স্বীকৃত ওই কনফেডারেশনের প্রস্তাব বাতিল করেন এক সাংবাদিক সম্মেলনে যেখানে লুই ফিশারও উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন শেষে ফিশার নেহরুর দৃষ্টি তাঁর ঘোষণার তাৎপর্যের প্রতি আকর্ষণ করলে জওহরলাল তা স্বীকার করেন। বলা বাহুল্য জিন্না নেহরুর ওই হঠকারিতার সুযোগ নিতে ছাড়েননি। এর প্রতিক্রিয়ায় লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক এবং কলকাতা-নোয়াখালি-বিহার ও তারপর সমগ্র উত্তর ভারতে রক্তস্রোতের অপরিহার্য পরিণতিতে ভারত ব্যবচ্ছেদ।

সীমান্ত প্রদেশের ঘটনাবলি সম্বন্ধে সমালোচ্য গ্রন্থে তিনটি দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে। এর মধ্যে প্রথমটি (Partition and the Tragic Fate of the Pathans and the Baluchis) উভয় অঞ্চলের এই বিয়োগান্তক ঘটনার রাজনৈতিক ইতিহাস। আর পরবর্তী দু'টি প্রবন্ধ Pakhtun National Movement and Transfer of Power in India এবং The Unique Leader of a Unique Movement : Abdul Ghaffar Khan and the Pakhtun National Struggle সেই ইতিহাসের সম্পূরক হবার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীরই মতো ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব এবং বর্তমান লেখকের মতে দেশবিভাজনরূপী ট্রাজিডির সর্বাপেক্ষা অবহেলিত ও উপেক্ষিত নায়ক বাদশা খাঁ বা সীমান্তগান্ধীর কর্ম ও আন্দোলনের উত্থান পতনের বিবরণ। এইখানে গান্ধীকে (প্যারেলালের ভাষায় নৌকার যে কর্ণধারকে তরী তীরে আসার মুহূর্তে তার যাত্রীরা নদীতে বিসর্জন দেন) নয় সীমান্তগান্ধীকে এই বিয়োগান্ত কাহিনির নায়ক আখ্যা দেবার কারণ সংক্ষেপে নিবেদন করা যেতে পারে। গান্ধী কয়েক মাস পরে মরে বেঁচেছিলেন। আর সীমান্তগান্ধীকে তার পর সুদীর্ঘ কাল নিজের স্বপ্ন-সাধনার ধ্বংসস্থলে জীবন্মৃত হয়ে বাঁচতে হয় এবং তার মধ্যে একটা বড় অংশ কাটাতে হয় পাকিস্তানের কারাগারে আর নচেৎ স্বদেশ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসনে।

অবিভক্ত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (বর্তমানে পাকিস্তানের অঙ্গ) ছিল পাখতুন পাঠানদের বাসভূমি। পুস্তুভাষী নানা উপজাতীয়দের নিয়ে পাঠানদের ওই প্রদেশ। পাঠানরা মূলত মুসলমান, যদিও অল্প কিছু হিন্দু (যাঁদের অধিকাংশ অতীতে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হন) ও শিখ ওই প্রদেশে এবং তার সন্নিহিত আফগানিস্তানের পুস্তুভাষী অঞ্চলে বাস করতেন। শিখরাজা মহারাজ রণজিৎ সিং-এর বংশধরদের হাত থেকে পাঞ্জাবসহ সীমান্তপ্রদেশ দখল করার পর ভারত সাম্রাজ্যের সীমানা আরও বাড়াবার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এক Forward policy ও কাল্পনিক ডুরান্ড লাইনের সাহায্যে শিখ সাম্রাজ্যের বাইরেও তাঁদের অধিকার ক্রমাগত বাড়িয়ে যাবার নীতি গ্রহণ করে। ডুরান্ড লাইনের বাইরে বসবাসকারী স্বাধীন পাঠানদের কোনও না কোনও অজুহাতে ইংরেজের ফৌজ আক্রমণ করে এবং এমনকী কোনও কোনও সময়ে তাদের

* বরেন রায় ; Partition of India and othe Related Matters ; আই. এস. এইচ এ-৪৮, কৈলাস কলোনি, নূতন দিল্লি ১০০০৪৮ ; মূল্য ৫৫০ টাকা মাত্র।

উপর নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তারে রত ছিল। ভারত তো বটেই এমনকী স্বদেশ ইংল্যান্ড ও বিদেশের জনমত যাতে এই আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি টের না পায় সেই জন্য একদা গান্ধার ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির পীঠস্থান (তক্ষশীলার পুরাকীর্তি যার একটি নিদর্শন) ওই অঞ্চলের অধিবাসীদের অশিক্ষিত বর্বর এবং নিজেদের মধ্যে যুযুধান উপজাতীয় রূপে প্রচার করে তাদের মধ্যে শান্তিরক্ষা ও শিক্ষা-সভ্যতার প্রসার ইংরেজের লক্ষ্য ঘোষণা করে ভারতীয় সাম্রাজ্যের এই ক্রমসম্প্রসারণ দীর্ঘ দিন ধরে দিল্লির সরকার চালিয়ে যায়।

সীমান্ত প্রদেশে বেলুচিস্তানের তুলনায় বেশ পূর্বে (ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের প্রাচীনত্ব ও সেই কারণে আধুনিক শিক্ষা ও ধ্যান-ধারণার প্রসার ঘটার জন্য) রাজনৈতিক চেতনা দানা বাঁধে ও ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে সেখানে লালকুর্তাধারী খুদা-ই-খিদমদগার (ঈশ্বরের সেবক) নামে এক সমাজসেবা ও রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে যার নেতা ছিলেন আদর্শ চরিত্রের জনসেবক খাঁ আবদুল গফ্ফর খাঁ। লালকুর্তাধারী ওইসব জনসেবকদের মাধ্যমে পাঠানদের মধ্যে নানা রকম সমাজ সংস্কার ও আধুনিক রাজনৈতিক চেতনার প্রসারে নেতৃত্ব দেবার জন্য পাঠানেরা আদর করে তাঁকে বাদশাহ খাঁ (খাঁ বা পাঠানদের বাদশাহ) নামে অভিহিত করতেন। পাঠান-সমাজে প্রচলিত উপজাতীয় দ্বন্দ্ব ও তার হিংসাত্মক অভিপ্রকাশের নিষেধ করে তিনি তাবৎ পাঠানকে এক করার জন্য তাঁদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পারস্পরিক আচরণে সৌহার্দ্য ও ব্যাপক জনশিক্ষার পন্থা গ্রহণ করেন।

খুদা-ই-খিদমদগার আন্দোলন ও তার নেতৃবর্গ নিজেদের মুসলিম অস্মিতা সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তবে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা উপলব্ধি করেন যে পাঠানদের স্বায়ত্বশাসন ও আত্মোন্নতির পথে মূল বাধা হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। তাই তার বিরোধিতার জন্য সর্বাগ্রে তাঁরা মুসলিম লিগের দ্বারস্থ হন ১৯২০ সালে। কিন্তু নবাব-নাইটদের নেতৃত্বচালিত লিগের পক্ষে শাসকশক্তির বিরোধী কোনও আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবার কথা কল্পনাতীত। সুতরাং মুসলিম লিগ রূঢ়ভাবে খুদা-ই-খিদমদগারদের প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে বাদশাহ খাঁ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী প্রবলতম রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেসের সঙ্গে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের শেষ থেকে নিজ আন্দোলনকে যুক্ত করেন। কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধীর মতোই তাঁর প্রবল অহিংসনিষ্ঠার জন্য ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে তিনি এরপর সীমান্তগান্ধী নামেও পরিচিত হন।

সীমান্তপ্রদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন এবং তা-ও কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধীর পথ-চিহ্ন ধরে—এটা সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের আদৌ মনমতো ছিল না। একে তো ইংলন্ড থেকে আগত ব্রিটানিয়ার মাহাত্ম্যে ওতপ্রোত প্রশাসকরা প্রদেশটি এবং দিল্লির শাসকদের 'ফরোয়ার্ড পলিসির' জন্য আশেপাশের উপজাতীয়দের স্বশাসিত অঞ্চলগুলিকে নিজেদের খাস তালুক মনে করতেন। তার উপর পারস্য-আফগানিস্তান-রাশিয়া-চিনের সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থানের ওই স্ট্র্যাটিজিক অঞ্চলে নিজ প্রভাব বজায় রাখা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নীতি ছিল। কমিউনিস্ট সোভিয়েট সরকারকে পশ্চিমি পুঁজিবাদের স্বার্থে 'বাঘবন্দি' করে রাখা ছাড়াও তাজিকিস্তানের পেট্রোল এবং ওই অঞ্চলে ইউরেনিয়ামসহ আরও নানা মূল্যবান খনিজদ্রব্যের প্রাপ্তির সম্ভাবনায় ওই এলাকার উপর থেকে নিজ প্রভাব শিথিল করার ইচ্ছা রাজনৈতিক ও আর্থিক কারণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ছিল না।

এই পটভূমিকায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে আর্থ-সামরিক শক্তিতে হীনবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ উপলব্ধি করল যে প্রাচ্যের সাম্রাজ্যগুলিকে আর পূর্ববৎ প্রত্যক্ষ শাসন করা যাবে না। আর ভারতীয় সাম্রাজ্যই ছিল এর মধ্যে সর্বপ্রধান। তাই প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসায়িক এবং পরোক্ষভাবে এই অঞ্চলের স্ট্র্যাটজিক-রাজনৈতিক স্বার্থ যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিল ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু ১৯৪৫-৪৬ খ্রি. এর পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল—কার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরকরণ? সমগ্র ভারতের কথা আমরা এই প্রবন্ধের সীমিত আয়তনের মধ্যে আলোচনা করব না। আমাদের অলোচনার সীমা পরিমিতি —সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান।

সীমান্ত প্রদেশের সর্বাপেক্ষা জনসমর্থিত দল কংগ্রেস যার স্থানীয় ভিত্তি হল বাদশাহ খাঁ-এর নেতৃত্বাধীন খুদা-ই-খিদমদগারদের লালকুর্তা বাহিনী। কিন্তু ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় থাকাকালীনই সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা দেখেছেন বাদশাহ খাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ড. খাঁ সাহেবের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসি মন্ত্রীসভা আদৌ তাদের খেলা খেলতে ইচ্ছুক নন। তাঁরা বড় স্বাধীনচেতা এবং সীমান্তপ্রদেশের প্রতিটি জাতীয় (ethnic) ও উপজাতীয় গোষ্ঠীর পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন তাঁদের লক্ষ্য। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতায় মন্ত্রীমণ্ডল থেকে ইস্তফা দিয়ে ডা. খাঁ সাহেবের অনুগামীরা কেবল সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বজনমতের দরবারে আসামির কাঠগড়ায় খাড়াই করেনি, অনেক চেষ্টা করেও তাঁদের কারাবন্দি অবস্থায় মুসলিম লিগের বিকল্প সরকারকে টিকিয়ে রাখতে না পারায় প্রমাণ হয়েছে যে যথার্থ জনপ্রতিনিধি লাল-কুর্তারাই। অবশ্য কংগ্রেসিরা জেলে থাকার সময়ে ছোটলাট

কানিংহাম তাঁর সমগ্র প্রশাসন ও সরকারি অর্থ দিয়ে খাঁদের মধ্যে সম্পন্ন ব্যক্তি, যাঁরা বদশাহ খাঁ-এর গণতন্ত্রিক নীতির স্বভাবতই বিরোধী, তাঁদের এবং বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে মোল্লা-মৌলভিদের মাধ্যমে ইসলামের নামে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে পুষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধপ্রয়াসে সরকারের সমর্থক মুসলিম লিগের শক্তি বৃদ্ধি করার কাজ করেছেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে এ দেশের বিধানসভায় অধিকাংশ মুসলিম আসনে বিজয়ী কংগ্রেস হিন্দু ও শিখ আসনগুলিতে বিজেতাদের সাহায্যে প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও সাম্রাজ্যবাদীদের ভেদনীতি প্রসারের বিগত পাঁচ-ছয় বৎসরের অক্লান্ত প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। পুস্তুভাষী পাঠানদের এলাকায় কয়েকটি আসনে মুসলিম লিগ বিজয়ী হয়েছে।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ক্যাবিনেট মিশন অনেক আলাপ আলোচনার পর ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির কোনও রকম সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের পরিকল্পনা পেশ করে। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত ভাগ করে দু'টি সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ার মুসলিম লিগের দাবিকে নানা কারণ দেখিয়ে বাতিল করলেও তাঁদের প্রস্তাব ছিল খণ্ডিত ও যুক্ত ভারতের ছবির মধ্যে একটা আপোস রফা। সীমিত ক্ষমতাযুক্ত কনফেডারেশন-রূপী কেন্দ্র ও বাদবাকি (residual) ক্ষমতার অধিকারী রাজ্যগুলির মাঝখানে তিনটি রাজ্যগোষ্ঠীর প্রস্তাব করা হয় যাদের হাতে সীমিত সময়ের জন্য কেন্দ্রের চেয়ে বেশি কিন্তু রাজ্যগুলির থেকে কম অধিকার ও দায়িত্ব থাকবে। খুদা-ই-খিদমদগাররা বরাবরই ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করলেও ক্যাবিনেট মিশনের ওই আপোস রফার ভিত্তিতে তাঁদের বাসভূমি সীমান্ত প্রদেশকে ফেলা হল 'বি' রাজ্যগোষ্ঠীতে—পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান অর্থাৎ অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যগুলির (বঙ্গ এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও আসামকে অপর একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল) সঙ্গে।

অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে তাঁরা থাকবেন না, কেবল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিচারে 'ছায়া পাকিস্তানের' মধ্যে পাঠানদের থাকতে হবে যেখানে (মুসলিম লিগের অতীত ইতিহাস বিবেচনা করলে) সাম্প্রদায়িকতাই হবে মূল প্রেরকশক্তি—এটা শুধু খুদা-ই-খিদমদগারদের সমস্যা ছিল না, তাঁদের ক্ষোভের অতিরিক্ত কারণও ছিল। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে "... জাতীয় (ethnic) স্বায়ত্বশাসন ও পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার স্পষ্টত স্বীকৃত হয়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাবিরা তাঁদের উপর প্রভুত্ব করবেন—এটাও তাঁরা কোনও মতে চাইতেন না। তবে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দও তাঁদের যথার্থ ইচ্ছা ও প্রয়োজনীয়তার কথা কদাপি যথাযথভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেনি। তাঁরা কেবল পাঠানদের গোষ্ঠীভুক্ত হবার আনুষ্ঠানিক অনিচ্ছাকে মুসলিম লিগকে আঘাত করার একটি লাঠি স্বরূপ ব্যবহার করেন।" (পৃঃ ৯৫)। এইভাবে ১৯৪৬ খ্রি.-এ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সীমান্ত প্রদেশে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিধানসভায় খুদা-ই-খিদমদগার সমর্থিত কংগ্রেসি সদস্যরা প্রবল সংখ্যাগুরু এবং তাঁরা ভারতবিভাজন বা পাঞ্জাব-বেলুচিস্তান-সিন্ধুর সঙ্গে গোষ্ঠীভুক্ত হতে চান না। কিন্তু ইংরাজ সরকার অর্থ ও কর্মচারিবৃন্দের সহায়তায় পুষ্ট মোল্লা-মৌলভিদের প্রয়াসে পাঠানদের মূল এলাকার ভিতর মুসলিম লিগ কিছু আসনে বিজয়ী হবার জন্য দাবি জানাচ্ছে যে কয়েক মাস পূর্বের নির্বাচনের রায় আর জনমতের প্রতিনিধিত্ব করে না এবং তাই পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশগোষ্ঠী রূপী ছায়া পাকিস্তানের পথে সীমান্ত প্রদেশকে পাকিস্তানেই যোগ দিতে হবে। বিশ্ব ও মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি ও সামরিক নীতির কারণে এবং পেট্রোল ও অন্যান্য খনিজদ্রব্যের উপর নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে দিল্লি-লন্ডনের সাম্রাজ্যবাদী শাসকদেরও অনুরূপ অভিপ্রায়।

সুতরাং সীমান্ত প্রদেশের পাকিস্তানে যোগদান সুনিশ্চিত করতে মুসলিম লিগ নির্বাচিত (কংগ্রেসি) সরকারকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করার জন্য ১৯৪৬-৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে সর্বতোভাবে হিংসা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কর্মসূচি শুরু করল যার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডা. খাঁ সাহেবের সরকারি আবাসে ভাঙচুর এবং তাঁকে দৈহিক নিগৃহীত করার ঘটনাও ছিল। আর ছোটলাটের নেতৃত্বে তাবৎ ইংরাজ সরকারি কর্মচারী প্রচ্ছন্নভাবে লিগের কাজে সমর্থন দিতে থাকলেন।

১৯৪৭খ্রি.-এর ২০শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলির ঐতিহাসিক ঘোষণা—একটি মাত্র কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা সম্ভব না হলে একাধিক কর্তৃপক্ষের হাতে করা হবে। এর পটভূমি হল লিগের গণপরিষদ বর্জন, যার মূলে আবার কংগ্রেসের সভাপতি হবার পরই জওহরলালের ঘোষণা যে ক্যাবিনেট মিশনের প্রদেশ গোষ্ঠী রচনার ত্রিস্তরীয় প্রস্তাব কংগ্রেস মানে না—সার্বভৌম গণপরিষদ যদৃচ্ছ সংবিধান রচনা করবে। তার প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম লিগের ১৯৪৬ খ্রি.-এর ১৬ই আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' নামে কলকাতায় দাঙ্গা এবং তার প্রতিক্রিয়ায় নোয়াখালি-বিহার এবং উত্তর ভারতের নানা স্থানে দাঙ্গা। এটলির ঘোষণার পর সীমান্তপ্রদেশে লিগের উদ্দণ্ডতা ও মন্ত্রীমণ্ডলকে বরখাস্ত করে ছোটলাটের শাসনের দাবি উদ্দাম হয়ে উঠল। মার্চের শেষভাগে মাউন্টব্যাটেন বড়লাট হয়ে এলেন এবং সীমান্তপ্রদেশে ছোটলাটের শাসন বা নতুন নির্বাচনে কংগ্রেসের আপত্তি মেনে নিয়ে তিনি নেহরুকে এই প্রস্তাবে রাজি করলেন

যে পরিবর্তে ওই প্রদেশ পাকিস্তান না ভারতে যোগ দেবে তা স্থির হবে গণভোটের মাধ্যমে। কংগ্রেস সভাপতি ও অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেসের নেতা মাউন্টব্যাটেনকে প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রদেশের কংগ্রেস, সরকার অথবা খুদা-ই-খিদমদগারদের নেতৃবৃন্দ কারও সঙ্গে পরামর্শ না করেই। তাঁদের এতদিনের সহকর্মী নেহরু প্রমুখ (গান্ধী নন, কারণ তিনি তখন নোয়াখালি-বিহার-কলকাতা ও অন্যত্র ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা নিবারণে রত এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের শেষ পর্বে একদা তাঁর আলোকে আলোকিত নেতৃবর্গ তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি) কংগ্রেস নেতারা তাঁদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে পাঠানদের ভাগ্যনির্ধারণ করেছেন এ কথা বাদশাহ খাঁ প্রমুখেরা জানলেন বড়লাটের দোসরা জুন ১৯৪৭-এর ঘোষণায়।

খুদা-ই-খিদমদগারদের তখন একেবারে কোণঠাসা অবস্থা। ব্রিটিশ প্রশাসন ও তার সাহায্যপুষ্ট মোল্লাদের উদ্ধতায় কেবল আইন-শৃঙ্খলা ও জনজীবনই পর্যুদস্ত নয়, মোল্লাদের সাম্প্রদায়িক অপপ্রচারে (পাকিস্তানের সপক্ষে ভোট না দিলে মৃতদেহকে মুসলিম কবরগাহ-এ সমাধিস্থ করা যাবে না বা কোনও মোল্লা সেই সব কাফেরদের পরিবারের অন্তিম সংস্কার করবে না ইত্যাদি) সীমান্ত প্রদেশের পাঠানরা বিভ্রান্ত। সাধারণ সীমান্তবিহীন, প্রতিবেশী মুসলমান ভাইদের প্রদেশ বাদ দিয়ে কয়েক শত মাইল দূরের অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবার কথা খুদা-ই-খিদমদগার নেতারা পাঠানদের বলতে পারেন না। বিশেষত কোন ভারতে? যে 'হিন্দু ভারতে'র বিহারে মুসলমানদের উপর অমানুষিক নির্যাতন হয়েছে এবং যা কেবল সীমান্ত প্রদেশের মোল্লা অথবা লিগ-নেতারাই নন, এমনকী কংগ্রেসি নেতারাও গিয়ে প্রত্যক্ষ করে এসেছেন ও যার পরিণামে একদা এ দেশের প্রথম সারির কংগ্রেসি নেতা খাঁ আবদুল কইয়ুম খাঁ ও আরও কিছু কংগ্রেসি ও প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক ত্যাগ করে লিগে যোগদান করেছেন? সুতরাং তাঁরা হিন্দুস্তান, পাকিস্তানের প্রশ্নে গণভোট বয়কট করার সিদ্ধান্ত করে দাবি করলেন যে এর তৃতীয় একটি বিকল্পও থাকা দরকার যা হবে পুস্তভাষী পাঠানদের পাখতুনিস্তানের দাবি।

কিন্তু তৃতীয় বিকল্পের দাবি ব্রিটিশ সরকার মানেনি এবং পূর্ব স্বীকৃতির পটভূমিকায় কংগ্রেসি নেতৃবর্গও কিছু করতে পারেননি। এই ভাবে পাখতুনদের "নেকড়ের মুখে ফেলে দিয়ে" কংগ্রেস নেতৃবর্গ ইংরেজশাসনের অবসান ঘটালেন, এমনকী এর মধ্যে খুদা-ই-খিদমদগারদের সঙ্গে জিন্না ও লিগের একটা কাজ চলা গোছের সম্পর্ক স্থাপনারও কোনও প্রয়াস করলেন না। ফলে ভারতভাগ হয়ে পাকিস্তানের জন্ম হওয়া মাত্রই সীমান্ত প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডল বরখাস্ত হল এবং অহিংস লালকুর্তা বাহিনির উপর নেমে এল প্রচণ্ড অত্যাচার ও উৎপীড়নের রাজত্ব। বাদশাহ খাঁ জীবনের বাকি বছরগুলির অধিকাংশ হয় পাকিস্তানের কারাগারে আর নচেত স্বেচ্ছনির্বাসনে কাটালেন। ভারত-বিভাজন রূপী বিয়োগান্তক নাটকের সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য জনগোষ্ঠী পুস্তভাষী পাঠান ও তাঁদের একদা গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সংগঠন খুদা-ই-খিদমদগার ও তার নেতা সীমান্ত গান্ধীর এই হল শোচনীয় কাহিনি।

।। ৩।।

ভারতের বাকি অংশের কাছে বেলুচিস্তান চিরকাল বহুদূরের অস্পষ্ট দেশ। সীমান্ত প্রদেশের সঙ্গে একদা শিখসাম্রাজ্যের অঙ্গ খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভারতে অভিযাত্রী অপরাপর বিজয়ীদের কারণে অবশিষ্ট ভারতে যে সম্বন্ধ, বেলুচিস্তানের ক্ষেত্রে তেমন হয়নি। তবে নানা উপজাতীয়দের সম্মিলিত বালুচ অঞ্চলে শাসনের জন্য এক একটি উপজাতীয় 'জিরগা' ছাড়াও কনফেডারেশনের মতো একটি জাতীয় 'জিরগা'ও বহুদিন যাবত বেলুচিস্তানে ক্রিয়াশীল ছিল। এর কারণ ইংরাজরা যখন প্রথম বালুচদের সংস্পর্শে এলেন তখন তারা দেখলেন যে বালুচসমাজ "বড় বেশি গণতান্ত্রিক"।

ইংরাজরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির 'ফরোয়ার্ড পলিসি' অনুসরণে ভারতের পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবার সময়ে ইরান ও আফগানিস্তানের সীমান্ত বরাবর একটা বড় এলাকার উপর প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব স্থাপন করলেন, সাম্রাজ্যের কাছে যার 'স্ট্র্যাটিজিক' ও সামরিক গুরুত্ব ছিল। ব্রিটিশ বেলুচিস্তান নামে আখ্যাত এই অঞ্চলে বোলান গিরিপথ ও কোয়েটা শহরও পড়ল। বালুচ উপজাতীয়দের বাদবাকি এবং বৃহত্তম অংশ "কালাত" নামে খ্যাত এবং তার অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের প্রধান ছিলেন সেখানকার খাঁ। ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে তাঁর স্থান দেশীয় রাজ্যের নৃপতির মতোই—ইংরাজদের প্রভুত্ব মেনে নিলেও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীন। সংক্ষেপে তুলনা করতে গেলে পাঠান এলাকার অধিকাংশ ইংরাজের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ও কেবল পশ্চিমের কিছু অংশে 'জিরগা'-র স্বশাসন এবং বালুচদের কেবল ইরান-আফগান সীমান্তের অপেক্ষাকৃত ছোট এলাকায় ব্রিটিশ শাসন এবং বাদবাকি বৃহত্তর অঞ্চলে স্বশাসন।

কংগ্রেসের বিধানে ব্রিটিশ ভারতের বাইরে তার কার্য-কলাপের পরিধি ছিল না। দেশীয় রাজ্যগুলিতে গণতান্ত্রিক স্বশাসনের আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য পরবর্তীকালে কংগ্রেস নেতৃবর্গের নৈতিক সমর্থনে "দেশীয়রাজ্য প্রজাসম্মেলন" গড়ে উঠলেও তার প্রভাব বেলুচিস্তানে (কালাত) বিশেষ পড়েনি। তবু ব্রিটিশ বেলুচিস্তানে কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনের কিছু প্রভাব পড়েছিল। ইংরাজ নিয়ন্ত্রণের অপসারণ ও প্রতিবেশী

দেশ ও প্রদেশগুলি বালুচভাষী অঞ্চল লগুলির একীকরণ প্রভৃতি দাবি এর মধ্যে প্রধান ছিল। ব্রিটিশ-বেলুচিস্তানে প্রতীক স্বরূপ হলেও কংগ্রেস কমিটির অস্তিত্ব ছিল এবং তার নেতা ছিলেন খাঁ আবদুস সামাদ খাঁ, যিনি বালুচ গান্ধী নামেও খ্যাত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে স্বাধীনতার পর তাঁরও পরিণতি বাদশাহ খাঁ-এর মতোই হয় এবং বহুবার পাকিস্তান সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করেন ও শেষ অবধি ১৯৭৩-এ পাক কারাগারেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

১৯৪৫-৪৬-এ ক্যাবিনেট মিশনের পরিপ্রেক্ষিতে বেলুচিস্তানের পরিস্থিতি আলোচনার পূর্বে জিন্নার সঙ্গে বৃহত্তম বালুচ এলাকা কালাত ও তার শাসক খাঁ-এর সম্বন্ধের কথা জেনে নেওয়া দরকার। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ১৮৭৬-এ কালাতের শাসকের এক চুক্তির বলে ওই রাজ্যের মর্যাদা ছিল ভুটান বা সিকিম ইত্যাদির মতো 'মিত্র রাজ্যের'। অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মতো ওই সব 'মিত্র রাজ্যের' সঙ্গে ভারত সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন রাজনৈতিক বিভাগের মাধ্যমে সম্পর্ক রাখত না। এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত বৈদেশিক বিভাগ। এর কারণ হল এই যে ওই সব মিত্র রাজ্যকে কোনও দিন ভারতের অঙ্গ বিবেচনা করা হত না। ১৯৩৬-এ বিলাত থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে মুসলিম লিগের নেতৃত্ব নেবার পর থেকে জিন্না দেশীয় রাজ্যগুলির মুসলিম শাসকবৃন্দের সঙ্গেও ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। কংগ্রেসি নেতৃবর্গও তাঁদের দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনে বারবার বলতেন যে তাঁরা ওইসব অঞ্চলের প্রজাদের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকারে বিশ্বাসী।

পক্ষান্তরে জিন্নার ভূমিকা ছিল দেশীয় রাজ্যের শাসকদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার বিষয়ে কোনও প্রশ্ন না তোলা। এর ফলে হায়দরাবাদ, ভূপাল প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য যেখানকার অধিকাংশ প্রজা হিন্দু কিন্তু শাসক মুসলমান, তাঁদের সঙ্গে জিন্নার সু-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কালাতের আইনগত অবস্থার বিশেষত্ব ছাড়াও অপর এক বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে ওখানকার অধিবাসীরা প্রায় সকলেই ছিলেন মুসলমান। জিন্না ১৯৩৬ খ্রি. থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালাতের খাঁয়ের কেবল পেশাদার আইন সম্পর্কিত পরামর্শদাতাই ছিলেন না, খাঁ-এর ব্যক্তিগত বন্ধুও হয়ে উঠেছিলেন। মুসলিম বহুল কালাত-এ নিজ প্রভাব বিস্তারের প্রতি জিন্নার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির একটি উদাহরণ তাঁর প্রথম জীবনীকার হেক্টর বলিথে দিয়েছেন। ১৯৩৯-এ কোয়েটার এক শিক্ষিত ও সম্পন্ন পরিবারের অতিথি রূপে ভগ্নি ফতিমাসহ থাকার সময়ে সেখানে সপ্তাহ ধরে জিন্না উপজাতীয় অঞ্চল লের সঙ্গে যোগাযোগের কাজ করেছিলেন। প্রগতিশীল গৃহকর্ত্রী পর্দাবিহীন ফতিমাকেও ওইরকম একটি সভায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব দেন যাতে পর্দাপ্রথার শিকার উপজাতীয় সমাজ আধুনিকতার কিছুটা উদাহরণ দেখে শিখতে পারেন। জিন্না রূঢ়ভাবে গৃহকর্ত্রীর সে প্রস্তাব বাতিল করে দিয়ে বলেন যে এর অর্থ হল—চার বৎসর যাবত এখানে যে পরিশ্রম করছি তা বরবাদ করা।

ক্যাবিনেট মিশনের সামনে কালাতের খাঁ-এর দাবি ছিল যে ব্রিটিশ প্রভুত্ব চলে যাবার পর ব্রিটিশ বেলুচিস্তানসহ অন্যান্য বালুচ এলাকা কালাতকে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং ১৮৭৬-এ ইংরাজ সরকারের কালাতের সঙ্গে চুক্তির ঐতিহ্য অনুসারে কালাত অতঃপর স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজত্ব হবে। সমগ্র বালুচ জনসাধারণ এ দাবির সমর্থক হলেও ভিন্ন ভিন্ন কারণে ইংরাজর সরকার ও কংগ্রেস এর বিরোধী ছিল। ইংরাজ সরকার পূর্বে উল্লিখিত ওই এলাকার আর্থ-রাজনৈতিক ও রণকৌশলগত স্বার্থে ওখানকার উপর নিয়ন্ত্রণ ছাড়বে না—এ কথা স্থিরই করে নিয়েছিল। ভারতের প্রধান সেনাপতি অচিনলেক বড়লাট ওয়াভেলের নির্দেশে ১৯৪৬-এর ১১ই মে ওই সিদ্ধান্তের কথা একটি অত্যন্ত গোপন নোটের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করে ব্রিটেনের প্রতিরক্ষাপ্রধানের কাছে পাঠান। ওই নোটের ব্যাখ্যায় বলা হয় যে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলেও ব্রিটিশ স্বার্থে কোনও না কোনও ভাবে সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের উপর ইংলন্ডের প্রভাব বজায় রাখতে হবে। আর যেহেতু কংগ্রেস ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবে না তাই ওই দু'টি অঞ্চল কে ইংরাজের মিত্র মুসলিম লিগের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে। স্যার ওয়ালফ ক্যারোকে সীমান্ত প্রদেশের ছোটলাটের দায়িত্ব দেওয়া ওই ষড়যন্ত্রের প্রধান ধাপ। লেখক বরেন রায় সমালোচ্য গ্রন্থের ১৫৯-৬৩ পৃষ্ঠায় উপযুক্ত দলিল দস্তাবেজের উদ্ধৃতি দিয়ে সেই 'গ্র্যান্ড প্ল্যানের' যবনিকা উত্তোলন করেছেন।

কালাতের সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে বালুচদের স্বশাসন ফিরে পাবার দাবির প্রতি নেহরু ও কংগ্রেসেরও প্রবল আপত্তির সম্ভাব্য দু'টি কারণই ভ্রান্তধারণা প্রসূত। বালুচ 'জিরগা'গুলির মাধ্যমে উপজাতীয়দের মধ্যে স্বায়ত্বশাসন প্রথা ও কালাতের জাতীয় 'জিরগা'য় প্রথম যুগের ইংরাজ সিভিলিয়ানরা যে "বড় বেশি গণতান্ত্রিক" ব্যবস্থা লক্ষ করেছিলেন, কংগ্রেসের এ ব্যাপারে নীতিনির্ধারক নেহরু তার কথা জানতেন না। শাসক নয়, দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের প্রতিষ্ঠার যে নীতি কংগ্রেসের ছিল, তদনুসারে নেহরু কালাতের খাঁ-এর দাবির বিরোধ করেন। বিরোধের সম্ভাব্য দ্বিতীয় কারণ ১৯৪৪খ্রি. থেকেই (ওয়াভেলকে লেখা ভারত সচিব আমেরির ২৩/২৯ নভেম্বরের চিঠি) ব্রিটিশ সরকারের উচ্চতম পর্যায়ে চিন্তা-ভাবনা চলছিল যে ভারতে

কোনও রকম ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হলেও ওই অঞ্চল ব্রিটিশ স্বার্থ বজায় রাখার জন্য বেলুচিস্তানকে তার থেকে পৃথক রেখে ওই অঞ্চল লকেই সেই স্বার্থরক্ষার কেন্দ্র করতে হবে। খুব সম্ভব কংগ্রেস নেতৃবর্গ পূর্বোক্ত পরিকল্পনার কথা জানতে পারেন।

তবে কেবল জওহরলালকেই বেলুচিস্তান সম্বন্ধে ভুল নীতির জন্য দায়ী করা চলে না। তাঁর পূর্বে মৌলানা আজাদ যখন কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন, তখন বালুচ গান্ধী আবদুস সামাদ খাঁ ও কালাত জাতীয় দলের এক তরুণ নেতা গাউস বক্স বিজেনজো-এর নেতৃত্বে এক রাজনৈতিক প্রতিনিধিমণ্ডল আজাদের সঙ্গে দেখা করেন। বেলুচিস্তানের পূর্বতন স্বাধীন সার্বভৌমত্বের ইতিহাস এবং ১৮৭৬-এ ইংরাজদের সঙ্গে চুক্তির কথা উল্লেখ করে তাঁরা জানতে চান যে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তাঁদের কী অবস্থা হবে। ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত বালুচ নেতা এনায়েতউল্লা বালুচের বিবরণ অনুসারে (The Problem of Greater Baluchistan : A Study of Baluch Nationalism) আজাদ প্রতিনিধিমণ্ডলকে বলেন যে তিনি ওই চুক্তির কথা জানেন এবং এও জানেন যে বেলুচিস্তান অতীতে কখনও ভারতের অঙ্গ ছিল না। কিন্তু স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বালুচেরা টিকে থাকতে পারবেন না এবং শেষ অবধি ব্রিটিশ সরকারের সংরক্ষণ চাইবেন। আর একবার ইংরাজ এই উপমহাদেশে থানা গাড়লে এখানকার অবশিষ্ট অংশেরও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে। তাই আজাদ প্রতিনিধিমণ্ডলের কাছে আশা ব্যক্ত করেন যে কেবল বালুচদের সার্বভৌমত্বের দাবি করে তারা যেন ৪০ কোটি মানুষের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন না করেন। বালুচ জনমতের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে কালাতরাজ্য জাতীয় দল যে আজাদের পরামর্শ অস্বীকার করবে—এ কথা বলাই বাহুল্য।

সুতরাং ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রাক্কালে বালুচভাষী এলাকার (কালাত ও ব্রিটিশ বেলুচিস্তান) অবস্থাটা দাঁড়াল এই রকম : কালাতের শাসক খাঁ ১৮৭৬ খ্রি.-এর ইংরাজের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে সমগ্র বালুচভাষী এলাকার কালাতের সঙ্গে সংযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ সার্বভৌমত্ব দাবি করছেন। কংগ্রেস এর বিরোধী ও ওয়াকার অধিবাসীদের (শাসকের নয়) গণতান্ত্রিক অধিকার চায়। জিন্নার নেতৃত্বাধীন লিগ জিন্নার ব্যক্তিগত বন্ধু কালাতের খাঁ ও তাঁর আইনগত পরামর্শদাতার নীতি অনুসারে পাকিস্তানে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিলে (কেবল প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও যোগাযোগের অধিকার ছেড়ে দিলে) অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কালাতসহ যাবতীয় দেশীয় রাজ্যের অপর কোনও অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হবে না। বলা বাহুল্য ওই অবস্থায় পাকিস্তানের সংলগ্ন দেশীয় রাজ্যের শাসকবৃন্দের কাছে জিন্না ও লিগের প্রস্তাবই অধিকতর আকর্ষণীয় ছিল। ১৯৪৭ খ্রি.-এর ১১ই আগস্ট বড়লাট মাউন্টব্যাটেনের সাক্ষাতে জিন্না ও লিয়াকৎ আলি খাঁ মুসলিম লিগের নেতা ও প্রস্তাবিত পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কালাতের খাঁ-এর সঙ্গে এক চুক্তি সম্পাদন করে তাঁর রাজ্যের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিলেন। কালাতের খাঁও ইতিমধ্যে জনসাধারণের ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে সেখানে এক জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করলেন। নির্বাচনের পূর্বে উল্লিখিত গাউস বক্স বিজেনজো-এর নেতৃত্বে রাজ্যের জাতীয় দল মোট ৫০টি আসনের মধ্যে ৩১টি দখল করে সংখ্যাগরিষ্ঠ হল। সেখানকার জাতীয় পরিষদে ১৫ই আগস্ট (পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরের দিন) এক প্রস্তাব গ্রহণ করে কালাতের স্বাধীনতার ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরক্ষা, বিদেশ নীতি ও যোগাযোগের ব্যাপারে পাকিস্তানের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রক্ষা করে চলা হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু গোড়াতেই এ অঞ্চলে ইংরাজদের যে আর্থ-রাজনৈতিক ও রণনীতি সংক্রান্ত স্বার্থ ছিল এবং অবিলম্বে যার সঙ্গে মার্কিন স্বার্থও যুক্ত হল তার কারণ প্রথমে পাকিস্তান ও তার মাধ্যমে সীমান্ত প্রদেশের মতোই স্বশাসিত বেলুচিস্তানও তার কুক্ষিগত হল। সুতরাং কালাতের সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের উপস্থিতিতে জিন্না-লিয়াকৎ আলির চুক্তি ইত্যাদি কাগজেই রয়ে গেল। ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থের তাগিদে পাকিস্তান কালাতের উপর ক্রমাগত পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ণ বিলয়ের জন্য চাপ দিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে ১৯৪৮ খ্রি.-এর শেষ দিকে সেই রেশমি দস্তানাও আর রইল না। পাকিস্তান জোর করেই কালাতকে নিজঅধিকারভুক্ত করে নিল। বেলুচিস্তানের দুর্ভাগ্যের ঘড়াকে পূর্ণ করে দিল অবিশ্বাস্য মনে হলেও ভারত। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিলয়ের প্রশ্নে কালাতের যখন স্নায়ুযুদ্ধ চলছে তখন কালাত ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যায় যাতে ভারত অন্তত তার স্বশাসিত অঞ্চল র মর্যাদা স্বীকার করে। কংগ্রেস নেতৃবর্গ যাতে কালাতের এই ভূমিকা মেনে নেয় তার জন্য তাঁদের বোঝাতে বালুচ গান্ধী খাঁ আবদুস সামাদ খাঁ ও কালাতের শাসকের একজন সরকারি প্রতিনিধি বেশ কয়েকমাস দিল্লিতে থেকে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টায় কোনও ফল হল না। বরং সর্দার প্যাটেলের দক্ষিণ হস্ত ভি.পি. মেনন ১৯৪৮ খ্রি.-র ২৭শে মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে অবিবেচকের মতো প্রকাশ্যঘোষণা করলেন যে পাকিস্তানভুক্তি এড়ানোর জন্য কালাতের খাঁ ভারতের সাহায্য চেয়ে আসলেও ভারত সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করেনি। এই সংবাদ সেইদিন আকাশবাণীর

খবরে কালাতের খাঁ স্বয়ং শুনতে পান এবং ভারতের একজন সরকারি কর্মচারী এমন তাচ্ছিল্য সহকারে এ ব্যাপারের উল্লেখ করায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও মর্মাহত হয়ে অবশেষে নিরুপায়ভাবে পাকিস্তানভুক্তির পক্ষে মত দেন। ভারত সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী নেহরু পরে এ ব্যাপারে সামাল দেবার অনেক চেষ্টা করলেও তখন যা হবার তা হয়ে গেছে।

কালাতের খাঁ চাপে পড়ে পাকিস্তানভুক্তির স্বীকৃতি দিলেও বালুচরা দীর্ঘকাল তাঁদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ছাড়েননি। নিরস্ত্র ও সশস্ত্র উভয় পদ্ধতিতেই তাঁদের এ আন্দোলন চলেছে এবং সীমান্ত প্রদেশের "পাখতুনখোয়া" বা পাখতুনদের স্বশাসনের দাবির মত এখনও চলছে। ইতিমধ্যে বছর দু'য়েকের মতো ছাড়া বেলুচিস্তানে কখনও নির্বাচিত সরকার ছিল না—হয় সামরিক আর নচেত কেন্দ্রের শাসন। বিগত ২০০২ খ্রি.-এ সামরিক প্রশাসক পারভেজ মুশারফের অধীনে যে নির্বাচন হয়েছে তার ফলে বেলুচিস্তানে আবার নির্বাচিত সরকার হয়েছে এবং পাকিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম একজন বালুচ জাফরখাঁ জামালি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র যে কত দিনের জন্য তা ভবিতব্যই জানে। আর এতে বিভিন্ন বালুচ উপজাতীয়দের স্বায়ত্বশাসনের আকাঙ্ক্ষাই বা কতটা পূর্ণ হবে সে প্রশ্নের উত্তরও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। এ প্রসঙ্গে উপসংহারের পূর্বে বিশেষভাবে উল্লেখ্য গ্রন্থে প্রকাশিত ওই এলাকার আটটি মানচিত্র, যা বিষয়টি বোঝার পক্ষে খুবই সহায়ক।

।। ৪ ।।

১৯৪৭-এ ভারতবিভাজন সম্বন্ধে অতীব মূল্যবান এই প্রবন্ধ সঙ্কলন। গবেষক-লেখকের দীর্ঘকালের নিরন্তর অধ্যয়ন মননচিন্তনের নির্যাস যা কেবল বিভাজন-রূপী গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমিকা এবং এর পিছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্রিয়াশীল শক্তিগুলির উপর সন্ধানী আলোকপাত করে। লেখকের মূল উপজীব্য পাঠান ও বালুচদের বিয়োগান্তক কাহিনি বর্তমান আলোচনায় বিস্তারিতভাবে বলা হলেও গ্রন্থটির প্রতিটি রচনাই অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবনীয়। মৌলানা আজাদের ভারতের ঐক্য বজায় রাখার শেষ চেষ্টা (দ্বিতীয় প্রবন্ধ), দেশবিভাগ এড়ানোর জন্য গান্ধীর অন্তিম প্রয়াসপ্রসূত প্রস্তাব (জিন্নাকেই সরকার গঠনের দায়িত্ব দেওয়া) সম্বন্ধে কংগ্রেসে তাঁর একদা অনুগামীবর্গ কর্তৃক জনসাধারণকে বুঝে-সুঝে অন্ধকারে রাখার "পাপ" (তৃতীয় রচনা) প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে লেখক তথ্য ও যুক্তি-ঋদ্ধ আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে বাঙালি হিসাবে স্বভাবতই আমাদের কাছে আকর্ষণীয় "সার্বভৌম বঙ্গের" দাবির বিকাশ ও পরিণতি। তাই এ প্রসঙ্গে গান্ধীজির ভূমিকা সম্পর্কিত প্রবন্ধটির সম্বন্ধে আলোচনা করে বক্তব্যের উপসংহার করা হবে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি ১৯৪৭ খ্রি.-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ঘোষণা করেন যে (ক্যাবিনেট মিশনের ভারতকে বিভক্ত না করে রাজ্য, রাজ্যগোষ্ঠী ও কেন্দ্র ত্রিস্তর বিশিষ্ট প্রশাসনের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবার পরিপ্রেক্ষিতে) একাধিক ক্ষমতা-কেন্দ্রের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যেতে পারে। এর ফলে ভারত ও তার সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব ও বঙ্গ বিভাজনের সম্ভাবনা স্পষ্ট হল। এই সময়ে প্রথমে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লিগের নেতা আবুল হাসিম ও পরে প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী বঙ্গবিভাজন না করে সার্বভৌম বঙ্গের আন্দোলন আরম্ভ করেন। প্রদেশের দুই কংগ্রেস নেতা শরৎ বসু ও কিরণশঙ্কর রায়ের সক্রিয় সহযোগও তাঁরা পান। বলাবাহুল্য ভাষা-সংস্কৃতির দিক থেকে অভিন্ন বাঙালি যেন ধর্মের নামে বিভক্ত না হয়, এই স্বাভাবিক প্রবণতার জন্য হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বহু বাঙালি প্রথম দিকে এ আন্দোলনের সমর্থন করেছিলেন।

জিন্না এ আন্দোলন সম্বন্ধে নিস্পৃহ মনোভাব নিয়েছিলেন, তাঁর প্রকাশ্য বক্তব্য ছিল (বঙ্গবিভাগে যা অবধারিত ছিল) কলকাতা ছাড়া বঙ্গদেশের অর মূল্য কী? হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলকাতা-নোয়াখালির দাঙ্গা ও সুরাবর্দির পক্ষপাতমূলক প্রশাসনের অভিজ্ঞতায় কোনও মতেই আর মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রশাসনের অধীনে থাকার পক্ষপাতী ছিলেন না। বঙ্গদেশের যতটুকু সম্ভব এলাকাকে হিন্দুদের পক্ষে নিরাপদ করা সম্ভব তা করা উচিত—এই বিশ্বাসে তিনি এবং আরও অনেকে বঙ্গবিভাগের পক্ষপাতী ছিলেন। প্যাটেলের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে তিনি কিরণশঙ্কর ও তাঁর অনুগামীদের সার্বভৌম বঙ্গের আন্দোলন থেকে দূরে সরে যেতে প্ররোচিত করলেন। ইতিমধ্যে মাউন্টব্যাটেনের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব হয়েছে। তিনি প্রথমে জিন্না ও নেহরুকে ক্যাবিনেট মিশনের ত্রিস্তরীয় পরিকল্পনা স্বীকার করানোর ব্যর্থ প্রয়াসের পর ভি. পি. মেননের সহায়তায় 'প্ল্যান বলকান' বা ভারতে দুই নয়, প্রয়োজনে আরও অধিক কেন্দ্রের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা রচনা করছেন।

গান্ধী সে সময়ে প্রধানত বঙ্গদেশ ও বিহারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষতের নিরাময় ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার সাধনায় রত। শরৎচন্দ্র বসু ও সুরাবর্দি—আবুল হাশিমেরা অখণ্ড ভাষা-সংস্কৃতির দেশ বঙ্গভূমিতে সার্বভৌম বঙ্গের স্থাপনার তাঁদের প্রস্তাব নিয়ে গান্ধীজির সমর্থন ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। এটলির ফেব্রুয়ারির ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় কংগ্রেসনেতৃবর্গ গান্ধীকে না জানিয়েই

পাঞ্জাব (এবং সেই যুক্তিতে বঙ্গদেশ) বিভাজনের দুই ক্ষমতাকেন্দ্রের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরকরণের দাবি জানিয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তা নির্ধারণের জিন্নার দাবি প্রকারান্তরে মেনে নিয়েছিলেন। স্বভাবতই গান্ধী তাই দুঃখিত ছিলেন এবং অন্তত বঙ্গদেশে ওই ভ্রান্তনীতির বদলে অখণ্ড জাতীয়তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে পারে এই সম্ভাবনার প্রতি নৈতিক সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমশ বঙ্গীয় কংগ্রেসের মতো মুসলিম লিগেও এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বাঁধা আরম্ভ করে। সুরাবর্দির বিরোধী নাজিমুদ্দিন গোষ্ঠী জিন্না ও লিগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নীতির প্রতিকূল সার্বভৌম বঙ্গের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সুরাবর্দি-হাশিম-শরৎ বসুর গান্ধীর সঙ্গে শেষবার আলোচনার সময়ে গান্ধী এই প্রশ্ন তোলেন যে ভবিষ্যতে সার্বভৌম বঙ্গের বিধানসভার সদস্যরা যদি সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় (অর্থাৎ ৫১ শতাংশ ভোটে) ভারত বা পাকিস্তানে যোগদান করতে চান তা হলে কী করা হবে? পূর্বোক্ত নেতৃত্রয়ের কাছে এর সন্তোষজনক উত্তর না থাকায় গান্ধী প্রস্তাব করেন যে সার্বভৌম বঙ্গের আত্মবিলোপ করে ভারত বা পাকিস্তানে যোগদান করার জন্য বিধানসভার মোট সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ ছাড়াও পৃথকভাবে উভয় সম্প্রদায়ের সদস্যদেরও দুই তৃতীয়াংশের সমর্থন পেলে এ রকম সম্ভব হবে— এই মর্মে বঙ্গের লিগ ও কংগ্রেসের বিধানসভার বর্তমান সদস্যদের স্বীকৃতি পেতে হবে। লিগের সদস্যদের কাছ থেকে এমন স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব হবে বেশি বিধানসভায় লিগ সদস্যদের নেতা সুরাবর্দি বা প্রাদেশিক লিগের সম্পাদক আবুল হাশিমের ভরসা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে গান্ধী সার্বভৌমবঙ্গের প্রস্তাব সম্বন্ধে নিজ সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। এর ফলে পরবর্তীকালে একাধিক বাঙালি জাতীয়তাবাদপ্রেমী হিন্দু-মুসলমানের নিন্দা-সমালোচনার শিকার হতে হয় গান্ধীকে।

শ্রীযুক্ত বরেন রায় তাঁর সংক্ষিপ্ত হলেও এতদসংক্রান্ত সুলিখিত প্রবন্ধটিতে পূর্বাপর সমস্ত ঘটনাক্রম তুলে ধরে গান্ধীর বিরুদ্ধে অকারণ সমালোচনার অযৌক্তিকতা সিদ্ধ করেছেন। অধিকন্তু এ প্রসঙ্গে আরও দু'টি স্বল্পজ্ঞাত তথ্যও পরিবেশন করেছেন। প্রথমত, 'প্ল্যান বলকানের' মাধ্যমে এক নয়, একাধিক পাকিস্তান সৃষ্টির দ্বারা ভারতকে ছিন্নভিন্ন করার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ছিলেন বলে নেহরু "সার্বভৌম বঙ্গের" (এবং সেই কারণে পাখতুনিস্তানের) দাবির বিরোধিতা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। নেহরুর সামনে কেবল ভারতের ফরাসি-পর্তুগিজ অধিকৃত এলাকার সমস্যা অথবা হায়দরাবাদ, ভূপাল প্রমুখ দেশীয় রাজ্যের পৃথক থাকার প্রস্তুতির সমস্যা ছিল না, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের মহারাজা ইতিমধ্যে স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। দ্বিতীয়ত, কলকাতা ও বঙ্গদেশে দীর্ঘকালের ব্যবসায়িক স্বার্থ রাজস্থানী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও বিশেষ করে বিড়লাদের থাকায় শ্রীঘনশ্যামদাস বিড়লাও আর্থিক কারণে বঙ্গবিভাজনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য প্যাটেলের মাধ্যমে ওই বণিকস্বার্থ বঙ্গীয় কংগ্রেসের হিন্দু সদস্যদের প্রভাবিত করে।

ঘটনার প্রায় ৫৬ বৎসর পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে কেবল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয়মন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ও তাঁর অনুগামীবৃন্দ এবং শ্রীমতী ইলা মিত্রের মতো শত শত একদা লিগের বন্ধুস্থানীয় কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীদের 'সে দেশ' ছাড়তে বাধ্য হবার পরিপ্রেক্ষিত বিচার করলে বোঝা যাবে যে সার্বভৌম বঙ্গের প্রস্তাবে সমর্থন প্রত্যাহার করে গান্ধী বাঙালির উপকারই করেছিলেন। আরও বিবেচ্য আছে। ১৯৪৭ খ্রি.-এর পরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান বাঙালিদের ভারতে আগমন অব্যাহত আছে। বাংলাদেশ সৃষ্টির ও শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রিত্বের পর কিছুদিন এই স্রোত কিছুটা বন্ধ হলেও মোট মিলিয়ে অমুসলমানরা কোনও না কোনও কারণে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ও শাসিত দেশে থাকতে পারছেন না। সমগ্র বঙ্গ দেশে "সার্বভৌম বঙ্গের" নামে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে পশ্চিমবঙ্গ নামক অমুসলমান বাঙালিদের এই নিবাসের অস্তিত্ব কি থাকত?

সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি

ভ্রমণ বিভ্রম

চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল

পাওয়া কাকে বলে যে মানুষ জানে না, খোঁওয়াকেই সে পাওয়া মনে করে—রবীন্দ্রনাথ

প্রাক কথন

পর্যটন এক প্রাচীন প্রবণতা। এক বিচিত্র বিলাসিতাও বটে। যেখানে যেমন ভাবেই শুরু হয়ে থাকুক, চাহিদা হিসাবে এর উত্থান অপ্রতিহত। সেকালের ট্রাভেলার এ কালে হয়ে উঠেছে টুরিস্ট। যা ছিল ব্যক্তির আপন খেয়াল তার ক্রমিক ব্যাপ্তি সামাজিক চাহিদায়, আমোদিত অবকাশ যাপনের প্রকরণ হিসাবে। এই ব্যাপ্তির মূলে ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা। ভ্রমণ হয়ে উঠল আধুনিকতার অপরিহার্য সহচর। আধুনিক ভ্রমণকারী হয়ে উঠল টুরিস্ট। জনপ্রিয়তার অমোঘ অভিমুখ বাণিজ্যায়ন। আবার সফল বাণিজ্যায়নের প্রভাবেই জনপ্রিয়তার জোয়ার। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে এ এক নির্বিকল্প জোড়। এই পারস্পরিক পরিপূরণ প্রক্রিয়ার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন পর্যটন। কাজের ব্যস্ততা থেকে ক্ষণিক অবসরের আবডাল খোঁজে মানুষ। শুধু রুটিন জীবন থেকে নয়, চিরচেনা পরিবেশ থেকেও। স্থানান্তরে তার অবকাশযাপনকে উপভোগ্য করে তুলতে তৎপর পেশাদার উদ্যোগীরা। অবসরবিলাসী মানুষের নিজস্ব মুহূর্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে আবির্ভূত এই নয়া বৃত্তিজীবী শ্রেণি। তাদের নিবেদিত পশরার চিত্রার্পিত বিজ্ঞাপন নজরে এলে ঘরে থাকাই দায়। তাদেরই পেশাদারিত্বে উচাটন পর্যটকের অগোছালো ভ্রমণে ক্রমশ পরিকল্পিত রূপারোপ। তার যাত্রা আর সুচিপত্রবিহীন, অকিঞ্চিত্ত হয়ে রইল না।

আজকের বিশ্বের এক অতি বৃহৎ শিল্প টুরিজম। জ্বালানি, মোটরগাড়ি এবং পর্যটন-এই তিনটি শিল্পের স্থান আজকের আন্তর্জাতিক বাজারে সবার ওপরে। ১৯৯৪ সালের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বের কর্মনিযুক্তির সাড়ে ছয় শতাংশ পর্যটন শিল্পে। টুরিস্ট বা পর্যটক শব্দটির আধুনিক অর্থে কোনও সর্ববাদিসম্মত সংজ্ঞা নেই। মানুষকে নানা কারণে, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করতে হয়। স্বাস্থ্যের কারণে, পুণ্যার্জনের অভিলাষে, আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে মিলন-বিচ্ছেদ উপলক্ষে, ব্যবসা কিংবা চাকুরিসূত্রে। এ ছাড়া সাগর-পাহাড়ের টান, নির্জন নিসর্গের হাতছানি, নিছক আয়েসি ছুটি কাটানোর বিলাসিতা-সবরকম উপলক্ষ্যের ভ্রমণের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্বে এদের পরস্পরকে আলাদা করা যায় না। পর্যটনের সংজ্ঞা সন্ধান হয়েছে বিস্তর, কিন্তু তার এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। সরকারি পরিসংখ্যানে সাধারণভাবে স্বল্প সময়ের জন্য স্থানান্তরিত মানুষদেরই গণনা করা হয়ে থাকে। সেই হিসাবে সব ধরনের ভ্রমণকারীই পর্যটক শ্রেণিভুক্ত। তবে পর্যটন বা টুরিজম অবশ্যই কর্মব্যপদেশে ভ্রমণ নয়, আমোদ-অবসরে ঘেরা ভ্রমণ। সংখ্যাতত্ত্বে নির্ঘুতভাবে ধরা না দিলেও, পর্যটন বলতে ধরে নিতে হয় প্রাত্যহিকতায় সাময়িক যতি টেনে মুক্তির তাগিদে বেরিয়ে পড়া। আর সেই তাগিদে তা দেবার অভিপ্রায়েই পর্যটন এ সময়ের অন্যতম বর্ধিষ্ণু শিল্প।

প্রাচীনকালের ভ্রমণের সঙ্গে জড়িয়ে যে কৃচ্ছ্রসাধন প্রবণতা তাতে স্বাভাবিক কারণেই বীতস্পৃহ আধুনিক টুরিস্ট যাদের আবির্ভাব উনিশ শতকের শুরুর দিকে। তার ভ্রমণ-বিলাস ছকে-বাঁধা আয়েসি সফর। এক কালে ধারণা ছিল, আটপৌরে চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে পড়া মানে চিত্তের মুক্তি, কিংবা বৈষয়িক সংকীর্ণতা থেকে অন্তত সাময়িক স্বস্তি। এই বিশ্বাস আগলে যারা সে যুগে অচেনার পথে পা বাড়াত, তাদের কাছে গন্তব্যস্থলটি ভ্রমণের সর্বৈব আকর্ষণ ছিল না। পথের কষ্ট, যন্ত্রণা, ক্লান্তি ও সুখের অন্নমধুর অভিজ্ঞতাও তার প্রাপ্তিকে সমৃদ্ধি, সম্পূর্ণতা দিত। আজকের পর্যটক সেই অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে নারাজ। ভ্রমণ তার প্রতিদিনের কর্মক্লান্তি অপনোদনের উপায়। নির্ঝঞ্ঝাট, নিরুপদ্রব, অভাশবিহীন, মসৃণ সফরে তার পর্যটন-পরিতৃপ্তি। তার চাহিদার রঙ স্বভাবতই আলাদা। পথের প্রাপ্তিতে তার স্পৃহা নেই। তার দৃষ্টি গন্তব্যে। ভ্রমণের আদিকালে ছিল তীর্থযাত্রা। যাত্রীদের সমাবেশে উঁচুনিচু সবাই সামিল। কালের প্রভাবে ভ্রমণের নেশা ধর্মের চৌহদ্দি ডিঙিয়ে বিত্তবান সমাজের বিলাসিতার উপকরণ। ক্রমে মধ্যবিত্তের জগতে তার বিস্তার সমাজ-সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে। জেফ্রি চসার যদি এ যুগের লেখক হতেন, তা হলে অবশ্যই তাঁর কেন্টারবেরিগামী তীর্থযাত্রীদের কাহিনিটি সমস্ত উপাদান অটুট রেখে হয়ে উঠতে পারত অত্যাধুনিক প্যাকেজ টুরের একটি অনবদ্য উপাখ্যান। বিগত শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কলকাতা শহরের

অবস্থাপন্ন বাঙালি সমাজে দস্তুর ছিল পশ্চিমে হাওয়া বদল করতে যাওয়া। সৈয়দ মুজতবা আলির সেই বিখ্যাত উক্তি স্মর্তব্য—আড্ডা আর ভ্রমণ ছাড়া বাঙালিকে ভাবাই যায় না। অনেকেরই নিজস্ব আবাস ছিল ঝাড়গ্রাম, গিরিডি, শিমূলতলা, দেওঘর, মধুপুর, ঘাটশিলা ইত্যাদি স্বাস্থ্যকর জায়গায়। সেখানকার জল-হাওয়ার টানে, শরীর মনের উন্নতির অভিলাষে নিয়মিত যাতায়াত চলত। আজকের ভ্রমণার্থী আর শুধুই পশ্চিমমুখো হয়ে বসে নেই। পূর্ব, উত্তর, দক্ষিণ সবদিকেই উজাড় তার পর্যটন-প্রীতি। এই প্রীতিভোজে সামিল মানুষের ভিড়ে মধ্যবিত্তই, বলাবাহুল্য, সংখ্যাগরিষ্ঠ। যাবতীয় আয়োজন তাদেরই সেবায় উৎসর্গীকৃত।

ভ্রমণের আধুনিকতায় তীর্থস্থানের গুরুত্ব লাঘব হয়নি মোটেই। বরং হয়ে উঠেছে আরও জনপ্রিয়। পুণ্যের আধার হিসাবে যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে। তুষারতীর্থ অমরনাথ, বৈষ্ণোদেবী কিংবা আরও দুর্গম তীর্থপথের জনসমাবেশে ভ্রমণবিলাসীদের সংখ্যা পুণ্যার্থীদের চাইতে কোনও অংশে কম নয়। যা ছিল দ্রষ্টব্য হিসাবে চিরপুরনো কিংবা আদৌ কোনওদিন ধর্তব্য হিসাবে গ্রাহ্য হয়নি, সে রকম অনেক জায়গা নতুন সাজে, অভিনব চেহারায় হয়ে উঠেছে টুরিস্ট স্পট। পর্যটন-পিপাসু জনতার চাহিদা পরিতৃপ্ত করতে আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে নিত্যনতুন স্থান। বদলেছে ভ্রমণ, বদলেছে ভ্রমণকারীর মানসিকতা। ছোট বড় যে কোনও আকারের ছুটিতে এখন মানুষ বহির্মুখী। পুজোর ছুটি এগিয়ে এলে পরস্পরের কাছে একটিই প্রশ্ন, ...এবার কোথায় যাচ্ছেন? সুদূরপিয়াসী জনতাকে ঘিরে পর্যটন-বাণিজ্যের পসার। পর্যটকের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা প্রতিদিনের জীবন-সংঘাতে হাঁপিয়ে ওঠা মানুষকে নির্ঝঞ্ঝাট সফরসুখ উপহার দেবার জন্য সদাপ্রস্তুত। আয়োজনের যাবতীয় দায় তাদের। সম্ভাব্য ক্রেতার পছন্দের সঙ্গে পাল্লা দিতে উপহার দিয়ে চলেছে নতুন নতুন প্যাকেজ। তাদের হাতে নিজেদের সমর্পণ করে অচেনার পথে পাড়ি দিচ্ছে লাখো মানুষ পাহাড়-সাগর, শহর-বন্দরের পথ-পরিক্রমায়। শুধু অর্থমূল্য ধরে দিলেই ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ। নিশ্চিন্ত সফর ও নিশ্চিত বাণিজ্যের সহাবস্থান। একঘেঁয়ে ক্লান্তিকর কর্মস্থল, টিভির পর্দা, ছুটির সন্ধ্যায় ক্লাব, হোটেল, বার, রেস্তোরাঁ যতটা অপরিহার্য, ততটাই জরুরি প্যাকেজ মোড়া পরিপাটি ভ্রমণ। যে ক্রেতার পছন্দের প্যাকেজ যত ব্যয়বহুল, ততই মহিমময় তার সামাজিক অবস্থান। পরজীবী পর্যটকের দুনিয়ায় দূরের নেশায় মাতাল, প্রকৃতিপ্রেমী, খেয়ালি ভ্রমণার্থীরা লুপ্তপ্রায় প্রজাতি।

ধর্মভীরু মানুষের পুণ্যসন্ধানী পথে যার শুরু, সেই তীর্থভ্রমণের সঙ্গে কর্মব্যস্ত মানুষের ক্লান্তি অপনোদনের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। ছিল যাবতীয় মানসিক দীনতা, বৈষয়িক সংকীর্ণতা থেকে চিত্তের মুক্তির সন্ধান। আজকের পর্যটন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে, সত্যিই রুমাল থেকে বেড়াল হয়ে ওঠার বিচিত্র কাহিনি। একদিকে যেমন দায় প্রতিদিনের ক্লান্তি আর একঘেয়েমি থেকে পরিত্রাণের, অপরদিকে তেমনই পর্যটনকে উপলক্ষ করে আধুনিক সমাজে বিশিষ্টতা অর্জনের সুযোগ। আধুনিকতার প্রতিযোগিতায় বাড়ি, গাড়ি, আসবাবপত্র ও অন্যান্য গৃহসামগ্রীর যে ভূমিকা, পর্যটনপ্রীতিও তার অংশীদার। কাছে-দূরে পা বাড়ানো এ যুগের মানুষ তাই আর খেয়ালি ভবঘুরে নয়। আবার ভ্রমণ তার ব্যক্তিগত খেয়ালখুশির বশবর্তীও নয়। এটি পূর্ণমাত্রার বিশ্ববিস্তারী শিল্প। পর্যটক তাই আর নিছক বিষয়-উদাসী ভ্রমণকারী নয়-উৎপাদিত পণ্যের নিয়মিত ক্রেতা ও ভোক্তা। এই পণ্য তার বিষয়মুখী অস্তিত্বের শেকড়টিকে আরও গভীরে ছড়িয়ে দেয়। ভ্রমণ-সংস্কৃতির এই বিবর্তনের পথে আধুনিক ভোক্তা-ভ্রমণকারীর অবস্থান এক আশ্চর্য বৈপরীত্যের দিকনির্দেশ।

কবে আমি বাহির হলেম

ব্রিটিশ সংস্কৃতির সংস্পর্শে এ দেশের বিত্তশালী সমাজ ভ্রমণ সংস্কৃতির ইজারা নেয়। উচ্চবিত্ত ভারতীয়দের কাছে সাহেবি সৌখিনতাকে আত্মস্থ করার বিভিন্ন পন্থার সঙ্গে দূর-ভ্রমণও যুক্ত হয়। ভ্রমণ-বিলাসিতা সে সময়ে তাদের দৃষ্টিতে সাহেব হয়ে ওঠার একটি দুর্লভ সুযোগ। উচ্চবিত্তের বিলাসিতার সামগ্রীটি যখন কালক্রমে মধ্যবিত্তের আওতায় এসে পড়ল, সেই সুবাদেই ঘটল এ দেশের ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন।

ভারতবর্ষের ভ্রমণের অতীত-বর্তমান জুড়ে হিমালয়। সময়ের প্রভাবে তা হয়েছে আরও জমকালো। পর্যটকদের রুচি পছন্দের অজস্রতা কখনও নিরাশ হয়নি তার কাছে এসে। সেই তীর্থযাত্রার যুগ থেকেই হিমালয়কে ঘিরে আপামর মানুষের আকর্ষণ অমোঘ ঈশ্বর ও নিসর্গ প্রেমের মিলনক্ষেত্র হিসাবে। হিমালয়ের কোলে কোলে ছড়িয়ে তীর্থস্থান। যত দুর্গম তত বেশি তার মাহাত্ম্য। ভারতীয় হিমালয়ের পশ্চিম-মধ্য অংশে গাড়োয়াল অঞ্চল গোটা পর্বতশ্রেণির পবিত্রতম এলাকা। গঙ্গোত্রী, বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ—তীর্থযাত্রীদের কাছে এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। পাহাড়শৃঙ্গ থেকে নেমে আসা হিমবাহ দেবাদিদেব মহাদেবের কেশদাম, এ রকমটাই লোকায়ত বিশ্বাস। তীর্থযাত্রীদের কাছে গঙ্গার উৎসমুখে মৃত্যু পরম পুণ্যদায়ী। আবার বৌদ্ধ ধারণায়, কৈলাশ পর্বতের পথে প্রাণ হারানোর চেয়ে সৌভাগ্যজনক আর কিছু নেই। একদিকে শতাব্দী-প্রাচীন তীর্থক্ষেত্রে ধর্মপ্রাণ মানুষের ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ, অপরদিকে উজাড় করা নিসর্গ সৌন্দর্যে আসক্ত মানুষের কাছে এর ভূমিকা অপার শান্তির পীঠস্থান হিসাবে সেই উদার প্রকৃতির সমারোহের মধ্যে ভ্রমণকারীরা আবিষ্কার করেছে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। এই চরিত্র বৈশিষ্ট্যের সুবাদে 'দেবতাত্মা হিমালয়'।

দূরের আহ্বানে প্রায় বিষয়-বিমুখ জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন, সে যুগে এমন পর্যটকের সংখ্যা নেহাত নগণ্য ছিল না। এদের

অন্যতম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ভ্রমণের নেশায় তিনি জোড়াসাঁকোয় নিজের বাড়িতেই বলতে গেলে ক্ষণিকের অতিথি। 'হিমালয় ভ্রমণ' রচনাটি ভ্রমণ-পাগল মহর্ষির একান্ত অনুভব। হিমালয়ের পথে আওয়ান মহর্ষি লিখছেন, 'আমার সঙ্গের এক ভৃত্য এক বনলতা হইতে তাহার পুষ্পিত শাখা আমার হস্তে দিল। এমন সুন্দর পুষ্পের লতা আমি আর কখনও দেখি নাই। আমার চক্ষু খুলিয়া গেল, আমার হৃদয় বিকশিত হইল। আমি সেই ছোটছোট শ্বেতপুষ্পগুলির উপরে অখিলমাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম।' [১]হিমালয়ের বিশালতা ও সৌন্দর্যের সামনে ভারতীয়দের মতো বিদেশি পর্যটকেরাও সমান আপ্লুত। ১৮২৪ সালে কুমায়ুন অঞ্চল পরিভ্রমণ শেষ করে ব্রিটিশ পর্যটক বিশপ হেবার লিখছেন: 'Everything around was so wild and magnificent that man appeared as nothing and I felt myself as if climbing the steps of the alter of god's great temple.'[২]

সেই যুগের ভ্রমণ অনেক ক্ষেত্রে সংসারবৈরাগ্যের সূচনা করেছে। প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যে আবিষ্ট ব্যক্তির উত্তরণ ঘটেছে এক প্রসারিত চৈতন্যে। পরবর্তী সময়ে হিমালয়-ভ্রমণে বৈচিত্র এনেছে তার অফুরান প্রাকৃতিক প্রাচুর্য। সব ধরনের মানসিকতা ও রুচির ভ্রমণকারীদের সন্তোষবিধান করার মতো সম্পদ তার অঢেল। আদিকালের তীর্থযাত্রী থেকে আধুনিক পর্যটক সবার কাছে সমান জনপ্রিয় হিমালয়। ক্রমশ তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দক্ষিণ ভারতের শৈলশ্রেণি। তার মূলে নিশ্চিত ভাবেই ব্রিটিশ প্রভাব। ব্রিটিশ জমানা শুরু হবার পর থেকে এ দেশের ভ্রমণ-সংস্কৃতিতে জোয়ার আসতে শুরু করে। এ দেশে আসার পর ব্রিটিশেরা গোড়ার দিকে আস্তানা গড়েছিল সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে। অসহনীয় তাপ ও রোগব্যাধির প্রকোপ থেকে রেহাই পেতে সামুদ্রিক আবহাওয়ায় তারা স্বস্তি খুঁজত। সাগরতীরে ভ্রমণকেন্দ্রের উদ্ভব তাদেরই সৌজন্যে।

উনিশ শতকের গোড়ার থেকে ব্রিটিশ বাসিন্দারা দেশের ভেতরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। তা শুধু প্রশাসনিক সুবিধার জন্য নয়। তাদের জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়াটাও একটা বড় কারণ। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভিত মজবুত করার পর এ দেশের পার্বত্য অঞ্চলের শীতলতায় তারা আবিষ্কার করে অভ্যস্ত স্বদেশি জলবায়ু। সমতলের গরমে রোগ-ব্যাধি থেকে দূরে থাকার জন্য শৈলপ্রদেশই প্রকৃষ্ট বিকল্প। উত্তরে হিমালয়ের গায়ে নৈনিতাল, দেরাদুন, সিমলা, দার্জিলিং ইত্যাদি। দক্ষিণে নীলগিরির কোলে মহাবালেশ্বর, উটকামন্ড, মাথেরান, কুন্নুর ইত্যাদি স্থানগুলি রাতারাতি শৈলশহর হয়ে উঠল। এই জায়গাগুলিকে তারা বলত Edenic sanctuaries বা স্বর্গোদ্যান-সদৃশ স্বাস্থ্যনিবাস। দেখতে দেখতে প্রায় ৬৫টি হিল স্টেশন গড়ে ওঠে উত্তর-দক্ষিণে। ইওরোপীয়দের প্রিয় জায়গা হবার সুবাদে এ দেশের উচ্চবিত্ত সমাজের নজর পড়ল এ দিকে। সাহেবিয়ানা রপ্ত করার নানা প্রচলিত পন্থার সঙ্গে এটিও যুক্ত হল তাদের জীবনে। রাজা-মহারাজা, বণিক, বিত্তশালী আইনজীবী ও অন্যান্য ভারি পেশার ভারতীয়রা হিল স্টেশনের ইওরোপীয় আভিজাত্যে মজতে শুরু করে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে। অর্থ ও সংস্কৃতির অহঙ্কার বলে তারা ব্রিটিশ সমাজের সান্নিধ্যের দাবিদার। ফলত, শৈলশহরগুলিতে ইওরোপীয় সমাজের আঙিনায় তাদের আনাগোনা শুরু। এই ভ্রমণপ্রয়াসের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল কিছুটা ধর্মীয় বিশ্বাসও। পাহাড়ের পথে ভ্রমণ যে শারীরিক ধকল তা তাদের যুগিয়ে দিত হরিদ্বার কিংবা হিমালয়ের অন্যান্য তীর্থপথে যাত্রার কৃচ্ছ্রসাধন এবং পুণ্য অর্জনের আবেগ। সুদীর্ঘ পথ ঘোড়ার পিঠে, টাঙায়, নৌকোয়, ঝাঁপান অথবা পালকিতে দুর্গম পথে যাত্রা অশেষ কষ্টকর। 'হিমালয় যাত্রা' রচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন 'চৈত্রমাসের শেষে ড্যালহৌসি পাহাড়ে যাত্রা করা গেল। অমৃতসরে মাস আর কাটিতেছিল না। হিমালয়ের আহ্বান আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়েছিল। যখন ঝাঁপানে করিয়া পাহাড়ে উঠিতে ছিলাম তখন পর্বতের উপত্যকা-অধিত্যকা দেশে নানাবিধ চৈতালি ফসলে স্তরে স্তরে, পংক্তিতে পংক্তিতে সৌন্দর্যের আগুন লাগিয়া গিয়াছিল।'

উনিশ শতকের মাঝামাঝি শৈলশহর গড়ে ওঠার সেই কালে বেনারস থেকে দার্জিলিং পৌঁছতে একমাসেরও বেশি সময় লেগে যেত। অনেক সময় কুলি-বেহারারা প্রাণান্তকর পরিশ্রম থেকে রেহাই পাবার জন্য মাঝপথ থেকে পালিয়ে বাঁচত। ১৮৪০ সাল নাগাদ কলকাতা থেকে দার্জিলিং ছিল পাঁচদিনের পথ। মাদ্রাজ থেকে নীলগিরিও সেই সময়ে দিনপাঁচেকের দুরত্বে। ১৮৩৪ সালে টমাস মেকলে এই পথ পেরন এক সপ্তাহে। বম্বে থেকে যাত্রীরা সমুদ্রপথে ৭০ মাইল, নদীর উজানে তিরিশ মাইল, তারপর হাঁটাপথে আরও ৩৫ মাইল পেরিয়ে তাদের গন্তব্যস্থল মহাবালেশ্বরে পৌঁছত। সেই সময়ে কলকাতা থেকে সিমলায় গ্রীষ্মাবাসে যাবার জন্য গভর্নর জেনারেল মহোদয় সদলবলে রাজভবন থেকে ১০০০ মাইলেরও বেশি পথ অতিক্রম করতেন মাসাধিক কাল ধরে।

এ দেশে বসবাসরত ইওরোপীয়রা অনেকে এই হিল স্টেশনগুলির মধ্যে খুঁজে পেত আঠেরো শতকে ইংল্যান্ডে সমুদ্রের ধারে গজিয়ে ওঠা সৈকতাবাসগুলিকে। ব্রাইটন, ম্যাগেট, স্কারবরো এবং ওয়েমাউথ-এর সিসাইড-রেসর্টগুলো দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ও-দেশে। একই ঘটনা বাথ, বাক্সটন, চেলটেনহ্যাম, টানব্রিজওয়েলস-এর স্পা-টাউনগুলোর ক্ষেত্রেও। সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল এই সব স্থানগুলির রোগ নিরাময় ক্ষমতা রয়েছে। তারা ভাবত, সমুদ্রের জল স্নান ও পানে ব্যবহার করলে অসুখ-বিসুখের উপশম হয়। ব্রিটিশদের ধারণা ছিল ভারতের শৈলশহরগুলিও সেই ধরনের নিরাময় কেন্দ্র হয়ে উঠবে। ১৮৩৯ সালে যখন দার্জিলিং-এ একটি স্বাস্থ্যনিবাস গড়ে তোলা নিয়ে

দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তখন কলকাতার একটি সংবাদপত্রে লেখা হয়: Darjeeling must and will be our Brighton'[৩]। একই রকমভাবে মহাবালেশ্বরে একটি স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের বিষয়ে দাবি উঠেছিল ঃ We have no Bath or Cheltenham, as at home, where freedom from care and enjoyment of a large and gay society generally performs those cures which are attributed to the virtues of their far-famed springs.[৪]

জনপ্রিয়তার কারণে মুসৌরি হয়ে ওঠে হিমালয়ের মার্গেট[৫]। আবার অনেকের ধারণায়, সিমলার সঙ্গে কলকাতার সম্পর্ক ব্রাইটনের সঙ্গে লন্ডনের সম্পর্কের মতোই। দক্ষিণে উটকামন্ডও একই রকম মর্যাদা পেতে লাগল। নীলগিরি পর্বতের ওপর সমুদ্রপিঠ থেকে ৭৫০০ ফুট ওপরে চিত্রার্পিত এই শৈলশহরটি দ্রুত হয়ে উঠল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। উনিশ শতকের শেষদিক থেকে এই তিনটি হিলস্টেশনের খ্যাতি উপমহাদেশ ছড়িয়ে যায়। মর্যাদায় প্রায় সমতুল্য স্থানে মহাবালেশ্বর, নৈনিতাল ও দার্জিলিং। জনপ্রিয়তায় এদের পরই মাউন্ট আবু, কুনুর, ডালহৌসি, কোদাইকানাল, মাথেরন, মুড়ি ও শিলং। ভ্রমণার্থীর সংখ্যা যত বাড়তে থাকে, ততই এ সব জায়গার সামাজিক জীবন প্রাণবন্ত এবং কসমোপলিটান হয়ে উঠতে থাকে। অপেক্ষাকৃত শান্ত, ছোটখাটো হিল স্টেশনগুলির সঙ্গে এদের মর্যাদার তফাত বাড়তে থাকে। ভারতে বসবাসকারি ব্রিটিশদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল তাদের পক্ষে প্রথম শ্রেণির হিলস্টেশনে বেড়াতে যাওয়া সাধ্যাতীত হয়ে ওঠে।

১৮৭০ সালে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয়, কলকাতার স্বল্প ও মাঝারি আয়ের ভ্রমণেচ্ছুদের কাছে দার্জিলিং হল 'সিলড বুক'। এই আয়ের অঙ্ক ধরা হয়েছিল, মাসে পাঁচ-ছশো টাকা পর্যন্ত। উনিশ শতকের শেষদিককার একটি হিসাব অনুযায়ী, সিমলার মতো জায়গায় থাকতে হলে মাসিক আয় অন্তত ১৫০০ টাকার কম হলে চলবে না। দুর্বলতর সামর্থের ভ্রমণার্থীদের তাই ছোটখাটো হিলস্টেশন খুঁজে নিতে হত। এই ধরনের শ্রেণি বিভাজনের নজির হাতের কাছেই। ইংল্যান্ডের সমুদ্র-সৈকতগুলিতে অবাঞ্ছিত ভিড় যাতে উচ্চবিত্ত পর্যটকদের অবসর বিনোদনে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে সে জন্য কিছু কিছু জায়গা পরিকল্পনামাফিক ভাবে ব্যয়বহুল করে তোলা হয়। স্বভাবতই, সাধারণ মানুষ সে ক্ষেত্রে সামাজিক মর্যাদায় ভাগ বসাতে পারবে না। দার্জিলিংয়ের ব্যাধি নিরাময় ক্ষমতার সুখ্যাতিতে পশ্চিমীবাবুরা পঞ্চমুখঃ It is incredible what a few weeks of that mountain air does for the Indian-born children of European parents. They are taken there sickly, pallid or yellow, soft or flabby, to become transformed into models of rude health and activity.[৬] সিমলা, উটি, মহাবালেশ্বর ও অন্যান্য হিলস্টেশনগুলিও স্বাস্থ্যোদ্ধারের আদর্শ জায়গা হিসাবে স্বীকৃতি পায়। হিলস্টেশনগুলির ভারতীয়করণ দেশের স্বাধীনতার জন্য অপেক্ষা করেনি। উনিশ শতকের শেষদিকেই পশ্চিমীকেতাদুরস্ত ভারতীয়দের প্রভাব-প্রতিপত্তির বাসনায় ইওরোপীয় সান্নিধ্যসুখের সন্ধানে হিলস্টেশনে যাতায়াত শুরু। মাথেরান বম্বে থেকে মাত্র ৫৪ মাইল। ১৮৮০ সালের মধ্যেই বহু ব্যবসায়ী ও অন্যান্য ভারি পেশায় নিযুক্ত ভারতীয়রা ছুটিতে নিয়মিত মাথেরান যাতায়াত শুরু করে। ১৮৮২ সালেই সেখানে ভারতীয়দের জন্য পাঁচটি হোটেল। এ ছাড়াও ধর্মশালা, স্বাস্থ্যনিবাস গড়ে উঠতে থাকে। ১৯০২ সালে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সচিব এইচ. এইচ. রিজলি ক্ষুণ্ণমনে যে রিপোর্ট জমা দেন তাতে বলা হয়ঃ 'নিঃসন্দেহে অর্থবান ভারতীয়দের মধ্যে পাহাড়ে গ্রীষ্ম কাটানোর প্রবণতা বাড়ছে'[৭]। শিল্পপতি জে.এন.টাটা মাথেরান-এ গড়লেন উইকএন্ড রেসর্ট, কুচবিহারের মহারাজা দার্জিলিং-এ স্থাপন করেন কয়েকটি ভিলা, সিমলায় চারটি বাড়ি, উটিতে একটি। আবার শিলং-এ শ্রেষ্ঠ বাড়িটির মালিক ঢাকার নবাব। এ দেশের বাণিজ্যিক সুতিকাগার বম্বে। সেখানকার ব্যবসায়ী, আইনজীবী, চিকিৎসক, আমলা ও অন্যান্য পশ্চিমীভাবাপন্ন ভারতীয়রা অবসর বিনোদনের জন্য আকর্ষণীয় জায়গার সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পাহাড়ের টানই তীব্রতম। কলকাতা ছিল পশ্চিমী সংস্কৃতিতে দীক্ষিত ভারতীয়দের সব চেয়ে পুরনো নিবাস। সেখানকার নাগরিকেরা ছুটি কাটানোর জন্য পাহাড়মুখী হয়ে ওঠে। গন্তব্য মূলত দার্জিলিং। কিপলিঙ-এর আ টেল অব টু সিটিজ কবিতায় রয়েছে, The babus ... stealing to Darjeeling.

১৮৮৭ সালে দার্জিলিং-এ লুইস জুবিলি স্যানিটোরিয়াম তৈরি হল। সেখানকার খদ্দেরদের বেশির ভাগ কলকাতাবাসী। রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিবের ১৯০৩ সালের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছেঃ ইদানীং এদেশের লোকেদের দার্জিলিং ভ্রমণ বড্ড বেড়ে গেছে।[৮] তারা থাকত কোনও বোর্ডিংহাউস অথবা এই স্যানিটারিয়ামে। ভ্রমণের জন্য প্রিয় সময় ছিল এখনকার মতোই সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস, অর্থাৎ পুজোর ছুটিতে। ১৮৪০ সাল নাগাদ গড়ে ওঠা সাহেবদের এই সাধের শৈলাবাস ছিল ভ্রমণেচ্ছুদের জন্য কম খরচে বেড়ানোর জায়গা, পরিভাষায় 'লো-কস্ট ডেস্টিনেশান'।

উনিশ শতকের শেষাশেষি সিমলায় পর্যটকদের ভিড়ে পাঞ্জাবিরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। অবস্থাপন্ন পাঞ্জাবিরা সেখানে ছুটি কাটাবার জন্য বাংলো কিনতে থাকে। যেমন কিনেছিল বাঙালিরা বিহারের নানা জায়গায়। ১৯২০ সাল নাগাদ সেখানে বেশ কিছু হোটেল গড়ে ওঠে গোঁড়া হিন্দু ও মুসলিমদের জন্য। দুই মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে মাঝারি স্তরের আই.সি.এস অফিসারদের মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে

যায়। তারাও দাবি করল পূর্বসুরি ব্রিটিশ অফিসারদের সমমর্যাদার সুযোগ-সুবিধা। প্রসঙ্গত, এদের মধ্যে ছিলেন যশস্বী লেখক বেদ মেহতার বাবাও। তিনি ছিলেন জনস্বাস্থ্য বিভাগে একটি উঁচুপদে। প্রতিবছর গ্রীষ্মে তিনি সপরিবার সিমলায় যেতেন। নৈনিতালেও ভারতীয়দের যাতায়াত ক্রমাগত বাড়তে থাকে। দক্ষিণে উটিতেও তাই। এই যাত্রায় ইন্ধন যোগাল গাইড বুকগুলি। হিলস্টেশনগুলি সম্পর্কে আকর্ষণীয় তথ্যাদি সম্বলিত বই বাজারে বেরতে লাগল। তাতে স্থানমাহাত্ম্য থেকে শুরু করে যাতায়াত, আহার-অবস্থান, বিনোদন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে বিশদ বিবরণ থাকত। এক কথায় আজকের টুরিস্ট গাইডের প্রাথমিক সংস্করণ। সমতলের রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য ঝুটঝামেলা থেকে রেহাই পেতে হলে পাহাড়েই শ্রেয়, এই কথাটির বিশেষভাবে উল্লেখ থাকত বইগুলিতে। আর থাকত পাহাড়ের রোগ নিরাময়কারী জল-হাওয়ার গুণকীর্তন। থাকত যক্ষ্মা, ডায়াবেটিস ও রক্তাল্পতা জাতীয় অসুখের উপশমে পাহাড়-ভ্রমণ কত জরুরি তার সাতকাহন। মানসিক কষ্ট-যন্ত্রণা লাঘব করার ক্ষেত্রে পাহাড় কত উপকারি তার উল্লেখও বাদ যেত না। আর সেই সঙ্গে নিসর্গ শোভার মনোহারি বর্ণনা। দার্জিলিং সম্পর্কে একটি পুস্তিকার বক্তব্যঃ The voice of the silence from afar will whisper into your ears and your fancy will lift you up on its wings and carry you to a region of heavenly ecstasy conjuring up an unspeakable sense of the infinite glory of the great unseen Hand behind.[৯] এই বর্ণনা অবধারিতভাবে মনে করিয়ে দেবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অখিলমাতার হস্ত অনুভব।

সরকারি কাজকর্ম গ্রীষ্মে শৈলশহরে স্থানান্তরিত করার প্রথায় ছেদ পড়ে ১৯৩০ এর শেষদিকে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ঘাটতি পড়ায় শহরগুলির পৌরকর্তারা অন্যভাবে ক্ষতিপূরণে সচেষ্ট হলেন। যুক্তপ্রদেশ সরকার যখন নৈনিতাল থেকে গ্রীষ্মকালীন প্রধান কার্যালয় তুলে নেয়, তখন সেখানকার পৌরবোর্ড একটি প্রচার ও উন্নয়ন বিভাগ গড়ে তোলে ভ্রমণসহায়িকা ও অন্যান্য প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশ করে ভ্রমণকারীদের আকৃষ্ট করবার জন্য। ১৯৩৯ সালে এই বিভাগের ভারতীয় অধিকর্তার বক্তব্য অনুযায়ী পর্যটকের সংখ্যা আবার বাড়তে শুরু করে। ব্রিটিশ জমানা শেষ হয় আপামর ভারতীয়ের মধ্যে পাহাড়ের আকর্ষণ সংক্রামিত করে। স্বাধীনতার পর শৈল শহরগুলির চেহারা বদলাতে লাগল। গ্রীষ্মাবকাশ যাপনকারিদের ভিড়ে ঘিঞ্জি হয়ে উঠতে লাগল। দোকানপাট, হোটেল-রেস্তোরাঁর রমরমা বেড়ে গেল। ছোটখাট ছুটিতেও বেরিয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা দিল। এর আর একটি বড় কারণ মোটরগাড়ির আগমন। ব্রিটিশদের মতোই ভারতীয়রাও গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্য দলে দলে পাহাড়ের শরণাপন্ন। অবসরযাপন, বৈচিত্রের সন্ধান, প্রকৃতির সান্নিধ্য, প্রাত্যহিক জীবনের চাপ থেকে সাময়িক মুক্তির দায় তাদের টেনে নিয়ে চলল পাহাড়ে। বাঁধনবিহীন উচ্ছ্বাসে কখনও বা বেপরোয়াও কেউ কেউ। অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার শুরুও সেই থেকেই। 'সহসা হিমালয়', 'হিমালয় বিচিত্রা' ইত্যাদি ভ্রমণকাহিনির লেখক ধ্রুব মজুমদারমশাইয়ের ভাষার শরণ নিলে পরিবর্তনের ধরনটা এরকম : পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত...যাত্রীর সাক্ষাৎ মিলত। দেখে চট করে বোঝা যেত না, কিন্তু এরা ছিল আমাদের পাঁচ হাজার বছরের সৃষ্টিশীল হিমালয় যাত্রার একেবারে শেষদিককার যাত্রী। পেছনদিক থেকে মোটরগাড়ি ধাওয়া করে আসছে, মাঝেমাঝে ডিটোনেটরের বিকট আওয়াজ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, কিন্তু সে সব সত্ত্বেও হিমালয়ের বিভিন্ন উপত্যকাপথে তখনও যাত্রীদের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যেত। তারপরই ওলোটপালোট হয়ে গেল। উন্নয়ন এল, পর্যটন এল, আর সবশেষে ভীমগর্জনে এল প্রতিরক্ষা। চতুর্দিকে মোটর রাস্তা ছড়িয়ে পড়ল, পুরনো তীর্থপথ বাতিল হয়ে গেল, চটিগুলো মুখ থুবড়ে পড়ল, আর তার বদলে গজিয়ে উঠল অজস্র ছোট টাউনশিপ। বিবিধ ভরতীয় কোলাহলে পাহাড়ি ঝরনার কলতান চাপা পড়ে গেল। ছড়িদারকে হটিয়ে দিয়ে এল সরকারি টুরিষ্ট অফিসার। চটিওয়ালার বদলে এল ধূর্ত হোটেলওয়ালা।[১০]

রেলপথ ধরে

এই ওলটপালটের পেছনে বৃহত্তম ভূমিকা অবশ্যই রেলওয়ের। সারাদেশ জুড়ে তার কর্মকাণ্ড। রেলপথের দুর্দম বিস্তারে সাগর থেকে পাহাড় সূচনা করল সেই আশ্চর্য মেলবন্ধনের, যার কৃপায় ভ্রমণস্পৃহা ছড়িয়ে পড়তে লাগল সাধারণ মধ্যবিত্ত জনতার জগতে। পর্যটনের দ্রুত শ্রীবৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করে উত্তর-পশ্চিম রেলওয়ের সেলস ম্যানেজার সিমলায় এক কর্তাকে লেখেন নতুন পর্যটককূল আবির্ভূত হয়েছে ঃ

Experience with our rail-cum-road schemes from Bengal, Bombay, United Provinces, central India and the Punjab to Kashmir indicate that there is a new class of visitors increasing in numbers annually who visit hill stations. This class consists almost entirely of respectable Indian gentlemen and their families recruited from the professional classes, i.e, doctors, teachers, students, small landlords and successful businessmen.[১১]

উনিশ শতকের মাঝামাঝি ভারতবর্ষে রেলওয়ের আবির্ভাব ভ্রমণ-সংস্কৃতিতে নিয়ে আসে যুগান্তর। শৈলশহর থেকে সাগর সৈকত অবধি সস্তায় ও কম সময়ে স্থানান্তরিত হবার অপ্রত্যাশিত সুযোগ এল সাধারণ্যে। ১৮৫৫ সালে কলকাতা থেকে রানিগঞ্জ রেলপথ চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে গরুর গাড়িতে কষ্টকর দার্জিলিং

যাত্রার পথ এক ঝটকায় ১২০ মাইল কমে গেল। ওদিকে দেশের উত্তরে চলেছেই স্টবেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের ব্যাপক বিস্তার। তবুও শোনা যায়, ১৮৭৩ সালে এডওয়ার্ড লিয়ারকে আটদিনের যমযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল দার্জিলিং-এর পথে। মাঝরাস্তায় তাঁর গরুর গাড়িটি ভেঙে পড়ে। কুলিরাও পালিয়ে যায়। ১৮৮১ সালে ন্যারোগেজ রেলপথ পৌঁছোয় দার্জিলিং-এ। এর ফলে সমতলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় কলকাতাবাসী মাত্র একুশ ঘন্টায় পৌঁছে যেতে লাগল সেখানে। রেলের আশীর্বাদ যথাসময়ে পৌঁছে গেল সিমলা ও পশ্চিম হিমালয়ের অন্যান্য শৈলশহরে। ১৮৬৯ সাল থেকে ভ্রমণকারীদের আম্বালা জংশন অবধি ট্রেনে যাতায়াত শুরু। সেখানে ঘোড়ার গাড়ি ধরে ৩৮ মাইল পথ পেরিয়ে পাহাড়ের তলায় ছোট্ট গ্রাম কালকায়। সেখান থেকে ঘোড়ায় পিঠে কিংবা ঝাপানে চেপে আঁকাবাঁকা ৫৬ মাইল পথ ধরে গিল স্টেশন। কালকায় রেলপথ আসে ১৮৯১ সালে। তারপর বছর দশেক ধরে পাহাড়ের ভেতর অজস্র সুড়ঙ্গ খুঁড়ে সিমলায় রেলের আগমনবার্তা ঘোষিত হয় ১৯০৩ সালে। ১৯০০ সালে হরিদ্বার থেকে দেরাদুন রেলপথ চালু হলে মুসৌরি উত্তরভারতের সব চেয়ে সুগম শৈলশহর হয়ে ওঠে। দক্ষিণভারতেও একই ভাবে মাদ্রাজ থেকে উটকামন্ড পৌঁছতে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত দুদিনের বেশি সময় লাগত। ন্যারোগেজ চালু হলে ১৮৯৯ নাগাদ তা অনেক কমে যায়। দেশের যে কোনও হিলস্টেশনই রেলজংশন থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে। সময়ের ব্যবধান কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীর জোয়ার। রেলপথ চালু হবার আগে পর্যন্ত হিলস্টেশনে বহিরাগতরা আসার অনুমতি পেত শুধু কর্মসুত্রে আর চিকিৎসা-সংক্রান্ত কারণে। এবার স্বল্পকালের বিশ্রামে উৎসাহী মানুষের ভিড় বাড়তে লাগল যথারীতি সেই সুবাদে হোটেল, বোর্ডিংও। উটিতে ১৮৫৭ সাল অবধি ছিল দু'টি মাত্র হোটেল। ১৮৮৬ সালে সংখ্যাটি বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল এগারোতে।

ভারতীয় মনস্তত্ত্বে ভ্রমণ এবং রেলওয়ে কীভাবে একাকার, তার একটি উদাহরণ পাওয়া যায় ১৮৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রচারিত একটি সংবাদে। খবরটি ছিল এরকম ঃ লেফটেনান্ট কর্নেল কুপেজ নামে এক ব্রিটিশ সেনা অফিসার অমরনাথে গুহা সন্দর্শনে যান। পবিত্র শিবলিঙ্গ থেকে তিনি খানিকটা বরফ খাবলে নেন দুপুরের খাবারে যাতে ব্র্যান্ডি ও জল ঠান্ডা থাকে। এই হঠকারিতার ফল ভোগ করতে বিশেষ দেরি হয়নি তাঁর। বছর কয়েক বাদেই সাহেব উন্মাদ হয়ে যান। তারপর সেই অবস্থায় এক দিন রেললাইনে মাথা পেতে আত্মহত্যা করেন তিনি। ক্ষিপ্ত দেবতা এভাবে তাঁর অপমানের প্রতিশোধ নেন।[১২] রেলওয়ের আগমন ঘিরে গণ-পর্যটনের সুত্রপাত ইংল্যান্ডে যেভাবে হয়েছিল, এ দেশও প্রায় তেমনটাই। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইংল্যান্ডে সাধারণ মানুষের মধ্যে রেলভ্রমণের ধুম পড়ে। ভ্রমণ যত জনপ্রিয় হতে থাকে, ততই পর্যটকদের স্টেটাসের তারতম্য প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। সমুদ্রতীরে ভ্রমণের খরচ কম বলে সেখানে স্বল্প আয়ের ভ্রমণার্থীদের নজর গেল। ফলে বিত্তশালী, মর্যাদা-সচেতন শ্রেণির চোখে সমুদ্রের আকর্ষণ রইল না। বহু পর্যটনকেন্দ্র প্রমাদ গুনতে লাগল। অর্থবান ক্রেতারা বিমুখ হলে শুধু পর্যটনকেন্দ্রের কৌলিন্য চলে যাবে বলেই নয়, মাথায় হাত পড়বে ব্যবসায়ীদেরও। ইংল্যান্ডের ব্ল্যাকপুল এ রকমই একটি জায়গা। শঙ্কিত সম্ভ্রান্ত পর্যটককুলের আর্জি-এক্ষুনি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। সস্তার ট্রেনযাত্রা আর স্রোতের মতো পর্যটক ঢুকতে দেওয়া বন্ধ করা হোক। নইলে ব্ল্যাকপুল অচিরেই নষ্ট হয়ে যাবে, আর ভদ্রলোকেদের কাছে এ জায়গাটির কোনও কদরই থাকবে না। ভাড়া সস্তা হলে মাস টুরিজম-এ যে রমরমা, তাকে ব্যঙ্গ করে রাসকিন মন্তব্য করেন, 'এবার আধঘন্টার মধ্যে বাক্সটনের সব মূর্খেরা বেকওয়েলে আর বেকওয়েলের মূর্খেরা সব বাক্সটনে পৌঁছে যাবে।'[১৩] পশ্চিমবঙ্গে যেসব পর্যটনকেন্দ্র মাস টুরিজমের জন্য ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত তাদের অন্যতম দার্জিলিং।

তবে এ কথা ঠিক, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পর্যটকসমাজে শ্রেণিবিভাজন এতটা কদর্য হয়ে ওঠেনি এখনও। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যে রেলওয়ের সৌজন্যে পর্যটনের ধারণাটিই আমূল পাল্টে যায়। প্রায় স্থাণু একটা সমাজ চলিষ্ণু হয়ে ওঠে। দৃষ্টিতে জুড়ে যায় নতুন মাত্রা, প্রকৃতির বিশালতাকে অনুভব করার এক আশ্চর্য প্রেক্ষিত। এই অনুভব দৃশ্যপট হয়ে ফুটে ওঠে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে। 'সিংহভূম' রচনায় তিনি লিখছেন ঃ

> স্টেশনের পর স্টেশন চলিয়া যাইতেছে। শরতের ঝলমলে রৌদ্র সবুজ নারিকেল বনে, সুপারি গাছের সারিতে, শেওলাভরা পুকুরঘাটে, খড়ের ঘরে, ধানের মরাইয়ে মাঝে মাঝে ফাঁকা মাঠ, জলা—হৈমন্তী ধান সুপক্ক হইয়া উঠিয়াছে, সামনেদূরে বিচালি ছাওয়া গ্রাম, তাহাদের সকলের উপর মেঘহীন, নির্মল নীল আকাশ। কোলাঘাটের পুল পার হইবার সময় দূরে নদীর বাঁকে একটা অন্তরীপ কী সুন্দর দেখাইতেছে। দু-দশটা নারকেল গাছ, আর একটুখানি সবুজ তৃণাবৃত মাঠ, সেখানটাতে যেন নদীর মধ্যে অনেকখানি ঢুকিয়া গিয়াছে—শরতের দুপুরে কী সুন্দর তার দৃশ্য।

চলচ্ছবির এই ক্রমবিস্তারি দৃশ্যপট স্পষ্টতই ধাবমান ট্রেনের জানলা থেকে দেখা। শুধু ভ্রমণের সুযোগ আপামর জনতার কাছে পৌঁছে দেওয়া নয়, নিজের চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে প্রকৃতিকে দেখার এই অভিনব প্রেক্ষিত যুগিয়ে দেবার ক্ষেত্রে রেলওয়ের অবদান ঐতিহাসিক। রেলভ্রমণে সব শ্রেণির মানুষকে প্রবৃত্ত করার জন্য কর্তৃপক্ষ নানারকম পুস্তিকা প্রকাশে উদ্যোগী হল। ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের একটি পুস্তিকায় লেখা হলঃ 'শিলঙ ইংল্যান্ডের হ্যাম্পশায়ার ও সারের কোনও কোনও জায়গার মত সুন্দর।' ঈস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের এ রকম একটি প্রচার-পুস্তিকার

নাম ছিল ছুটির দিনে বিপুল আয়াজন। এ ছাড়াও ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে অনেক বইপত্র বেরতে থাকে মানুষকে ভ্রমণে যথাসম্ভব উৎসাহিত করার অভিপ্রায়ে। ট্রেনের যাত্রাপথ অনুসরণ করে আঞ্চলিক বিবরণ তথা ভ্রমণকাহিনি রচনার একটি ধারাও চালু হয়। ১২৬২ বঙ্গাব্দে 'রেলপথে বঙ্গদর্শন' নামে একটি বেশ স্থূলকায় বই লেখেন কালিদাস মৈত্র। এর পঁচিশ বছর পর দুর্গাচরণ রায়ের 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' নামে একটি বই বাজারে আসে। এটি উত্তরভারত থেকে কলকাতায় রেলপথে ভ্রমণের আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত। তারপর ১৩০৫ বঙ্গাব্দে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি সঙ্কলিত 'পথপ্রদর্শক অর্থাৎ রেলগাড়িতে পথভ্রমণের সহায়' নামে বইটি বেরয়। আবার ইস্টবেঙ্গল রেলওয়ে থেকেও এই জাতীয় একটি বই প্রকাশ করা হয় ১৯৪০ সালে। দু'খণ্ডের এই বইটির নাম 'বাংলায় ভ্রমণ'। কিংবদন্তিমূলক কাহিনির ওপর জোর দেওয়া হলেও ভ্রমণ নির্দেশিকা হিসাবে ও সমসাময়িক তথ্যসংকলনের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লেখা হয় ঃ 'পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলির যে যে অংশে বহু বঙ্গভাষাভাষীর বাস আছে এবং বাংলার সহিত যাহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে, বাঙ্গালি ভ্রমণকারীর সুবিধার জন্য এই পুস্তকে তাহাদেরও স্থান দেওয়া হইয়াছে। রেলপথের নিকটবর্তী স্থান ব্যতীত রেলস্টেশন হইতে মোটরযান, স্টিমার বা নৌকাযোগে যেসকল প্রসিদ্ধ ও প্রাচীনস্থানে যাওয়া যায়, তাহাদের বিবরণও ইহাতে দেওয়া হইল।' এর আগে ১৯২৮ সালে পূর্ব রেলওয়ের প্রচারদপ্তর পূজার ভ্রমণ নির্দেশিকা প্রকাশ করেছিল। তাতে কলকাতা থেকে কাশ্মীর—রেলপথ সন্নিহিত প্রধান ভ্রমণকেন্দ্রগুলির বিস্তারিত বিবরণ ছিল।

আজকের পর্যটন

আজকের পর্যটকও তীর্থযাত্রী। তবে তার তীর্থযাত্রার সংজ্ঞা আলাদা। আধুনিক তীর্থযাত্রীর কাঁধের ঝুলিতে ধর্মগ্রন্থ নেই। নেই যাত্রাপথে কৃচ্ছ্রসাধনের দায়ও। তার সুটকেসে টুরিস্ট গাইডবুক আর পকেটে মুশকিল আসান ক্রেডিট কার্ড। ভ্রমণকারী হিসাবে যতটা, তার চেয়ে ঢের বড় ভূমিকা ক্রেতা এবং উপভোক্তা হিসাবে। তার ভ্রমণ-বিলাস বিষয়বৈরাগ্যের প্রকাশ নয়, বরং উল্টোটাই। নিজের সামাজিক অবস্থানের ভিত আরও উন্নত ও পোক্ত করে তোলাই আধুনিক টুরিস্টের প্রধান লক্ষণ।

আধুনিক পর্যটনের সূচনা, বলতে গেলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। অনেক গবেষকের মতে মধ্যবিত্ত পর্যটকের এই উত্থান বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের এক বিরাট সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঘটনা। কারুর কারুর মতে উনিশ ও বিশ শতকের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ফসল টুরিজম, যা ছিল উচ্চবিত্তের সামগ্রিক এক্তিয়ারে। রেলপথের বিস্তার ও মোটরগাড়ির চল বেড়ে যাবার পাশাপাশি অন্যান্য সামাজিক পরিবর্তনও অনিবার্য হয়ে ওঠে। অফিসে, কলকারখানায় সময়কে নিয়মের নিগড়ে বাঁধা, ছুটি সংক্রান্ত আইনকানুন বিধিবদ্ধ করা—ইত্যাদির সুবাদে সাধারণ মানুষের জগতে অবসরসময়ের ভূমিকা বড় হয়ে উঠতে থাকে। শুধু কাজ দাবি করা নয়, কাজের গুণাগুণ সম্পর্কে কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে বাধ্য হল। ছুটি কর্মীদের দক্ষতা বাড়ায়। সুতরাং অবসরযাপন উপভোগ্য করে তোলার জন্য চালু হওয়া সবেতন ছুটি, ভ্রমণ ভাতা ইত্যাদি উপঢৌকন নিতান্ত ঘরকুনো মানুষকেও নিশির ডাক দিয়ে বাইরে টেনে আনে। ভ্রমণের প্রবণতা থাকুক , চাকরির সুবাদে প্রাপ্ত সুবিধাগুলোর সদ্ব্যবহার না করলে সামাজিক প্রতিষ্ঠায় জৌলুস থাকে না। জনপ্রিয় দ্রষ্টব্য স্থান ভ্রমণ, যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম শুধু নিত্যদিনের একঘেয়েমি থেকে নিষ্কৃতি দেয় না, প্রতিবেশীর ঈর্ষার কিছুটা বাড়তি ইন্ধনও যোগায়।

১৯৯৩ সালের লেজার স্টাডিজ অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, গড়ে ৬,৪০,০০০ ঘন্টা আয়ুবিশিষ্ট একজন মানুষ ৬০,০০০ ঘন্টা ব্যয় করে কাজে, এবং ২,৮০,০০০ ঘন্টা অবসর সময় পায়, অদূর ভবিষ্যতে তার কাজের সময়ের গড় আরও কমে গিয়ে দাঁড়াবে ৪০,০০০ ঘন্টা। অবসর যাপন এবং ভ্রমণের জন্য তার প্রাপ্তি হবে তিনলক্ষ ঘন্টা।[১৪] অবসরের ভাঁড়ারের সমৃদ্ধি তাকে যুগিয়ে দেয় বাড়তি উপার্জনের প্রবৃত্তি। বাড়তি আয় ব্যক্তিকে প্রমোদভ্রমণের বাড়তি সামর্থ যোগায়। ক্রেতা হিসাবে আরও সমর্থ হয়ে ওঠার প্রেরণাবশত পর্যটন-বিলাসের পরিতৃপ্তি। এই বিলাস দৃষ্টির নয়, আয়েসের। দূরে কোনও পাহাড়ের কোলে, কিংবা হোটেল-সৈকতাবাসে যথেষ্ট বিলাসিতায় আহার-অবস্থান ও কেনাকাটার সুখ চরিতার্থ হবার নিশ্চয়তা না থাকলে সফর নিরর্থক। আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকেরা কেউ কেউ সঙ্গত কারণেই আধুনিক পর্যটকদের ভ্রমণকারীর মর্যাদা দিতে নারাজ। ভ্রমণকারীরা স্বভাবত সক্রিয় এবং অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয়। পক্ষান্তরে, টুরিস্ট নিষ্ক্রিয়, আমোদবিলাসী, পরিপার্শ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। ড্যানিয়েল বুরস্টিন এর মতে টুরিজম হল বাস্তবতা-বর্জিত, তুচ্ছ ও নিস্তেজ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা যা পুরোপুরি বাণিজ্যিক নিরাপত্তার বেষ্টনীতে ঘেরা। তাঁর বক্তব্য, ভ্রমণের দুঃখজনক পরিণতিই হল গণ-পর্যটন। প্যাকেজ নামে শব্দটির আবেদনের কাছে ব্যক্তির ভ্রমণ সমর্পিত। কারণ, দলবদ্ধ ভ্রমণ শুধুই কম খরচে স্বাচ্ছন্দ বিহার নয়, একদম অচেনা পরিবেশে আনন্দ এবং নিরাপত্তা—দুইয়েরই আশ্বাস। সেকালের ভ্রমণার্থীর প্রার্থিত ছিল মিশ্র অভিজ্ঞতা। আজকের পর্যটকের কাঙ্ক্ষিত নির্ঝঞ্ঝাট, সৌখিন সফর। নিজস্ব উদ্যোগে সে নিরাসক্ত। গুপি আর বাঘা প্রথম সুযোগেই ভূতের রাজার কাছে যেখানে খুশি যেতে পারার বর চেয়ে নিয়েছিল। তাতে পথশ্রমের বালাই নেই। এক লহমায় যে কোনও জায়গায় পৌঁছে যেতে সক্ষম তারা। আজকের পর্যটকের জন্যও ভূতের রাজা সশরীরে হাজির ভ্রমণের দায়দায়িত্ব সানন্দে বইবার জন্য। ক্যামেরা প্রস্তুতকারক বহুজাতিক সংস্থা কোডাক-এর এক কালে বহুল প্রচারিত

শ্লোগান ছিল 'ইউ প্রেস দ্য বাটন, উই ডু দ্য রেস্ট', যা আজকের ভ্রমণবিলাসের মর্মবাণী। টুর কনডাকটরের অভিভাবকত্বের ওপর পর্যটক শিশুর মতো নির্ভরশীল। তার ভ্রমণসূচি পূর্বনির্ধারিত। অর্থ এবং অভিভাবকত্ব দুই-ই মসৃণ সফরের স্বার্থে নিবেদিত। তার ভ্রমনসূচিতে নিজস্ব সময় বলে যেমন কিছু নেই, নেই নিজস্ব দৃষ্টিও। সরবরাহ ও ভোগের এই প্রক্রিয়াটিতে অপরাপর ক্ষেত্রের মতোই পর্যটকও ক্রেতা হিসাবে অভ্যস্ত ও আস্থাশীল। গন্তব্য নির্বাচন ও দ্রষ্টব্য পরিভ্রমণের যাবতীয় ব্যবস্থা যখন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে অনায়াসলভ্য, তখন ক্রেতার উপভোগে স্বভাবতই প্রাপ্তিসুখ খুব গভীর নয়। আয়োজন অঢেল হলে প্রাণের আনন্দে ঘাটতি পড়ে। 'আমাদের এই ভ্রমণের কালটা ব্যাপ্তির দিকে যেরকম প্রাপ্তির দিকে সেরকম নয়,' (যাত্রী) এই আক্ষেপ রবীন্দ্রনাথের, সেই ১৯২৭ সালে।

উনিশ শতকের মানুষের সাধারণ প্রবণতা ছিল সঞ্চয়। বিশ শতকে অর্থনীতির মূলমন্ত্র ভোক্তাকে যথাসম্ভব ব্যয়ে প্ররোচিত করা। একুশ শতকে সেই মন্ত্র আরও উচ্চকিত। আধুনিক ভোক্তার আনন্দ ক্রয় এবং স্বত্বলাভে সীমাবদ্ধ। উপযোগিতাকেন্দ্রিক উপভোগের প্রশ্ন তার কাছে অবান্তর। টুরিস্ট হয়ে ওঠার ঘটনাটি, বস্তুতপক্ষে, মধ্যবিত্তের আধুনিকতার অঙ্গ। একটি দামি গাড়ি কিংবা সুন্দর বাড়ির মালিকানার মতোই। মূল প্রশ্নটি সোশ্যাল স্টেটাস-এর। নিজের প্রকৃত সামাজিক অবস্থানের চেয়ে উচ্চতর শ্রেণিভুক্ত হিসাবে জাহির করার অন্যতম উপায় হল, সমর্থ ক্রেতার ভূমিকায় উত্তরণ। এই উত্তরণ প্রয়াসের সূত্রে জীবন কাঙ্ক্ষিত অর্থ ও উত্তেজনা খুঁজে পায়। ব্রিটেনে মধ্যবিত্ত মানুষ অবসর সময়ের চল্লিশ শতাংশ ব্যয় করে পর্যটনে। অন্যথা তার স্টেটাসের লেখচিত্র নিম্নগামী। ভোগ, অবসরযাপন ও বিনোদনের ক্ষেত্রে ভারতীয়রা. বাকি বিশ্বের মতোই কসমপলিটান কালচার সন্ধানী। বিশ্বায়নের প্রভাবে তা আরও দুর্বার। সিনেমা, টিভি, হোটেল-রেস্তোঁরা সংস্কৃতির সঙ্গে জুড়ে গেছে পর্যটন। নগর শহর সদর মফস্বলের ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্তের জগতে আধুনিক প্রচারমাধ্যম অনবরত পৌঁছে দিচ্ছে ভোগসুখের নবতম যোড়শোপচার। যে কোনও পণ্যের মূলত দু'ধরনের মূল্য থাকে। একটি হল ব্যবহারিক মূল্য যা মানবিক প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে। অপরটি প্রতিকী ক্ষমতা-বিনিময় মূল্য। সব পণ্যই তো শ্রমের ফসল। শ্রম হল পণ্যমূল্যের প্রাথমিক উৎস। পণ্যটির যত বাণিজ্যিকরণ ঘটে ততই সে নতুন নতুন মূল্য পরিগ্রহ করে। একটি উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে পৌঁছে অন্য দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় হওয়া-মাত্র পণ্যে পরিণত হয়। মানবিক পরিষেবাও আধুনিক উৎপাদনের অঙ্গ, যেহেতু তা পণ্যের বিমূর্ত বিনিময়ের পথ সুগম করে। সুতরাং পর্যটন যথার্থই একটি পণ্য। আর পাঁচটি পণ্যের মতোই পর্যটন প্যাকেজও বিজ্ঞাপনী প্রচারের মাধ্যমে বিনিময়যোগ্য।

আধুনিক সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে বিজ্ঞাপনের কাজ দ্বিবিধ। একটি হল, ভোগ্যপণ্যটিকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন। দ্বিতীয়ত, মানুষকে বোঝানো যে ভোগের মাধ্যমে শুধু তৃপ্তি নয়, মানসিক-শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, সুখ, বিশ্রাম ও প্রাণশক্তির পুনরুদ্ধার সম্ভব। বিজ্ঞাপন ব্যক্তিকে উৎসাহিত করে তার স্বতঃস্ফূর্ততা বিসর্জন দিয়ে বিজ্ঞাপিত পর্যটন-পণ্যের ভোক্তা হতে। নিত্যদিনের কায়ক্লেশে বিপর্যস্ত মানুষটির কাছে অবসর বিনোদনের সুখটুকুর ষোলআনাই কাম্য। তাই ব্যক্তিগত উদ্যোগের চাইতে প্যাকেজই তার কাছে বেশি লোভনীয়। অয়োজনের ধকল এড়িয়ে, সবরকম দায়ভারমুক্ত পর্যটক প্যাকেজ-এর নিটোল নিরাপত্তায় নিশ্চিন্ত। সংরক্ষিত যাত্রা, একই পথের পথিকদলের সান্নিধ্য, অপেক্ষাকৃত কম খরচে বিলাসবহুল থাকা-খাওয়ার নিশ্চয়তা, গাইডের চোখের আলোয় দেশদর্শন, পরিচিত পরিবেশে সুরক্ষিত পথচলার স্বস্তি। হঠাৎ অসুস্থতায় বিপন্ন হয়ে পড়া বা স্থানীয়দের অবাঞ্ছিত সান্নিধ্যের আশঙ্কাও নেই। যে-অনিশ্চয়তা আধুনিক জীবনে দিবারাত্রের সঙ্গী, বিনোদনের স্বার্থে তা থেকে সাময়িক রেহাই পাবার জন্য অর্থমূল্য দিতে কারুর আপত্তি নেই। পর্যটনশিল্পের সমৃদ্ধি নির্ভর করছে বাজারসমীক্ষার মাধ্যমে মধ্যবিত্ত জনতার ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও পছন্দ সঠিকভাবে যাচাই করার ওপর। ভোগস্পৃহার মধ্যে আধুনিকতার যে বহিঃপ্রকাশ, তা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন পন্থায় বৈচিত্র খোঁজে। ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে যাবার প্রতিক্রিয়ায় বিলাসদ্রব্যের বাজারে তার অহং-অন্বিত উপস্থিতি। নিজের সামাজিক অবস্থানকে উন্নীত করার জন্য বিকল্প কিছু তার জানা নেই। বিশ শতকের অর্থনীতি উনিশ শতকের সঙ্গে ব্যবধান গড়ে তুলল ঢালাও উৎপাদন আর ভোগের সংস্কৃতির সৌজন্যে। পর্যটনের যত বিস্তার ঘটছে, ততই সংস্কৃতিকে প্যাকেটে মুড়ে, বাজারদর নির্ধারিত করে আর পাঁচটা জিনিসের মতো বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। সচ্ছল পর্যটককে শিল্পোদ্যোগীরা জানিয়ে দিচ্ছে, 'পৃথিবীটা তোমাদের ভোগ্য। প্রাকৃতিক সম্পদ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য– সবকিছুই অর্থমূল্যে বিনিময়যোগ্য। তুমি অর্থবান হলে এ সবকিছুই তোমার জন্য সাজানো।' [১৬]

এই আনন্দযাত্রার পথ আরও সুগম করেছে প্রচারমাধ্যম। টিভির অজস্র চ্যানেল, দৈনিক পত্রিকার জমকালো ক্রোড়পত্র, সাময়িকপত্রের ফোটোফিচার প্রতিনিয়ত নতুন-পুরনো পর্যটনকেন্দ্রের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত রঙিন ছবি উস্কে দিচ্ছে জনতার ভ্রমণবিলাস। শুধু পর্যটন বিষয়ক পত্রিকার সংখ্যা গত কুড়ি বছরে যত বেড়েছে তার হিসাব থেকেই বাণিজ্য হিসাবে টুরিজম এর হালফিল চেহারা ও চাহিদা অভিব্যক্ত। সেই সঙ্গে ইন্টারনেটে দ্রুত ভেসে উঠছে বহু ওয়েবসাইট অসংখ্য দ্রষ্টব্যস্থানের ইতিবৃত্ত নিয়ে। বাস্তবে যত সুন্দর, পর্দায় তার বিবরণ ও ছবি অন্তত দশগুণ। পর্যটনসংস্থার ঠিকানা, দ্রষ্টব্য সংক্রান্ত তথ্যের আহরণ থেকে শুরু করে ঘরে বসে পরিকল্পিত ভ্রমণের সবরকম ব্যবস্থা করে ফেলা সম্ভব। প্রচারমাধ্যমের সৌজন্যে লোভনীয় সব ফ্যান্টাসি মধ্যবিত্তের বৈঠকখানার উপকরণ। ইতিবৃত্ত নিয়ে

বড় একটা মাথাব্যথা নেই। জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে স্থান নির্বাচন। পর্যটকদের চাহিদা ঘিরে বাজার ছেয়ে রয়েছে অজস্র টুরিস্ট গাইড বই। তাদের বেশিরভাগেরই উপজীব্য বহুল প্রচারিত পর্যটনকেন্দ্রগুলি সম্পর্কে চর্বিতচর্বণ। তথ্যের নবীকরণের বিশেষ প্রয়াস নেই। শুধু যে নতুন জায়গার খবর দুষ্প্রাপ্য তাই নয়, অসম্পূর্ণ, ভ্রান্ত ও অপ্রাসঙ্গিক তথ্যের ছড়াছড়ি। আরও বিপজ্জনক, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে খুব কম বই-ই লেখা। 'বাংলায়ভ্রমণ' কিংবা স্বামী অপূর্বানন্দের লেখা 'কৈলাস-মানসতীর্থ' জাতীয় ভ্রমণ-সহায়ক বইগুলির সঙ্গে আজকের প্রকাশনাগুলির কোনও তুলনাই চলে না। ভ্রমণবিষয়ক পত্রিকাগুলোতে অখ্যাত স্থানের কিছু কিছু হদিশ থাকে বটে, তবে অধিকাংশ পর্যটকের পছন্দের দিকে দৃষ্টি রেখে প্রকাশিত হয় বলে প্রকৃত ভ্রমণকারীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়ে ওঠে না। ২০০১ সালে প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার 'পর্যটন' সংখ্যাটি নিঃসন্দেহে তথ্যবহুল, কিন্তু হাস্যকর তথ্যেরও সমাবেশ যথেষ্ট। সেখানে সম্ভাব্য পর্যটকদের অবগতির জন্য দার্জিলিং সম্পর্কে লেখা হয়েছে ঃ 'শিলিগুড়ি থেকে দুরত্ব ৮০ কি.মি., বাসে ৩৫ ঘন্টা, ট্রেনে ৭৫ ঘন্টা।' আবার কালিমপঙ প্রসঙ্গে, 'দুরত্ব ঃ শিলিগুড়ি ৬৯ কিমি. ২৫ ঘন্টা।' [১৭] এর পর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বিলাসিতার উপকরণের অভাব ও যোগাযোগের অব্যবস্থা সৌন্দর্যে মোড়া টুরিস্ট স্পটের আবেদনও ম্লান করে দেয়। যেখানে বিলাসদ্রব্যের আকাল, সেখানে পৌঁছবার দায় নেই পর্যটকের। মধ্যপ্রদেশের ভীমবেটকা, উড়িষ্যার ধবলেশ্বর কিংবা বিহারের ধলভূমগড়ের মতো ইতিহাস-ঘেরা জায়গায় হঠাৎ হাজির কোনও পর্যটকের নিশ্চিত মনে পড়বে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই বিলাপ ঃ 'ভ্যালি অব দি কিংস আজ পৃথিবীর টুরিস্টদের লীলাভূমি, পাবলিসিটি ও ঢাকপিটানোর অনুগ্রহে সেখানকার বড়বড় হোটেলগুলি মরশুমের সময় লোকে গিজগিজ করে --ভ্যালি অব দি কিংস অতীতকালের কুয়াশায় যত না অন্ধকার হইয়াছিল তার অপেক্ষাও অন্ধকার হইয়া যায় দামি সিগারেট ও চুরুটের ধোঁয়ায়--কিন্তু তার চেয়ে কোনও অংশে রহস্য ও স্বপ্রতিষ্ঠ মহিমায় কম নয় সুদূর অতীতের এই অনার্য নৃপতিদের সমাধিস্থল, ঘন অরণ্যভূমির ছায়ায় শৈলশ্রেণীর অন্তরালে যা চিরকাল আত্মগোপন করিয়া আছে ও থাকিবে। এদের সমাধিস্থলে আড়ম্বর নাই, পালিশ নাই, ঐশ্বর্য নাই, মিশরীয় ধনী ফ্যারাওদের কীর্তির মত।'[১৮]

রোমান্টিক পর্যটক এ ভাবেই আগ্রাসী 'কালেক্টিভ' এর কবলে পড়ে সংখ্যালঘু হয়ে পড়তে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, রোমান্টিক টুরিস্ট আজ এক অবাঞ্ছিত প্রজাতি। পর্যটন বিপণনের জগতে এরা ক্রেতা বা ভোক্তা কোনওটিই নয়। পর্যটনশিল্পের সঙ্গে তার সতত বিরোধ। প্রকৃতির সঙ্গে নির্জনে একান্ত ব্যক্তিগত আত্মিক যোগাযোগের পরিবেশে এসে দলে দলে ভিড় জমায় আমোদঅভিলাষী টুরিস্ট। শান্ত নিসর্গকে উপদ্রুত করে তুলতে না পারলে টুরিস্ট হিসাবে উপস্থিতি জানান দেওয়া যায় না। এ ধরনের কোলাহলমুখর পরিবেশ রোমান্টিক পর্যটকের কাছে শুধু নয়, প্রকৃতির জগতেও বিভীষিকা, কিন্তু 'মাস টুরিজমের' প্রাণবায়ু। ভারতবর্ষে গণ-পর্যটনের প্রতিপত্তি যখন দ্রুত বেড়ে চলেছে, তখন শঙ্কার প্রহর গুণছে রোমান্টিকেরা। নির্জন সমুদ্রসৈকত, ধ্যানমগ্ন পাহাড়অরণ্য, নির্মল পার্বত্য স্রোতস্বিনী তাদের প্রিয় বিচরণভূমি। সেখানে আমোদপ্রিয়, দলবদ্ধ জনতার সোচ্চার উপস্থিতির পরিণাম অনুমেয়। সে দুর্ভাবনা ভাষা পেয়েছে দীর্ঘদিন আগে, 'আরণ্যক' উপন্যাসে বিভূতিভূষণের কলমেঃ 'এই নির্জন শোভাময় বন্য প্রান্তর, অরণ্য, কুন্ডী, শৈলমালা জনপদে পরিণত হইবে, লোকের ভিড়ে ভয় পাইয়া বনলক্ষ্মীরা উধর্বশ্বাসে পলাইবেন—মানুয ঢুকিয়া এই মায়াকাননের মায়াও দুর করিবে, সৌন্দর্য্যও ঘুচাইয়া দিবে।' [১৯] 'চাঁদের পাহাড়' -এর শঙ্কর অচেনার আনন্দে পাড়ি জমায় সুদূর আফ্রিকার অরণ্যে। তার সেই রোমান্টিক আনন্দের শরিক পথের পাঁচালির অপুও।

আরণ্যক উপন্যাসে লবটুলিয়ার অরণ্য-প্রকৃতির বর্ণনায় সত্যচরণ বিহ্বলঃ 'গভীর রাত্রে ঘরের বাইরে একা আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি, অন্ধকার প্রান্তরের অথবা ছায়াহীন ধূ ধূ জ্যোৎস্না ভরা রাত্রির রূপ। তার সৌন্দর্য্যে পাগল হইতে হয়--একটুও বাড়াইয়া বলিতেছি না--আমার মনে হয় দুর্বলচিত্ত মানুয যাহারা, তাহাদের পক্ষে সে রূপ না দেখাই ভাল—সর্বনাশী রূপ সে—সকলের পক্ষে, তার টাল সামলানো বড় কঠিন।' এই টাল সামলাতে না পারা পর্যটকদের একজন--উইলসন। সমারসেট মম-এর লোটাস ইটার গল্পের নায়ক। ইতালি ভ্রমণ তার জীবনের স্রোতটিই আমূল বদলে দিল। নিসর্গ—সৌন্দর্যে মোহিত উইলসন লন্ডনে ব্যাঙ্কের সুখী চাকরি ছেড়ে, বৈষয়িক জীবনে ছেদ টেনে ফিরে গেল সেই প্রকৃতির কাছেই। বাকি জীবনটা জীবিকার পরোয়া না করে লোকসমাজের আড়ালেই কাটল তার। অবশেষে উইলসনের দেহ আবিষ্কৃত হল সেই টিলার মাথায় সেখান থেকে সারারাত হ্রদের জলে চাঁদের আলোয় মোহিনী রূপ দেখে সে আর সহ্য করতে পারেনি। সত্যজিৎ রায়ের 'আগন্তুক' ছবিতে মামাবাবু তাঁর ছোট্ট নাতিটির জন্য একটিই ছোট্ট বার্তা রেখে যান, 'কূপমণ্ডুক হোয়ো না।' মধ্যবিত্ত জীবনের সংকীর্ণ পরিসরে মামাবাবু এক অবাঞ্ছিত আগন্তুক। তাঁর ভবঘুরে জীবন ও উপলব্ধি সম্পর্কে সন্দেহের ভ্রূকুটিই একমাত্র বরাদ্দ মধ্যবিত্ত প্রতিক্রিয়া।

কোলাহল বারণ হলে পর্যটন বিস্বাদ। কার্নিভ্যালের পরিবেশ উপহার দিতে না পারলে পর্যটনকেন্দ্র জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে না। ফলত তার ব্যবসায়িক গুরুত্বও গড়ে ওঠে না। ভ্রমণসুখ আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য নানা নামে তার পরিচয় নেচার টুরিজম, অ্যাডভেঞ্চার টুরিজম, হেরিটেজ টুরিজম, ওয়াইল্ড লাইফ টুরিজম, ইকো টুরিজম—যে নামেই ডাকা হোক, এক একটি টুরিস্ট

স্পটের সমৃদ্ধি সর্বতোভাবেই নির্ভর করে সমষ্টিবদ্ধ পর্যটকের যাতায়াত ও পরিষেবাগত সন্তোষের ওপর। নিজেদের চারপাশে আরও অজস্রভ্রমণরসিক বহিরাগতকে ঘোরাফেরা করতে না দেখলে ভ্রমণমানসিকতা ব্যাহত হয়। জায়গাটির মাহাত্ম্য মান হয়ে যায়। নিজেকে এককজন কৃতবিদ্য পর্যটক ভেবে ওঠাও দুষ্কর হয়ে পড়ে। পর্যটকের ভিড়ই ভ্রমণের আধুনিক আবহ। জনসমাগম যথেষ্ট হলে পরিষেবাও সন্তোষজনক হয়ে ওঠে। পুরী, দীঘা কিংবা গোপালপুরের মতো জনপ্রিয় সমুদ্রতটে সফলসুখী জনতার ভিড় আরও মানুষকে হাতছানি দেয়। অব্যাহত সৈকতের শান্ত নির্জনতা যত মনোলোভাই হোক, বাঞ্ছিত আবহ উপহার দেবার অক্ষমতা এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠতে না পারার কারণেই উপেক্ষিত। তা ছাড়া, দ্রষ্টব্য স্থানে নিজেকে দ্রষ্টব্য হিসাবে উপস্থাপিত করে তোলার দায়ও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। রোমান্টিক পর্যটক তাই সবসময়ই চায় তার দ্রষ্টব্যস্থানটি টুরিস্ট স্পট হয়ে ওঠার আগেই ঘুরে আসতে। আজ থেকে বছর দশেক আগেও যে ব্যক্তি সিকিম বেড়াতে গিয়ে শান্ত ছোট্ট পেলিং গ্রামটি দেখেছেন, দ্বিতীয়বার সেখানে গিয়ে তিনি যৎপরোনাস্তি হতবাক। সেখানে দর্শনীয়ের তালিকায় সবার ওপরে, বলতে গেলে, রাতারাতি গজিয়ে ওঠা সার সার হোটেল। মজার ব্যাপার, গণ-পর্যটনের প্রভাবে রোমান্টিক পর্যটন হারিয়ে যেতে বসেছে, অথচ পর্যটন বিপণনে এক একটি স্থানের রোমান্টিক আবেদনেই লুকিয়ে থাকে বিজ্ঞাপনী ম্যাজিক। সমষ্টিগত পর্যটনকে কেউ কেউ বলেন leisured migration । সপরিবার বা সবান্ধব ছুটি কাটানোর জন্য অভ্যস্ত গণ্ডির বাইরে অলস অবসর বিনোদন। এরা পরিবেশবিচ্ছিন্ন, নিছক আমোদসন্ধানী। বাইরে দূরে ভিন্ন পরিবেশে অভিনব উপভোগের মধ্য দিয়ে সময়যাপনের প্রত্যাশা এই নিষ্ক্রিয় ভ্রমণবিলাসিতার অঙ্গ। লবটুলিয়ার জঙ্গলে কলকাতা থেকে বেড়াতে আসা মধ্যবিত্ত পরিবারের আচরণে স্তম্ভিত 'আরণ্যক' উপন্যাসের নায়ক সত্যচরণ। এই পর্যটকশ্রেণি যে দ্রুত বেড়ে চলেছে তা বিলক্ষণ ধরা পড়ে মধ্যপ্রদেশ পর্যটন উন্নয়ন সংস্থার একটি সাম্প্রেতিক বিজ্ঞাপনে। অরণ্যের মাঝখানে এক টিলতে ফাঁকা জায়গা। সেখানে শহুরে জীবনের নানা উপকরণ ছড়ানো। কাপডিশ, গেলাশ-বোতল থেকে শুরু করে ক্যাসেট প্লেয়ার, গিটার ইত্যাদি। মাঝখানে একদঙ্গল শহুরে, মাতাল পর্যটক। বেসামাল অবস্থায় তারা তারস্বরে চিৎকার করে চলেছে। আর ওদিকে জঙ্গলের উপদ্রুত, ভয়ার্ত জীবকুল প্রাণভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে দিগ্বিদিকে। ওপরে লেখা —জানোয়ারেরা জঙ্গলে থাকে না, শহর থেকে আসে। ছোট্ট শ্লোগানটি গোটা ছবিটির বার্তাবহ। এই পর্যটকরাই শিল্পের পাথেয়।

(ক্রমশ)

সূত্রনির্দেশ

১. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর — হিমালয় ভ্রমণ (হিমালয়, সম্পাঃ স্বপন রায়) বুকট্রাস্ট, কলকাতা, ২০০০, পৃঃ ১৭-১৮

২-৯. D. Kennedy, Hill Stations & The British Raj, Oxford University Press, New Delhi . ১৯৬থেকে গৃহীত

১০-১১. বিতর্কিকা পত্রিকা, মাঘ সংখ্যা, ১৪০৬, পৃ ১৩০-৩১ এবং পৃঃ ২১৯

১২. Bill Aitken, Exploring Indian Railways, OUP, New Delhi, 1997, p5

১৩. John Urry, The Tourist Gaze, Sage Publication, London, 2002, p21

১৪-১৬ Y. Apostolopoulos Stella, L.A. Yiannakis (ed.), The Sociology of Tourism, Routledge, London, 2000, p10.p-16 এবং p-40

১৭. পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা (পর্যটন সংখ্যা) ২৮ সেপ্টেম্বর-১৯ অক্টোবর, ২০০১, পৃ. ২০

১৮-১৯. বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৪০১, পৃ. ১২০-১২১ এবং পৃঃ ৮৭

উচ্চারণের হৃদয়

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত-সম্মানগ্রন্থ 'হৃদয়ের উচ্চারণ' হাতে নিয়েই ভাল লাগল। এমন চমৎকার নাম, নামেই আছে কিছু নিবেদন। আগেও এমন ধরনের গ্রন্থ বা কোনও কোনও পত্রিকার বিশেষসংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে বিশিষ্ট কোনও কোনও ব্যক্তির সম্মানে, তাঁরা থাকতেই। আর প্রকাশিত হয়েছে কারও কারও স্মরণে-সম্মানে, তাঁরা চলে যাওয়ার পর।

জীবৎকালেই রবীন্দ্রনাথকে সম্মান করা হয়েছে এমনই গ্রন্থ প্রকাশ করে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং সম্পাদনা করেছিলেন হরপ্রসাদ সম্মানগ্রন্থ। অধ্যাপক সুশোভন সরকারের ছাত্র ও গুণগ্রাহীরা প্রকাশ করেছিলেন তাঁর সম্মানগ্রন্থ। অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের সম্মানে প্রকাশিত হয়েছিল 'এসেজ্ প্রেজেন্টেড টু প্রফেসর ভবতোষ দত্ত'। গোপাল হালদারমহাশয়ের জীবৎকালেই তাঁর সম্মানে প্রকাশিত হয়েছিল 'পরিচয়' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা। একই ভাবে 'অনুষ্টুপ' পত্রিকা প্রকাশ করেছে শঙ্খ ঘোষ সম্মান সংখ্যা। অতি সম্প্রতিকালে সদ্য প্রয়াত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, শিবনারায়ণ রায়, অধ্যাপক অরুণ বসু প্রমুখের সম্মানে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়াও আছে আরও কিছু সম্মান গ্রন্থ।

আমাদের সৌভাগ্য মনীষী রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত দীর্ঘ আয়ু পেয়েছেন। সে আয়ুর কোনও মুহূর্তেই যে অপচিত হয়নি বোঝাই যায় গ্রন্থটি হাতে নিলে। অবশ্য কথাটি বোঝার জন্য কোনও গ্রন্থের প্রয়োজন হয় না। তাঁর ইংরাজি ও বাংলা লেখার সঙ্গে যারা পরিচিত, অনেকেই বহুকাল ধরেই পরিচিত, তাঁরা জানেন সে কথা। তাঁরা তাঁর পাণ্ডিত্যের বহুমুখিনতা ও গভীরতার খবর রাখেন এবং গভীর, গম্ভীর কথাও সহজ করে এবং কখনও মনোগ্রাহী করে বলার ক্ষমতার সঙ্গেও তাঁরা পরিচিত। গ্রন্থের ইংরাজি অংশের প্রথম লেখক হেমেন বড়ুয়া তাঁর 'ট্রিবিউটে' সম্ভবত এই কারণেই '...his remarkable capacity for expressing the tough and intricate ideas in an interestingly lucid manner'এর কথা লিখেছেন। তাঁর ভাবনার সীমাহীন বিস্তার এবং আশ্চর্য হৃদয়বত্তার সংবাদও জানা আছে অনেকেরই। আর যাঁরা তাঁর সান্নিধ্য পেয়ে তাঁর রসবোধ ও রসিক মনের পরিচয় পেয়েছেন তাঁরা তো অনেকেরই ঈর্ষার পাত্র।

গ্রন্থটিতে বাংলা লেখা আছে যোলোটি এবং ইংরাজি সাতটি। সব লেখার মন বা মান যে সমান তেমন কথা জোর দিয়ে বলা কঠিন। এ ধরনের গ্রন্থে এমন হতেই পারে। তবে কিছু লেখা খুবই উঁচু মানের। সব মিলিয়ে, সবাই মিলে যে-চেষ্টা করেছেন সেটাই আসল কথা। অধ্যাপক দাশগুপ্তকে বোঝার চেষ্টা এবং নিজের নিজের মতো করে বোঝার সেই কথাটা পাঠকের মনে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা। দেড়শো পৃষ্ঠার সীমানায় তেইশটি লেখাতে কি রবীন্দ্রকুমারের মতো মানুষকে ধরা যায়? যৌবনে অকসফোর্ডে মিলটনের কবিতার তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দশ বছরের কাজ দু'বছরে সেরে কীভাবে তিনি শত্রুর মুখে ছাই এবং তাঁর অধ্যাপক ও বন্ধুবান্ধবদের মুখে পুডিং-এর মিষ্টি দিয়ে (নাকি জোগাড় করে ফেলেছিলেন নলেন গুড়ের সন্দেশ?) ডিগ্রিটি অর্জন করেছিলেন সে কাহিনি আঁটাতেই তো দেড়শো পৃষ্ঠা লাগে। এবং অতি উচ্চপ্রশংসিত সে রচনা কেন তাঁর নিজের মনঃপুত হয়নি এবং কেন অদ্যাবধি অকসফোর্ডে বোদলেইয়ান পাঠাগারের বাইরে তার দর্শনও মোল না তা বিশ্লেষণ করতেও তো লাগে অন্তত আরও দেড়শোটি পাতা। তবে? এবং সে তো সলে শুরু। তার পর ঘটে গেছে কত কাণ্ড! হিল্লি-দিল্লি-কলকাতা-বিলেত, তাঁর স্পর্শ পাওয়া কত মানুষের মনে ও হৃদয়ে।

তবু, এ গ্রন্থেও আমাদের প্রাপ্তি কম নয়। অধ্যাপকের জীবনের নানা কাহিনি, উপকাহিনি রসালো গল্প যেমন পাই, তেমনই আভাসে হলেও, পাই তার পঠনপাঠনের খবর, তাঁর গবেষণার খবর, তাঁর ভাবনার খবর, তাঁর দর্শনের খবর এবং সর্বোপরি অসাধারণ এক মানুষের খবর। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলতেন 'সম্পূর্ণ মানুষের' কথা। পঠনপাঠন, লেখালেখি নানা ভাবনা ও আবেগ নিয়ে হৃদয়বান এক সুরসিক মানুষ রবীন্দ্রকুমারের জীবনচর্যা আমাদের সেই মানুষের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

এ গ্রন্থের লেখকরা সবাই যে রবীন্দ্রকুমারকে সমানভাবে জেনেছেন তা নয়। তাঁর সঙ্গে কারও ব্যক্তিগত সান্নিধ্য গভীর, কারও তিনি প্রিয় শিক্ষক, কেউ তাঁর লেখার অনুরাগী পাঠক কেউ তাঁর কর্মকাণ্ডকে অনুধাবন করেছেন গভীর অনুসন্ধিৎসায়। ফলে এঁদের প্রায় কেউই সম্পূর্ণ মানুষটিকে ধরতে প্রয়াসী হয়নি। কিন্তু নিজের নিজের মূলধন নিয়ে রবীন্দ্রকুমারকে বোঝার জন্য তাঁদের সৎ ও আন্তরিক প্রয়াস পাঠকের সামনে তাঁর যে পটটি মেলে ধরে তাতে মানুষটির অনেকখানিই যেন দেখতে পান পাঠক। এ সম্মানগ্রন্থের সার্থকতা ও আসল মূল্য তাতেই।

পাঁচজনে তাঁকে গবেষক বলে জানে। আর জানে বড় মাপের লেখক বলে, ইংরাজি, বাংলা দুই ভাষারই এবং শিক্ষক বলে। ১৯৫৩ সালে রবীন্দ্রকুমার অকসফোর্ড যান। সেখানে গবেষণা করেন 'Milton's theory of poetry' বিষয়ে। সে এক অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর ঘটনা। এ গ্রন্থে সেই কাহিনি স্মরণ করেছেন তপন রায়চৌধুরি। 'তখন অক্সফোর্ডে ইংরাজিতে ডক্টরেট করতে বছর চারেক লাগত। শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি ডিগ্রীপ্রার্থী ব্যর্থকাম হতেন।' ব্যপার আরও জটিল হল যখন ওঁর শিক্ষিকা বিখ্যাত হেলেন গার্ডনার বললেন-এ বিষয়ে থিসিস লিখতে হলে ইতালীয়, লাতিন ও হিব্রু ভাষায় জ্ঞান অপরিহার্য। 'সে জ্ঞান তবে অর্জন করে নেওয়া যাক'-এমনই মেজাজে কাজে লেগে গেলেন গবেষক, আক্ষরিক অর্থেই খেয়ে-না-খেয়ে এবং দিনে কাজের সময় দশ ঘন্টা থেকে চোদ্দ ঘন্টা করে নিয়ে। 'মুখের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে পান্ডুরাজার কাছাকাছি' পৌঁছল। কিন্তু হার মানলেন না বাঙালির ছেলে বিজয় সিংহের দেশের মানুষ। দু'বছরেই ডিগ্রি হাসিল করলেন। মজার কথা, সকলের ধন্য-ধন্য খুশির মধ্যে একজন শুধু খুঁতখুঁত করেই গেলেন, যেন কতই খুঁত রয়ে গেছে সে থিসিসে। তিনি রবীন্দ্রকুমার স্বয়ং। সে থিসিস তাই ছাপা হল না কোনও দিনই।

সুপ্রিয়া চৌধুরি সেটি দেখতে পেয়েছিলেন অকসফোর্ডে বোদলেইয়ান পাঠাগারেই এবং সে পাওয়ার সদ্ব্যবহারও করেছিলেন। এই গবেষণাপত্রটির মতোই হাল হয়েছে রবীন্দ্রকুমারের অসংখ্য লেখার। শ্রম, মেধা, তত্ত্বভাণ্ডার সব কিছু সাধ্যমতো ব্যবহার করে লেখা তাঁর বহু প্রবন্ধ পড়ে আছে অগ্রন্থিত। সে সব লেখা তেমন যোগ্য হয়েছে বলে মনে হয় না তাঁর। এটা তাঁর 'ইংরেজির পণ্ডিত সুলভ' স্নবারি নয়, নির্জলা মানবিক বিনয়। সুপ্রিয়া চৌধুরির তাঁকে মনে হয় 'least vain of man'.

সব দিক বিচারের পর সৌরীন ভট্টাচার্য তাঁর সুলিখিত নিবন্ধটিতে লিখছেন: 'ইংরেজি ধাঁচে বলতে গেলে যাকে complete scholar বলে' সেই পথে এগোবার ঝোঁকই তাঁর চারিত্রলক্ষণ। তাঁর মনের classic আদলটিই এ সবের মধ্যে ধরতে চেয়েছেন সৌরীন।

স্বপনকুমার মজুমদারের লেখাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'মধুসূদন-চর্চায় রবীন্দ্রকুমারের প্রতি বাঙালির কৃতজ্ঞতার প্রধান কারণ বিদেশে তাঁর কর্মকাণ্ডের বহুবিধ তথ্যের আবিষ্কার।' তবে এই 'কৃতজ্ঞতার আড়ালে' ঢাকা পড়ে যায় রবীন্দ্রকুমারের 'চিন্তাগর্ভ বিশ্লেষণ'—এই তাঁর আক্ষেপ। নানা বিষয়ে, বিশেষ করে তাঁর নিজস্ব চর্চাক্ষেত্র উনিশ শতকে বাঙালির কর্মকাণ্ড নিয়ে নানা বিশ্লেষণের মূল্যায়ণ করেছেন স্বপন।

বেশি কথা না বলেও সুকান্ত চৌধুরি তাঁর নিবন্ধের প্রথম বাক্যেই জানিয়ে দিয়েছেন সার কথাটি, 'professor Rabindra kumar Dasgupta is arguably the most influential living scholar of the humanities within the Bengali cultural ambience'। হেমেন বড়ুয়া আরও একটু এগিয়ে নির্দ্বিধায় লেখেন, 'Mr.R.K. Dasgupta, a distinguished scholar and thinker who represents the cream of Indian intellectual elite',

শুধু গবেষক নন, তিনি এক অনন্য শিক্ষক ও শিক্ষা সংগঠক। দিল্লিতে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজস্তরে বাংলা তথা ভারতবিদ্যাচর্চা ও তার প্রসারের জন্য তিনি যা করেছেন তা মনে রাখলেই তাঁর দ্বিতীয় ভূমিকাটি স্পষ্ট হবে। শিক্ষক হিসাবে নিজের মূল্যায়নে, বলা বাহুল্য তিনি তাঁর সহজাত বিনয়ে অবিচল। এমনকী এই সেদিনও স্টেটসম্যান পত্রিকায় লেখা চিঠিতে (৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪) তিনি একটি সরল বাক্যে ঘোষণা করে দেন 'But I was never a good teacher.'

কিন্তু যাঁরা তাঁকে অনুসরণ করেছেন, অনুধাবন করেছেন, তাঁরা তাঁর সঙ্গে একেবারেই একমত নন। সুকান্ত চৌধুরি তাঁর বর্ণনা করতে চান '...our universal loving Master-masai' বলে। কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের স্বভাববিনয়ের কথা তাঁরও অজানা নয়। তাই এই বাক্যটির পরেই তাঁকে ব্র্যাকেটে লিখতে হয় 'I Knew how his modest nature would cringe from the term "Acharya" কিন্তু রবীন্দ্রকুমারকে দ্বিধাহীন ভাবেই তিনি মনে করেন, "...a model of thinking and living |' তেমন শিক্ষককেই তো আমরা বলি আচার্য।

অলোক রায় গবেষণা করেন রবীন্দ্রকুমারের তত্ত্বাবধানে। আমরা জানি, গবেষক তাঁর 'গাইডের' ঘর, শিক্ষালয়, বাড়ি চক্র দিতে দিতে ক্লান্ত, বিধবস্ত হয়ে পড়বেন, কিন্তু তাঁকে খুঁজে পাবেন না, এইটাই নিয়ম। রবীন্দ্রকুমারের ধরনটা ঠিক উলটো। কাছে থাকার সময় তো বটেই, দূরে চলে যেতে হলেও তিনি সচেতন-স্মরণে রাখেন ছাত্রকে। নানাভাবে সাহায্যে করেন। তবে তিনি চান ছাত্রও পরিশ্রম করুক। অলোক লিখেছেন, 'গবেষণাকর্ম নিয়ে তিনি যে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে তা সেই সময়ে জেনেছি। নিখুঁত কাজ চান তিনি। 'তিনি যে কত খুঁতখুঁতে তা মিলটনও জানেন।

ছাত্রছাত্রীদের শুধু পড়াশোনা-গবেষণায় সাহায্য করাই নয়। প্রকৃত 'আদর্শ মাস্টারমশাই'-এর মতোই তিনি তাদের প্রয়োজনে, তাদের অভাবে ও সংকটে বাড়িয়ে দেন বন্ধুর হাত—সেই কথাই লিখেছেন জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়। ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধা-অভাব-অভিযোগ—'কেন? অধ্যাপক দাশগুপ্ত আছেন না? ... যেমন অজস্র আমাদের চাহিদা, তেমনি অফুরন্ত তাঁর সস্নেহ প্রশ্রয়।' আবার একেবারে অন্য ধরনের প্রশ্রয়ের কথা জানিয়েছেন তাঁর অমনোযোগী ছাত্র অমলেন্দু দাশগুপ্ত। ছাত্র-শিক্ষকে বন্ধুত্ব অনেক পরে, দিল্লিতে, বাঙালি আড্ডায়। 'এই আড্ডার মাধ্যমে আমিও ওঁর অনেক কাছে আসার সুযোগ পেলাম। শিক্ষক-ছাত্রের বিধিবদ্ধ ব্যবধান দূর হয়ে ওঁর স্নেহ এবং আমার শ্রদ্ধা একটা সহজ নৈকট্যে মিলে গেল।'

এমন কথা আরও অনেকে লিখেছেন। কোনও ধরনের আত্মাভিমান কোনও দিন তাঁকে দূরে আটকে রাখতে পারেনি, তাঁরে হৃদয়কে অর্গলবদ্ধ করতে পারেনি। হয়ত সেই জন্যই সুব্রত দাশগুপ্ত লিখেছেন, রবীন্দ্রকুমার 'wears his learning lightly.' শঙ্খ ঘোষ তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে লিখেছেন তাঁর উপলব্ধির কথা, '... তাঁর তুলনায় তুচ্ছতম মানুষকেও তিনি বুঝতে দেন না তার কোনো তুচ্ছতা।' বুঝতে দেন না খুব সচেতন সতর্কতায়। শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন, তাঁর মনে হয় 'আমাদের অহংবোধ আমাদের হৃদয়ের শুষ্কতার একমাত্র কারণ। আমরা হৃদয়হীন কারণ আমরা আত্মভিমানী'।

এ গ্রন্থে দু'জন লেখক রবীন্দ্রকুমারকে দেখেছেন একেবারে ভিন্ন দুই ভূমিকায়। অরুণ ঘোষ লিখেছেন জাতীয় গ্রন্থাগারে খুব স্বল্পকালের হলেও তাঁর বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা। অল্প কথায় তিনি রবীন্দ্রকুমার সম্পর্কে তাঁর অনুভবের কথা বলেছেন খুব শ্রদ্ধা নিয়ে, সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে। রবীন্দ্রকুমারের মধ্যে তিনিও দেখেছেন এক সহজ-সরল-বিনয়ী মানুষকে যিনি এই গ্রন্থাগারের উন্নয়নে তাঁর অগ্রজ কেশবনের কথা স্মরণ করেন অকৃত্রিম প্রশংসায় এবং 'সামান্য' করেই দেখেন নিজের ভূমিকা।

আর একজন 'চতুরঙ্গ' সম্পাদক আবদুর রাউফ তাঁর কাছ থেকে আমরা জেনেছি সম্পাদক রবীন্দ্রকুমারের কথা। জাতীয় গ্রন্থাগারের পর্যায় শেষে কিছু দিন তিনি চতুরঙ্গ সম্পাদনা করেন। কী অসম্ভব পরিশ্রম করতে পারতেন তিনি, কী সংঘাতিক খুঁতখুঁতানি ছিল পত্রিকাকে নিখুঁত করে তোলার জন্য। লেখকদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, লেখক পাঠকের প্রতিটি চিঠি পড়া ও উত্তর দেওয়া, নতুন লেখকদের উৎসাহদান, এমনকী যাঁর লেখা ছাপা গেল না তাঁর ক্ষেত্রেও কার্পণ্যহীন যত্ন ছিল তাঁর। কিন্তু লেখা বাছাইয়ের ব্যাপারে তিনি ছিলেন শুধুই গুণমানে আগ্রহী, অন্য কিছুতেই নন। স্বভাবের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য কখনও সখনও অসুবিধায়ও পড়তে হত তাঁকে। তাঁর সঙ্গে কাজ করে অনেক কিছু শিখেছেন রাউফ, একথা তিনি শুধু কুণ্ঠাহীনভাবে নয়, গর্বের সঙ্গেই লিখেছেন। রবীন্দ্রকুমারের সময়েই এবং তাঁর সাহসেই 'চতুরঙ্গ' ত্রৈমাসিক থেকে মাসিক হয়ে ওঠে। রাউফই জানান তাঁর সম্পাদনায় কিছু মূল্যবান ও ঐতিহাসিক স্মারকগ্রন্থ, প্রকাশের কথা। তারই একটি (দিল্লিতে থাকতে) 'গ্যয়টে অন ইন্ডিয়ান লিটারেচার' (১৯৬৫), আর একটি গিলবার্ট মারে-র জন্মশতবর্ষ সুভেনির। ১৯৬৫ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইয়েটসের জন্মশতবর্ষ ও রবীন্দ্রনাথের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'Rabindranath Tagore and William Butler Yeats : the story of literary friendship' তাঁর সম্পাদনাতেই প্রকাশিত হয় বন্দেমাতরম সঙ্গীত ও মাইকেলকে নিয়ে দু'টি স্মরণিকা (১৯৬৭)।

তাঁর প্রতি নিছক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বা তাঁর সঙ্গ স্মরণ নয়, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাটিতে আমরা পাই সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর ভাবনার কথা। অল্প কথায় কিন্তু খুব গভীরে গিয়ে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন রবীন্দ্রকুমারের

দর্শনচিন্তা। 'কোনো একটি গভীর তত্ত্বকে একটি ছোটো বাক্যের মধ্যে সূত্রাকারে বলার ক্ষমতা গভীর মনীষার উজ্জ্বল স্বাক্ষর'। রবীন্দ্রনাথ ও নেহরুর সঙ্গে গান্ধীর ধর্ম-দর্শন ভাবনার বিষমতা নিয়ে রবীন্দ্রকুমারের বিশ্লেষণ চমৎকারভাবে উপস্থিত করেন হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রকুমারের যে উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করেন তার একটি অংশ এই রকম ঃ গান্ধীর কথাটি যেন, 'Simple and profound expression of piety. It has the power of a Hebrew psalm and for once at least Gandhi seemed to be more poetical than Tagore' তাঁদের বিতর্ক ছিল বিহার-ভূমিকম্প নিয়ে। গান্ধীজি বলেছিলেন, এ বিপর্যয় ভারতের অস্পৃশ্যতা আচরণের পাপের ফল। রবীন্দ্রনাথ, নেহরু অস্পৃশ্যতার প্রতি একটুও নরম না হয়েও গান্ধীজির এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে unreason-এর প্রকাশ দেখতে পেয়েছিলেন।

ধর্ম নিয়ে কী ভাবেন রবীন্দ্রকুমার? তিনি হিন্দু। তা নিয়ে তাঁর মনে লেশমাত্র লজ্জা নেই। কিন্তু তিনি ধর্মের নামে আচারসর্বস্বতার বিরোধী। ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করে ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টার ঘোর বিরোধী। তাঁর হিন্দুত্ব এক উদার হিন্দুত্বের দর্শন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং বিবেকানন্দ যে হিন্দুত্বের কথা বলতেন, তাই তাঁর বিশ্বাস। সুনন্দ সান্যাল লিখেছেন, "Dr. Dasgupta admires Islam, he admires Hinduism and other religions no less ... he is a true believer in Ramkrishna Paramahansa's view that there are as many paths to god as there are religious faiths. He firmly rejects the BJP, more particularly the RSS point of view of Hinduism.' এই মত তিনি গুজরাতের নির্মম ঘটনাবলি প্রসঙ্গে স্টেটসম্যানের পাতায় ও অন্যত্র বারবার ব্যক্ত করেছেন। তার জন্য গৈরিক হুমকিও শুনতে হয়েছে তাঁকে। সৌরীন ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রকুমারের ভাবনাকে বৃহত্তর এক বৃত্তে বুঝতে চান। '...বয়সের ঔচিত্যের বিবেচনায় বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত না হয়েও তিনি রীতিমতো লড়াকু মেজাজে বিবেকানন্দের ভূমি থেকে হিন্দুত্বের রাজনীতির মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছেন বারবার।' সম্ভবত এই 'হিন্দু' দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রকে হিন্দুবৃত্তের মধ্যে রেখে বিচার করাতে তাঁর আক্ষেপ স্পষ্ট। হয়ত সেই থেকে এবং বাংলা সাহিত্যের এক শূন্যতা দূর করতেই তিনি শুরু করেছিলেন বঙ্কিমজীবনী রচনার কাজ। আমাদের দুর্ভাগ্য 'কথাসাহিত্যে' তার ১৫টি পরিচ্ছেদ প্রাকশিত হওয়ার পর সে কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

তাঁর এই ভূমিকায় তাঁর বড় সহায় শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ এবং অবশ্যই গান্ধীজি। কিন্তু এখানেই তো শুরু ও শেষ নয়, ভারতের বাইরেও আছে ভারত, আছে বিপদ, আছে সন্ত্রাস আর হিংস্রতা। 'পারমাণবিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত পৃথিবী, সন্ত্রাস ও সে সন্ত্রাস দমনে ঘোষিত সন্ত্রাসে ত্রস্ত পৃথিবীর জন্য রবীন্দ্রকুমার ব্যাকুলভাবে শুশ্রূষা খোঁজেন। বারবার তাঁকে তাই গান্ধীর দিকে ফিরে তাকাতে হয়।'

তারপর পথ তো অনিবার্যভাবেই ঘুরে যায় প্রান্তিচানিক ধর্মের পথ থেকে বৃহত্তর ধর্মের দিকে, মানবধর্মের দিকে। শঙ্খ ঘোষ দেখতে পেয়েছেন, 'রামমোহন, বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্র, যাঁর প্রসঙ্গেই তিনি কথা বলুন না কেন, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত বারেবারেই ফিরে যাবেন সেই সমাজকল্যাণের প্রশ্নে, যে সমাজকল্যাণ মানুষকে শেষ পর্যন্ত এক আন্তর্জাতিক মানববোধে পৌঁছে দেয়, পৌঁছে দেয় মানবধর্মে।'

এখন, অসংখ্য গ্রন্থ সংগ্রহের পর, হাজার হাজার পাতা পড়ে ফেলার পর, অনেক লেখার পর পণ্ডিত রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তর মনে হয়, মানুষ তার মন আর হৃদয় নিয়ে যেন কোটি কোটি অক্ষরের তলায় চাপা পড়ে যাচ্ছে। কেন তাঁর মনে হয় এমন কথা? শঙ্খ ঘোষ যেন এই প্রসঙ্গেই বুঝতে চান তাঁর 'উপলব্ধির জগৎটা কোথায়, আত্মবোধটা কোথায়? ... The Rock থেকে এলিয়টের প্রসিদ্ধ কথাগুলি প্রায়ই উচ্চারণ করেন তিনি ঃ 'where is the wisdom we have lost in knowledge? / Where is the knowledge we have lost in information?'

এই প্রসঙ্গেই সর্বানন্দ চৌধুরি আমাদের মনে করিয়ে দেন রবীন্দ্রকুমারের শিক্ষক কে.সি.মুখার্জির কথা যাঁর কাছে তিনি অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্ পড়েছিলেন। একবার তিনি হোমার থেকে পুরো দু'পাতা গড়গড় করে স্মরণ করলে বিস্মিত রবীন্দ্রকুমার জানতে চান, কেমন করে তিনি এত মনে রাখতে পারেন। শিক্ষক খুব সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিলেন। 'Young man, you read all kinds of rubbish, I read only Homer।' রবীন্দ্রকুমারের মনে হয় তাঁর ঠাকুরমার কথা। তাঁর ছিল মাত্র তিনখানা বই, রামায়ণ, মহাভারত এবং মনসামঙ্গল প্রতিদিন নিয়ম করে পড়তেন তিনি। 'ঠাকুমার আঁচল ধরিয়াই সমস্ত বাল্যকাল কাটাইয়াছি।' 'আমাকে বাংলা শিখাইতেন আমার পিতমহী।' এইসব লাইন পড়তে পড়তে শঙ্খ ঘোষের মনে হয়, 'শুধু জীবনেরই কেন্দ্রে নয়, ঠাকুমা কি এইভাবে তাঁর জীবনবোধেরও একটা প্রতীক হয়ে ওঠেন।'

রবীন্দ্রকুমারের জীবনবোধে হৃদয়ের স্থান বোধ করি সর্বাগ্রে। যত দিন যায় তাঁর ততই মনে হয় হৃদয় হারিয়ে যাচ্ছে, হৃদয় হেরে যাচ্ছে। 'বাঙালি আজ তার হৃদয় হারাইয়াছে।' তিনি আর্তনাদ করেন না, কিন্তু তাঁর classic মনের নিম্নকণ্ঠ উচ্চারণ 'এই heart কোথায় পাইব?'

আমাদের বুকে যেন আর্তনাদের মতোই বাজে। রবীন্দ্রকুমার শুধু হৃদয়ের সন্ধানী নন, নিজেও যেন এক কোমল-কঠিন, হৃদয়ের মানুষ। হৃদয়কে কঠিন করে বেঁধে তিনি সমস্ত জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সংগ্রহ তাঁর বইপত্র দান করে দিচ্ছেন। কোনও মায়া তাঁর হাত চেপে ধরে না, ধরতে পারে না। কিন্তু একটি বই দিতে গিয়ে তিনি শিশু হয়ে যান। সর্বানন্দ চৌধুরি লিখছেন, 'সুধীরকুমার দাশগুপ্তর "কাব্যালোক" বইটা যেদিন, জনৈক স্নেহভাজনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন সেদিন দিতে গিয়ে অঝোরে কেঁদেছিলেন।' ১৩৫৩ সালে "সুধীরদাদা" ভাই রবীন্দ্রকুমারকে নিজের লেখা এই বইটি উপহার দিয়েছিলেন। সর্বানন্দের বর্ণনায় আমরা যেন আবেগপ্রবণ নরম হৃদয় এক বাঙালি ছোটভাইকে দেখতে পাই। মায়ায় জড়ানো, মমতা মাখানো, ভালবাসার ভিখারি এক স্মৃতিবিহ্বল বাঙালি। বাঙালি হওয়ার মধ্যে রবীন্দ্রকুমারের কোনও লজ্জা তো নেইই বরং যেন গৌরববোধ আছে। তাঁর মনে হয়, মধুসূদন যে বাঙালিকে খ্রিস্টান হতে বলেছিলেন তা খিস্টান হওয়ার জন্য নয়, আরও ভাল বাঙালি হওয়ার জন্য। তাকে জানতে গিয়ে সৌরীন ভট্টাচার্যের মনে হয়েছে, 'যত বিচিত্র প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন তার মধ্যে প্রায় একটা স্থায়ী সুরের মতো রয়েছে বঙ্গভাবনা। তিনি নিরন্তর খুঁজে চলেছেন বাঙালির মন। বাঙালির অন্তর্জীবন; ...তার ভাব জগতে পৌঁছতে চান তিনি।' এ কাজে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র-মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর সহায় জীবনানন্দ তাঁর আনন্দ। কারণ, শঙ্খ ঘোষ তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃত করেছেন : 'বাঙালির প্রাণ বলিতে কেবল বাঙালির চক্ষ লতা বা স্ফূর্তি বুঝি না। প্রাণ বলিতে বুঝি হৃদয় এবং হৃদয়ের অনুভব।' জীবনানন্দে বাঙালি হৃদয়ের এই অনুভব যেভাবে পাই তা আর কোথাও আছে।

এই অনুভব আর আবেগেই রবীন্দ্রকুমার বাংলার কথা, তাঁর দেশের কথা বলেন। শঙ্খ ঘোষের ভাষায়, 'বরিশাল-না, কেবল বরিশাল নয়, একেবারে মাহিলাড়া নামে তাঁর গ্রামখানি-কেবলই রূপ পেতে থাকে তাঁর কথায়।' এই বাঙালিত্বে কোনও সংকীর্ণতা নেই। বরং আছে এক উদার হৃদয়ের পরিচয়, আছে এক সার্বিক কল্যাণভাবনা যা পৌঁছে দেয় আন্তর্জাতিক মানববোধে। সেখানে পৌঁছবার পথটি পেতে দেয় হৃদয়। আর, তিনি লিখেছেন, 'মানুষের আসল বিত্ত তাহার হৃদয়ের বস্তু।' 'শুধু বুদ্ধ দেবের করুণাকে নয়, মনুষ্যত্বের ইতিহাস হিসাবে বিদ্যাসাগরের করুণার মূর্তিকে তাই পুরাণ বলে গ্রহণ করতে চেয়েছেন তিনি, আর ভেবেছেন ঃ "এই পবিত্র পুরাণখানি সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে"। এই কথাগুলি লিখে শঙ্খ ঘোষ মন্তব্য করেন, 'তাঁর ঠাকুমাও তাঁর সেই পুরাণ।'

আমরা যেন দেখতে পাই বিশ্বমানবতাকে, ভারতীয় মানসকে বাঙালির হৃদয়বত্তাকে প্রণাম জানাতে রবীন্দ্রকুমার বরিশাল জেলার সেই গ্রাম মাহিলাড়া আর তাঁর ঠাকুমার চরণে মাথানত করছেন। আমরা রবীন্দ্রনাথের গোরাকে দেখতে পাই। 'গোরা কহিল, 'মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।"

পুনশ্চ ঃ "হৃদয়ের উচ্চারণ" গ্রন্থখানি উল্লিখিত লেখকগণ ছাড়াও আরও অনেকের লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সুশীল মুখোপাধ্যায়, স্বামী প্রভানন্দ, অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, অমিয় চৌধুরি, মানস ঘোষ, বিনোদ সেনা, কল্যাণ চ্যাটার্জি প্রমুখ।

গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন অমলকুমার মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থশেষে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের জীবনপঞ্জি, গ্রন্থপঞ্জি (সম্ভব হলে লেখার তালিকা) এবং লেখক পরিচিতি থাকলে ভাল হত। বিশেষ করে ভবিষ্যতে যাঁরা তাঁকে নিয়ে কাজ করবেন (আমি নিশ্চিত, করবেন), তাঁদের কাজে এটি মূল্যবান সূত্রের কাজ করত। হয়ত সুযোগ-সময়ের অভাব একাজে বাধা হয়েছে।

এ জাতীয় গ্রন্থের 'বাজার' তেমন তেজি নয় জেনেও দে'জ পাবলিশিং অতি মূল্যবান এই গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে বাংলা ভাষার রসিক পাঠকের সাধুবাদার্হ হয়েছেন।

হৃদয়ের উচ্চারণ—সম্পাঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায়/দে'জ, কলকাতা-৭৩/ ১৫০.০০

শৈলী ঃ চিন্তাচর্চা

সৌমেন সেন

বাংলায় সাহিত্য শিল্প নাটক থিয়েটার চলচ্চিত্র ইত্যাদির শৈলীবিচার খুব কম হয়নি। বিশেষজ্ঞরা লিখেছেন বই, রচনা করেছেন প্রবন্ধ। কিন্তু একসঙ্গে শৈলীতত্ত্ব, কবিতা, কথাসাহিত্য, লোকসাহিত্য, নাটক, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞাপন, সাংবাদিকতার শৈলী চিন্তাচর্চার সাতান্নটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধের সংকলন বোধ হয় এই প্রথম। বিপ্লব চক্রবর্তী সম্পাদিত ছ'শোপঞ্চাশ পৃষ্ঠার মেগাসংকলন 'শৈলী ঃ চিন্তাচর্চা' তাই সংস্কৃতি-আগ্রহী পাঠকদের কাছে এক অত্যন্ত মূল্যবান প্রাপ্তি।

সংকলনের প্রথম বিভাগটি তত্ত্বভাবনার। এই বিভাগের ন'টি রচনা শৈলীতত্ত্বের নানা মীমাংসার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেয়। এতে যেমন আছে প্রাচ্য রীতিবাদ ও প্রতীচ্যের শৈলীবিজ্ঞানের তুলামূলক আলোচনা (বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য), তেমনই রয়েছে আধুনিক শৈলীবিজ্ঞান ও শৈলীতত্ত্বের ব্যাখ্যা (উদয়কুমার চক্রবর্তী), শৈলী বিজ্ঞানের গোড়ার কথা (পবিত্র সরকার) বা রীতির সন্ধানে (অরুণ ঘোষ)। তার পাশাপাশি আছে রবীন্দ্রকবিতার ছন্দশৈলী আলোচনা (রামবরাল তেওয়ারী), অংলকার শাস্ত্র ও আধুনিক বাংলা কবিতা (গুণময় মান্না), বাংলা কবিতায় লোকাভরণের আলোচনা (বিপ্লব চক্রবর্তী) এবং উপন্যাসপাঠ ও স্বরান্তরের সংবাদ (বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় ও তপোধীর ভট্টাচার্য)।

এই ন'টি প্রবন্ধ পড়ে শৈলীচর্চার কয়েকটি সাধারণ সূত্র আমরা জানতে পারি, যা সম্ভবত অন্যান্য বিভাগের প্রবন্ধগুলি বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য আমাদের জানাচ্ছেন যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'লেখকের ব্যক্তিগত বিশিষ্টতাই তাঁকে বিভিন্ন ধরনের শব্দ ও শৈলী ব্যবহারে অনুপ্রেরণা দেয়—এটাই শৈলীবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব। সংক্ষেপে বলা চলে ব্যক্তিভেদে লেখকের শব্দপ্রয়োগ বা বাক্য গঠনে যে স্বাতন্ত্র্য আসে শৈলীবিজ্ঞান সেটাই দেখিয়ে দেয়।' এই সূত্রে যে স্বাতন্ত্র্যের সংবাদ আমরা পাই তাই-ই হয়ত একজন লেখকের স্বেচ্ছা-নির্বাচিত প্রস্থান। পবিত্র সরকারের লেখায় শৈলীর ত্রি-তত্ত্ব হিসাবে আমরা যা পাই তাই একজন লেখকের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে। এই ত্রি-তত্ত্বের ভিত্তিতে স্টাইল (শৈলী) হল—১. একটি আদর্শ থেকে বিচ্যুতি; ২. একই ধরনের বিন্যাসের পুনরাবৃত্তি বা সমাহার; এবং ৩. ব্যাকরণের সম্ভাবনার বিশেষ নিষ্কাশন। এবং পবিত্র আরও বলছেন যে 'এ সবের মূলেই কিন্তু আছে, নির্বাচন বা choice।' অর্থাৎ লেখকের নির্বাচনই তাঁর রচনার শৈলী গড়ে দেয়। তাঁর স্বাতন্ত্র্য অনেকটাই চিহ্নিত হয় কোনও একটি আদর্শ (ধাঁচা?) থেকে বিচ্যুতির নিরিখে। উদয়কুমার চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্য থেকে কিছু উদাহরণ দিয়ে এই বিচ্যুতিবাদ ব্যাখ্যা করেছেনঃ 'বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের কাব্যগুলি বাঁধাধরা পথে চলেছে। কথার সঙ্গে সুর মিশে ছিল। মধুসূদন প্রথম কথাকে আলাদা করে নিলেন। আর বাঁধাধরা পথ থেকে সরে এলেন। তাঁর কাব্যে তাই পাওয়া গেল "বিচ্যুতি"।' এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই বিচ্যুতি অনেকটাই নির্ভর করে লেখকের ভাষাগত উপায়ের সজ্ঞান নির্বাচনের ওপর। ভাষা-উপায়ের এই নির্বাচনের বিষয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষাশৈলীর উল্লেখ করেছেন অরুণ ঘোষ। ব্যবহার করেছেন হাসান আজিজুল হক-এর একটি রচনার কিছু পংক্তি -'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেলায় চোখে পড়ার মতো একটি ঘটনা ঘটেছে। ভাষা সর্বসাধারণের সম্পর্ক বলেই ভাষা যেন মানিকের প্রতিপক্ষ। তাঁর কাছে ভাষা একটা চ্যালেঞ্জের মতো...প্রথায়, অভ্যাসে, সংস্কারে বহুকাল থেকে নির্ধারিত হয়ে যাওয়া শব্দের অর্থ, বাক্যদ্বন্দ্বের পরিচিত ক্ষয়পাওয়া চেহারা লেখাকে অনুচ্ছল ম্যাড়মেড়ে গতানুগতিক করে তুলতে চায়, মানিক প্রাণপণে তার বিরোধিতা করেন, লেখার কাজে নিজের ভাষাকে করে তুলতে চান তাঁর নিজের উৎকট স্বাতন্ত্র্যের বাহন।' হকের এই উক্তির নির্ভরে অরুণ ঘোষ বলেন, 'কোনো বিশেষ আঙ্গিক রীতি, শব্দসজ্জা (বিশেষণের ব্যবহার ইত্যাদি) যখন একটি বিশেষ সময়ের বা কালের একাধিক লেখক দ্বারা অনুশীলিত হয় তখনই তা ধারায় পরিণত হয় এবং সেই ধারার বিকল্প অনুসন্ধানের পথই বিচ্যুতি।' এই বিচ্যুতি বা স্টাইল, ভাষা-উপায়ের স্বাতন্ত্র্য, কিন্তু অনেকটাই নির্ভর করে একজন

লেখকের বিশিষ্ট লেখকসত্তার ওপর। সেই সত্তাই সম্ভবত লেখককে প্রতি মুহূর্তে তাড়না করে তাঁর স্বাতন্ত্র্য-নির্মাণে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষাশৈলীর প্রসঙ্গ যখন এসেছে তখন তো এই কথাও বলতে হয় যে তাঁর স্টাইল শুধু ভাষাতেই প্রকাশ পায় না, প্রকাশ পায় তাঁর একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববীক্ষাতেও। শুধু মানিক কেন, সব ধারা-বিপ্লব কারণ যে লেখকরা তাঁরাও স্বতন্ত্র হন এই বীক্ষাতেই, যা তাঁদের বাধ্য করে ভাষা-উপায়ের একটি সজ্ঞান নির্বাচনে।

এই রকম নির্বাচন যে শুধু লেখকপক্ষেই ঘটছে, তা কিন্তু নয়, পাঠকরাও আজকাল নির্বাচনের অঙ্গনে ঢুকে পড়ছেন। যে-লেখকসত্তা নতুন বীক্ষার শৈলী নির্বাচন করছেন, সেই লেখকসত্তার সন্ধানে। এই জরুরি সংবাদটি আমাদের শুনিয়েছেন তপোধীর ভট্টাচার্য ঃ 'কাহিনীতে ইদানীং নিছক কাহিনী পেয়ে তৃপ্ত হচ্ছেন না সাম্প্রতিক পাঠক। গল্পের বিন্যাসে তিনি দেখতে চাইছেন তাৎপর্যের নব্যগ্রহণ। আর, বুঝতে চাইছেন, কীভাবে শৈলীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপস্থাপনায় যুগপৎ এই তাৎপর্য এবং কাহিনীর আকরণ বা আকরণোত্তর উপস্থিতি ব্যক্ত হচ্ছে।' কাহিনি থেকে আখ্যানের এই রূপান্তর ও স্বরান্তর তিনি ব্যাখ্যা করেছেন সাম্প্রতিক কয়েকজন আখ্যানকারের কথনবিশ্বের আলোচনায়। এই স্বরান্তর প্রক্রিয়ার সঙ্গেই ঘটে চলে শৈলীর পুনর্বিন্যাস। বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্ব বা ফুকোর বয়ানতত্ত্ব ইত্যাদির নির্ভরে এমন একটি পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও পরিবেশের কথা বলেছেন বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ও।

পরবর্তী বিভাগগুলিতে আছে বাংলাসাহিত্য নাটক লোকসাহিত্য ইত্যাদির শৈলীবিচার। প্রথম বিভাগে আমরা যে তত্ত্বসূত্র পেলাম, সেই সূত্রগুলির ভিত্তিতেই যে সব আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে তা হয়ত নয়, তবে পাঠকপক্ষে প্রাপ্তি এই যে কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক বা নাট্যকারের বিশিষ্ট শৈলী সম্পর্কে ধারণা করা যায়। একজন লেখককে, তিনি কবি বা কথাশিল্পী বা নাট্যকার যাই হোন, তাঁকে আমরা তো আবিষ্কার করি তাঁর স্বাতন্ত্র্যে, ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্যুতিতে। সেই স্বাতন্ত্র্য আমাদের চিনিয়ে দেন আলোচকরা। যা আমরা অনুভব করছি কিন্তু অনুভবের কারণটা ঠিক ঠাহর করতে পারছি না, তখন সূত্রগুলি ধরিয়ে দেন তাঁরা। যেমন, 'বিশেষণের প্রয়োগে জীবনানন্দ এমন এক বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করেন যা বিশেষণের স্থানান্তর ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে বিশেষণকে অন্যত্র সংস্থাপিত করে,'-এই ধরনের উক্তি (ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, 'কবিতার শৈলী এবং কবিপক্ষ ক') আমাকে হঠাৎ-ই হয়ত সচেতন করে দেয়, মনে হয় তাই তো, ব্যাপারটা তো তেমন খেয়াল করিনি। এবং এই উক্তি জীবনানন্দের বীক্ষা উপলব্ধি করতে আমাকে সাহায্য করে বইকি। 'এখানেই আসে শৈলী বা রীতিবিজ্ঞানের কথা। একটি কবিতা পড়া, বোঝা, অনুভব করার সোপানপথে আসে সেই কবিতার আঙ্গিকবিচার। আসে রূপগত বিশ্লেষণ। পাঠকের মুগ্ধতার সঙ্গে সমালোচকের বিচারশক্তির যুগলবন্দীতে কবিতার আস্বাদ ও মূল্যমান যোগ্য মাত্রা পায়।' (তরুণ মুখোপাধ্যায়, 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের "মুখ" কবিতার দেহদর্শন'।)

এই সংকলনের বেশির ভাগ প্রবন্ধই এই 'যোগ্যমাত্রা' পৌঁছে দেয় পাঠকের কাছে। আমরা তাই সম্পাদকের প্রতি কৃতজ্ঞ। যাঁদের কাব্যকৃতি, কথাশিল্প বা নাট্যকাহিনি প্রবন্ধকাররা আলোচনা করেছেন, তাঁদের স্বাতন্ত্র্য আমরা লক্ষ করতে পারি এই সব প্রবন্ধের সাহায্যে। তত্ত্বভাবনার বিভাগটি বাদ দিলে অন্য আরও ছ'টি বিভাগে আছে আটচল্লিশটি প্রবন্ধ। এগুলির সব ক'টিই যে সুলিখিত এবং লিখেছেন স্বনামখ্যাত লেখকরা এই সংবাদ দেওয়া ছাড়া প্রতিটি প্রবন্ধের আলোচনা এই পরিসরে সম্ভব নয়। তবে একটা সমস্যার কথা বলতেই হয়। যে 'যোগ্যমাত্রা'র উল্লেখ করা হয়েছে, সংকলনের কিছু লেখা স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হিসাবে সুখপাঠ্য হলেও শৈলী চিন্তাচর্চায় সেই যোগ্যমাত্রা দেয় কি না তা বোঝা যায় না। আমার মনে হয়েছে যে সম্পাদকের আর একটু সতর্ক থাকা উচিত ছিল। প্রয়োজন ছিল ভাবার যে প্রবন্ধগুলি অন্যথায় সুলিখিত হলেও, মূল্যবান হলেও, এই সংকলনের পক্ষে উপযুক্ত কি না।

আরও একটা সমস্যা আমাকে ভাবিয়েছে। বেশ কয়েকটি লেখা গঠনরীতি সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে। তাতে পাঠক বিপন্ন হতে পারেন এই কারণে যে রীতি ও শৈলী সমার্থক এমন একটা ধারণা জন্মে যায়। আমরা তো শিখেছি, এই সংকলন থেকেও শিখেছি, যে গঠনরীতি আর শৈলী আলাদা এবং শৈলী নির্ভর করে 'স্বাতন্ত্র্য' ও 'বিচ্যুতি'র ওপর। রীতি ভাঙলেই বিচ্যুতি ঘটে, স্বাতন্ত্র্য তৈরি হয় আর আমরা শৈলীর সন্ধান পাই। এবং যে কথাটা বেশ জোর দিয়েই বলা যায় তা হল এই যে রীতি অনেকের, কখনও সর্বজনীন, কিন্তু শৈলী একজনের। 'বাঁধাধরা' পথে চললে শৈলীনির্মাণ সম্ভব নয়। সে পথে বিচ্যুতি ঘটে না, স্বাতন্ত্র্য তৈরি হয় না।

এ কারণেই লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে শৈলীচর্চা কঠিন। কারণ এই সাহিত্য অনেকটাই বাঁধাধরা পথে চলে। আঞ্চলিক ও পরিবেশগত কিছু ভেদাভেদ থাকলেও লোকসাহিত্যের উপাদানগুলির রীতি অনেকটাই আঁটো থাকে। যারা লোককথা বা লোকপুরাণের অবয়ব নিয়ে চর্চা করেন তাঁরা আমাদের এই তথ্য জানান। সেখানে 'বিচ্যুতি' থাকে না, 'স্বাতন্ত্র্য' থাকে না।

নির্বাচন সম্ভব নয়। অথচ এগুলিই তো শৈলীর চিহ্ন। লোকসংস্কৃতিতে শৈলীর তফাত কিছু দেখা যায় কথকতায় ও অভিনয়ে। তাই 'বাউল গানের গঠন' আলোচনায় সুধীর চক্রবর্তী লক্ষ করেন যে 'বাউল গানের গঠনে বৈচিত্র্য কম'—সেই উনতা পূরণ হয়ে যায় সুরের বৈচিত্র্যে ও নৃত্য-বিভঙ্গে। সুরের বৈচিত্র ও নৃত্যবিভঙ্গ দুই কিন্তু নির্ভর করে 'একলা বাউল'-এর অভিকরণ বা পারফরমেন্সে। শৈলী বা স্বাতন্ত্র্য তাই রীতিতে নয়, উপস্থাপনায়। তাই বলা যায় যে এই বিভাগের প্রবন্ধগুলি মূল্যবান হলেও এই সংকলনে প্রক্ষিপ্ত হয়ে গেল। কারণ গঠনবিচার ও শৈলীচর্চা এক নয়।

একই সমস্যা থেকে যায় বিবিধশৈলী বিভাগে। অন্যান্য লেখার মতোই এই বিভাগের লেখাগুলিও সুলিখিত। কিন্তু 'মেকিয়াভেলি ঃ রাজনীতির শৈলী' প্রবন্ধটি ছাড়া অন্য প্রবন্ধগুলি শৈলীচর্চার সংকলনে বেমানান।

তবে শেষ কথা এই যে বইটি পড়ে উপকৃত হয়েছি। প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ চমৎকার। সংকলক-সম্পাদক ও প্রকাশককে তাই পাঠকপক্ষে ধন্যবাদ জানাই।

শৈলী ঃ চিন্তাচর্চা—সংকলন ও সম্পাদনা

—বিপ্লব চক্রবর্তী/ রত্নাবলী, কলকাতা/ ২৫০.০০।

সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ

ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

যেমন সমাজকে ছাড়িয়ে সাহিত্য, তেমনই সাহিত্যকে ছাড়িয়ে সমালোচনা খুব বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারে না। ইসকিলাস, সফোক্লিস, ইউরিপিডিস ইত্যাদিকে আমরা বিশ্বসাহিত্যের নিজস্ব সম্পদ বলে মনে করি, অথচ গ্রিক নাটক জন্মসূত্রে তৎকালীন গ্রিক সমাজের, তার ধর্মাচরণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। তেমনই, যে-অ্যারিসটটল এর আধিপত্য শতাব্দীর পর শতাব্দী পাশ্চাত্যবিশ্বের সাহিত্যচিন্তায় অবিসম্বাদিত ছিল তিনিও নাটক বলতে বুঝতেন গ্রিক নাটক, কাব্য বলতে জানতেন গ্রিক কাব্য।

এখন আর সে দিন নেই। এখন বাঙালির সাহিত্য দেশ-কালের সীমানা ছাড়িয়ে উধাও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তার সাহিত্যজিজ্ঞাসা? অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় সাহিত্যের প্রথিতযশা অধ্যাপক ছিলেন। ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক হলেও তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে তাঁর কাজের জন্য। সাহিত্যের নানা বিষয়ে তাঁর রচনার এই সঙ্কলনটিতেও তাঁর সবচাইতে মূল্যবান রচনা রবীন্দ্রনাথের ছন্দের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। অন্য প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন মানের কিন্তু সেগুলি পড়বার সময়ে প্রায় আগাগোড়া একটি অস্বস্তির ভাব মনে জেগে থাকে, মনে হয় কীসের যেন অভাব বোধ করছি, ঠিক আসল কথাটি যেন সর্বদাই একটু চোখের আড়ালে থেকে যাচ্ছে, যেন ধরি ধরি করেও ঠিক ধরা হল না। এইটাই প্রধান কারণ, যে জন্য বাংলা সমালোচনা সাহিত্য পড়ে প্রায়ই মনে হয়, পাশ্চাত্যবিশ্বে সাহিত্য সমালোচনা যেমন ক্রমাগত পাঠ্যবস্তুটিকে, কবিতাটিকে নাটকটিকে গল্প কিংবা উপন্যাসটিকে তার সঠিক, একেবারে নিজস্ব চরিত্রে চিনে নেবার চেষ্টা করছে, তার ভাষার, তার ভঙ্গির তার বলা এবং না বলার, তার গ্রহণ এবং বর্জনের মধ্য দিয়ে সে ঠিক কী হয়ে উঠেছে, সেটা শক্তমুঠিতে ধরবার, ক্রমাগত পাঠ্যবস্তুর নিকট থেকে নিকটতর পরিচয় লাভের চেষ্টা করে চলেছে, আমরা যেন সেই প্রচেষ্টা থেকে ক্রমশই দূরে চলে যাচ্ছি।

তার কারণ, প্রথমেই যা বলেছি। কোনও ভাষার সমালোচনা, সাহিত্যজিজ্ঞাসা কখনওই সাহিত্য, তার নিজের সাহিত্যের নাগাল ছাড়িয়ে বেশি দূরে যেতে পারে না। বাংলা সাহিত্য এখনও বস্তুকে, তার স্বকীয়তাকে যাকে বলে তার quiddity, তাকে বাঙ্ময় করবার চেষ্টায় তেমন করে রত হয়নি সমালোচনা সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। সেখানেও মনে হয় যার কথা বলা হচ্ছে তার সম্পর্কে আসল কথাটি কেবলই ধরা দিতে গিয়েই আঙুলের ফাঁক দিয়ে পিছলে যাচ্ছে। যেমন, অমূল্যধন তারাশঙ্করের বিষয়ে বলেছেন, "কোনো উপন্যাস পড়িলে মনে হয় যে তিনি মাত্র সমসাময়িক ঘটনার সাংবাদিক, উপন্যাসের কাঁচামাল ছাড়া

স্থায়ী সাহিত্যিক সম্পদ আর বিশেষ কিছু তাহাতে নাই।" এই যে কাঁচামাল এর কাঁচাই থেকে যাওয়া, তারাশঙ্করের অনস্বীকার্য সাহিত্যপ্রতিভার এই আরেক ধাপ না এগিয়ে এইখানেই থেমে যাওয়া ("অগ্রদানী"—যার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ), এই হচ্ছে তারাশঙ্কর। অমূল্যধন এই সত্যটিকে ছুঁয়ে গেছেন মাত্র।

এই যে লেখক এবং তাঁর লেখার প্রকৃত স্বরূপটিকে চিনে নেওয়া, এ বিষয়ে অক্ষমতা, কিংবা অনীহা, অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে একজন লেখকের স্বপ্ন ও সাধনাকে, যাকে মিল্টন বলেছেন তাঁর "প্রাণ-শোণিত", তাকে কিছু-একটা বিশেষণ দিয়ে বিদায় করে দেওয়া, আমাদের সমালোচনা সাহিত্যের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন "ঔপন্যাসিক তারাশংকর"-এর প্রশংসা করতে গিয়েই লেখক বলেছেন, 'তারাশংকরের উপন্যাসে আঞ্চলিক জীবনের যে চিত্র আছে তৎসম্বন্ধে আর একটা কথা বলা দরকার, এই চিত্রিণে কোনও কল্পলোকের রঙ নাই। যে গ্রামজীবন তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা "স্বপ্ন দিয়ে তৈরী" নহে; "ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়" ছোট ছোট গ্রামের চিত্র তাঁহার রচনায় বিশেষ নাই; বিভূতিভূষণের মতো তিনি পল্লীজীবনের idyll সৃষ্টি করেন নাই।'

"পথের পাঁচালী" পল্লিজীবনের idyll! ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যুর মতো অস্তিত্বের মূলে গিয়ে আঘাত করে বাংলা কিংবা বিশ্বসাহিত্যের ক'টি ট্র্যাজেডি? বিভূতিভূষণ সম্পর্কে এটিই প্রচলিত ধারণা হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত সাহিত্য থেকে এত দূরে দাঁড়িয়ে সাহিত্যসমালোচনা বস্তুত সমালোচকের দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দেয় না। এই প্রসঙ্গে মনে হল, বিভূতিভূষণের সাহিত্যে evil-এর ভয়ংকর মূর্তি নিয়ে একটা গভীর আলোচনা দরকার। এ এমন এক বস্তু, এই evil , যার তল পাওয়া যায় না।

তেমনই শরৎচন্দ্রতেও এমন অনেক কিছু আছে যাকে শুধুমাত্র "কান্নার জোলাপ" বলে ডিসমিস করে দেওয়া যায় না। "গৃহদাহ" কান্নার জোলাপ নয় "শ্রীকান্ত"তে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর স্ববিরোধিতাপূর্ণ সংঘাতময় প্রেম-হাসি-কান্নার ব্যাপার নয়, চতুর্থ পর্বে তাদের কাহিনি এক অদ্ভুত অনির্বচনীয় ধূসরতায় আচ্ছন্ন হয়ে মানুষের অস্তিত্বের অর্থ নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে। নানা ছোট গল্পে "অনুরাধা", "মামলার ফল", এমনকী "গ্রামের সুমতি", "বিন্দুর ছেলে" ও "হীরকখণ্ডে"র মতো মানুষকে নানা দিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার মধ্যে থেকে কত অভাবিত আলোর বিচ্ছুরণ দেখিয়েছে, এ সবের কথা যদি একজন সাহিত্যসমালোচক না বলেন, কে বলবে?

ভার্জিনিয়া উলফ অনেক দিন আগে বলেছিলেন, অনেক সময়ে আমরা এমন প্রত্যাশা এবং এমন ধারণা নিয়ে কোনও বই পড়তে আরম্ভ করি যা সেই বইটি উপভোগ করবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যে-কোনও উৎকৃষ্ট সাহিত্য কর্মের সামনে মনের একটু সতেজতা, একটু নবীনতা নিয়ে দাঁড়ানো দরকার। দীর্ঘকাল সাহিত্য অধ্যাপনায় সম্ভবত তার কিছু ক্ষতি করে।

এবং এও সম্ভব, যেমন কোনও ব্যক্তি, তেমনই কোনও বস্তুকেও সঠিকভাবে চিনতে গেলে তাকে ভাললাগা দরকার। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের তিনি প্রকৃত রসগ্রাহী, তাই রবীন্দ্রনাথের ছন্দের বৈশিষ্ট্য তাঁর দৃষ্টিতে এত উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ যে মূলত নৃত্যধর্মী, এই একটা কথাতেই তিনি অন্যান্য কবিদের থেকে তাঁর বিশিষ্টতা অভ্রান্ত ভাবে প্রকাশ করেছেন। বস্তুত ছন্দের এই সৌন্দর্য মনে হয় যেন বাংলা ভাষারই নিজস্ব সম্পদ। একেই রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন, অপরূপ সৌন্দর্যে ও শক্তিতে মণ্ডিত করেছেন, অমূল্যধনের দৃষ্টিতে ধরা পরেছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার এই অনন্য অবদান।

আরও অনেক প্রসঙ্গ আছে এই বইখানিতে, "কাব্যের ধর্ম", অর্থাৎ অন্যজাতীয় রচনার সঙ্গে কাব্যের পার্থক্য "সাহিত্যে আধুনিকতা", সনাতনী সাহিত্যের সঙ্গে তার পার্থক্য, তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর শেকসপিয়র ও বাংলা নাটক, বার্নাড শকে নিয়ে, হুইটম্যানকে নিয়েও তিনি সমালোচনা করেছেন এবং তাঁর অনেক বক্তব্য, যেমন "মন্দ কবিযশঃ প্রার্থীর হাতে পড়লে" হুইটম্যানের ছন্দ "অক্ষম গদ্যে পর্যবসিত হতে পারে" যে অত্যন্ত সঠিক সে তো আমরা রোজই দেখছি। কিন্তু তিনি যখন বলেন, 'সনাতন সাহিত্য সর্বদাই দুর্লভ সূক্ষ্ম উপলব্ধির দিকেই পাঠকের মনকে চালিত করার প্রয়াস করিয়াছে' তখন সে কথা মেনে নেওয়া সহজ না হতে পারে। মনে পড়তে পারে 'ইলিয়াড' কাব্যে যুদ্ধের অতি স্থূল বাস্তবধর্মী বর্ণনা।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা। তাঁর অগণিত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে এখনও যাঁরা জীবিত এবং তাঁর 'বাংলা সাহিত্য উপন্যাসের ধারা'-র অগণিত পাঠক, তাঁর পাণ্ডিত্য, বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও অতি সমৃদ্ধ প্রকাশ ক্ষমতার কথা আরেক বার স্মরণ করে আনন্দিত হবেন।

আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা-অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় / দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩/ ৮০.০০

রবীন্দ্র-গান্ধী ভাবসংঘাত

সৈয়দ আবুল মকসুদ

বাংলায় মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও চিন্তাধারার যাঁরা অবিচল প্রচারক তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। প্রথম যৌবনেই গান্ধীজির সংস্পর্শে আসার দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। তখনই জীবনের ব্রত হিসাবে গান্ধীবাদী পথ তিনি বেছে নেন। আজ মধ্য-৭০-এ পৌঁছেও সে-পথ থেকে এক চুলও সরে যাননি। তিনি তাঁর কর্মের গান্ধীবাদ প্রচারে সমান সক্রিয়। গান্ধী সম্পর্কে বেশ কয়েকটি গ্রন্থেরও তিনি প্রণেতা। তার মধ্যে রয়েছে, 'গান্ধীজি ও নেতাজী', 'গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙালী', 'স্বরাজ—গ্রাম স্বরাজ' প্রভৃতি। বছর দেড়েক আগে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'বিরোধের অন্তরালে রবীন্দ্র-গান্ধী সংবাদ'। এতে দুই মহামানবের চিন্তার মধ্যে মিল ও সংঘাত আলোচিত হয়েছে। অবশ্য বহু বছর আগে তিনি একই বিষয়ে লিখেছিলেন 'পরমবান্ধব রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী' শীর্ষক একটি ছোট বই।

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মুখবন্ধে যথার্থই লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল শ্রদ্ধা-প্রীতির। আবার অনেক বিষয়ে তাঁদের মতান্তরও ছিল প্রবল। এই মতান্তরের বিষয়গুলি নিয়ে তাঁরা প্রকাশ্যে বিতর্কেও প্রবৃত্ত হয়েছিলেন—যদিও সেই বিতর্ক ছিল সম্পূর্ণ অসূয়ামুক্ত।

পরিশিষ্টে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর দশটি চিঠি (ইংরাজিতে লেখা চিঠির লেখক কর্তৃক অনুবাদ) ছাড়া এ বইতে রয়েছে চারটি নিবন্ধ : সূচনা, সুস্বনতা (হারমনি), সন্নিধি (নৈকট্য) এবং সংশ্লেষ (সিনথেসিস)। লেখাগুলোর একদিকে আছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীর ব্যক্তিগত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের পরিচিতি, অন্য দিকে তাদের চিন্তা ও কর্মের পার্থক্য। তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ছিল প্রবল। পরস্পরের কাছে তাঁরা 'গুরুদেব' ও 'মহাত্মা', কিন্তু অন্ধের মতো একে অপরকে সমর্থন জানানোর প্রয়োজন বোধ করেননি।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে গান্ধীজির পরিচয় ঘটে একেবারে শতাব্দীর শুরুতে—১৯০১ খ্রিস্টাব্দে। তিনি এসেছিলেন কলকাতা কংগ্রেসে যোগ দিতে একজন খ্যাতিহীন ডেলিগেট হিসাবে। সেই উপলক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয়েছিল একটি অনুষ্ঠানে। ১৯১৫-তে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে স্থায়ীভাবে দেশে ফিরেই গান্ধী শান্তিনিকেতনে যান। তখন তিনি বিখ্যাত তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকার কর্মকাণ্ডের জন্য। ১৯১৫-র মার্চে শান্তিনিকেতনে গান্ধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয় এবং তখনই স্থাপিত হয় তাঁদের মধ্যে চিরদিনের জন্য সখ্যতার ভিত্তি। কবির জ্যেষ্ঠভ্রাতা দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গান্ধীজি যে শুধু 'বড়দাদা' সম্বোধন করতেন তা নয় তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন পিতার মতো। তাঁদের মধ্যেও নানা প্রসঙ্গে বিতর্ক হয়েছে।

গান্ধীজির সত্যাগ্রহ, চরখায় সুতাকাটা, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, 'বয়কট' বিষয়ে কবির দ্বিমত ছিল। তা ছাড়া অসহযোগের নামে ব্রিটিশ কাপড় পোড়ানো, ছাত্রছাত্রীদের ইস্কুল-কলেজ বর্জন প্রভৃতি ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথের সমর্থন ছিল না। তবে গান্ধীজির যে-কোনও মানবতাবাদী কাজে ও গঠনমূলক তৎপরতায় সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সমর্থন দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। লেখক জানাচ্ছেন,—

'.....চরখার সমর্থনে গান্ধীজির লেখাগুলি রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন কি না তা জানা নেই। গান্ধীজীও বলেছিলেন যে কবি "ইয়ং ইন্ডিয়া" পড়েন না, তিনি তা পড়বেন এমন প্রত্যাশাও কেউ করেন না এবং তাঁর তা পড়বার প্রয়োজনও নেই।' তিনি গান্ধীজীর লেখা পড়ুন বা নাই পড়ুন, এ নিয়ে নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয়ে থাকবে, তবু তাঁরা এই বিষয়ে ভিন্ন পথেরই পথিক ছিলেন। এ কথাও যেমন সত্য তেমনই এ কথাও সত্য যে চরখার বিরোধিতার তীব্রতা রবীন্দ্রনাথের কমে এসেছিল। "দেশবন্ধু-স্মৃতি তহবিল"-এর আবেদনে তাঁর স্বাক্ষর দান এবং কুমিল্লার "অভয় আশ্রম"-এ তাঁর বক্তৃতা এ কথার সাক্ষ্য বহন করে। তা ছাড়াও ১৯৩৪ সালে গান্ধীজীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত "অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘ"-এর উপদেষ্টা পদ গ্রহণে তিনি গান্ধীজির অনুরোধে সানন্দে রাজী হয়েছিলেন। আর মজার কথা হল এই যে গান্ধীজী যখন যন্ত্র বিরোধিতায় সোচ্চার এবং রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করছেন ঠিক সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তধারা' নাটকটি লিখেছিলেন। এই নাটকে তো যন্ত্রোন্মাদনারই বিরোধিতা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।' [পৃ. ৬২]

দুই মহামানবের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে লেখক তাঁদের চিন্তা ও কাজের মধ্যে সাযুজ্য ও বৈপরীত্য দেখিয়েছেন। ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আর যে কাজটি করেছেন তা হল কবির রচনা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতীয়মান করার চেষ্টা করেছেন গান্ধীজির মতব্যদের সঙ্গে তাঁর নৈকট্য কোথায়। ছোট এই বইটি পাঠ করলে বোঝা যায় লেখক মনোযোগ দিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ করেছেন। যেমন—

'মূল কথা হলো, "বউ ঠাকুরানীর হাট" লেখার সময় গান্ধীজীর চিন্তা এবং কর্মধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটেনি। গান্ধীজীর কর্মধারা তখন শুরু হওয়ার কোনো প্রশ্নই ছিল না। গান্ধীজীর বয়স তখন মাত্র চোদ্দ বছর। তাই সেখানে উদয়াদিত্য এবং বসন্তরায়ের চরিত্র দুটিকে ভবিষ্যৎ গান্ধীজীবনের পূর্বাভাস বলা যায়। কিন্তু "প্রায়শ্চিত্ত" নাটক লেখার (১৯০৯-১০) সময় গান্ধীজীর জীবন ও কাজের কথা রবীন্দ্রনাথের জানা ছিল। তাই এখানে ধনঞ্জয় নামে যে নতুন চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তাকে গান্ধী-চরিত্রের প্রতিচ্ছবি বলা যেতে পারে। আর "মুক্তধারা" (১৯২২-২৩) এবং "পরিত্রাণ" যখন তিনি লিখেছিলেন তখন তো তিনি গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। সুতরাং এই চারটি (বউ ঠাকুরানীর হাট, প্রায়শ্চিত্ত, মুক্তধারা, পরিত্রাণ) লেখার ধারা অনুসরণ করলে এ কথা মনে করা হয়তো ভুল হবে না যে রবীন্দ্রনাথের কবি-হৃদয়ে (কবি অর্থাৎ ক্রান্তদর্শী) অন্যায়ের প্রতিরোধে হিংস্র পন্থার বিকল্পরূপ প্রেম, অসহযোগ এবং সেই সঙ্গে নির্ভরতার যে বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছিল গান্ধী-চরিতে তিনি তার এক মূর্তরূপ প্রত্যক্ষ করে তাকেই কাব্যময় করে দিয়েছিলেন।' [পৃ. ৩৬]

যতই সময় গেছে পরস্পর পরস্পরের ওপর নানা ব্যাপারে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। একে অপরের সমর্থন ও পরামর্শের প্রয়োজন হয়েছে। বিশ্বভারতীর দায়িত্ব কবি দিতে চাইছেন গান্ধীকে। ১৯৩২-এর ২০ সেপ্টেম্বর গান্ধীজি কবিকে লিখছেন,—

'আপনি আমার একজন প্রকৃত বন্ধু, কেননা আপনি স্পষ্টবক্তা বন্ধুরূপে রয়েছেন এবং প্রায়ই আপনার চিন্তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। আমি আপনার যে কোনো সুকঠোর মতামতের দিকে তাকিয়ে থেকেছি। কিন্তু আপনি সমালোচনা করতে অস্বীকার করেছেন। এখন তা কেবল আমার অনশনের মধ্যে হলেও যদি আপনার হৃদয় আমার কাজকে নিন্দা করে তবু আমি আপনার সমালোচনাকে মূল্য দেব।....আপনার আশীর্বাদ আমাকে পতন থেকে রক্ষা করবে।' [পৃ. ২৪]

বর্তমানে উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা সকলেরই পর্যালোচনা করা উচিত। তাঁদের লক্ষ্য অভিন্ন—ভারতবর্ষের মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি। তবে লক্ষ্য অর্জনে তাঁদের উপায় অভিন্ন ছিল না। তাঁদের আদর্শ ও চিত্তাধারার কোথায় মিল আর কোথায় অমিল, কোথায় তাঁদের ভাবাদর্শে বৈপরীত্য ও সংঘাত তা উভয়ের বক্তব্য ও রচনা থেকে উদ্ধৃতিসহ লেখক উপস্থিত করেছেন। সাধারণ পাঠক যাঁরা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির কর্মসাধনাকে সমান মূল্য দেন তারা এই ছোট বইটি পাঠ করে উপকৃত হবেন।

বিরোধের অন্তরালে রবীন্দ্র-গান্ধী সংবাদ —ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় / বোনা, কলকাতা-৯ / ৫০.০০

স্বতন্ত্র ধারার তিন গল্পকার

প্রণব সেন

মৃত্যু-চেতনা, নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সমাজের অন্তেবাসীদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ—তিনজন লেখকের স্বতন্ত্র জীবন-ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁদের রচিত ছোটগল্পগুলিতে। পরিমল চক্রবর্তী, নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও হেদায়েতুল্লাহ সাহিত্যরসপিপাসুদের কাছে পরিচিত নাম। অবশ্য পরিমল চক্রবর্তী কবিতা ও প্রবন্ধ রচনায় অনেক বেশি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নীলাঞ্জন ও হেদায়েতুল্লাহ মূলত ছোটগল্প রচনায় তাঁদের সৃষ্টি-ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটাতেই বেশি সচেষ্ট। তাঁরা যে সচেতন পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

পরিমল চক্রবর্তী রচিত 'রূপান্তর' সংকলনে সাতটি গল্প ও একটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। সাতটি গল্পে তিন ধারার পাঠক-পাঠিকাদের উপযোগী বিষয় পরিবেশিত হয়েছে বলে লেখক মনে করেন। প্রবন্ধে ফেদেরিকো গারসিয়া লোরকার জীবন ও সাহিত্য নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনায় প্রতিফলিত হয়েছে লেখকের বিশ্লেষণাত্মক মনোভাব। লোরকার কবিতায় প্রেম ও মৃত্যুর সহাবস্থানের যে দার্শনিক জীবনবোধ স্থান পেয়েছে, তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই নির্মিত হয়েছে লেখক পরিমল চক্রবর্তী অন্তর্জগৎ। তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলিতে। জন্মদিন-মৃত্যুদিন, একটি মৃত্যুকে

ঘিরে, ছোটন—প্রভৃতি গল্পগুলির কাহিনিকাঠামোয় মৃত্যুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 'জন্মদিন-মৃত্যুদিন' গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র বেলার জন্মদিনের উৎসবকে মৃত্যুর বিষাদে ঢেকে দেওয়ার জন্য লেখক তার মৃত্যু ঘটাতে বাধ্য হয়েছেন এক অস্বাভাবিক ঘটনার মাধ্যমে। অন্ধকারে বাতি জ্বালাতে গিয়ে খোলা তারে 'শক' লেগে বেলার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় গল্পেও লেখক স্কুলের ছাত্র অলকেশের মৃত্যু ঘটিয়েছেন। সুস্থ অলকেশের হঠাৎ অসুস্থ হওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে লেখকের ভাবনা অনুচ্চারিত থাকলেও তিনি তার মৃত্যু ঘটাতে দ্বিধা করেননি। 'ছোটন' গল্পটি যদিও আরও ছোটদের জন্য লেখা, কিন্তু লেখক গল্প শুরু করেছেন এক মৃত্যুর ঘটনা দিয়ে। গল্পের শেষ পর্বে এসে তিনি ছোটনেরও মৃত্যু ঘটিয়েছেন। ছোটদের জন্য রচিত গল্পে এমন মৃত্যুর ঘটনা থাকা কি উচিত? ছোটদের মনে আনন্দ যোগানো, তাদের কল্পনার জগৎকে আরও প্রসারিত করা, জীবনের অজস্র জটিলতা উপেক্ষা করে তাদের এক স্বপ্নের জগতে নিয়ে যাওয়া—শিশুসাহিত্য রচনায় ব্রতী লেখকের অবধারিত কর্তব্য।

পাঠকের মনন ও হৃদয়ের কাছে পৌঁছানোর জন্য লেখক নীলাঞ্জন জীবন-রহস্যের গভীরে ডুব দিয়ে নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিলতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে যে আধুনিক জীবন-প্রবাহ তাকেই অনুভব করে নির্মম মমতায় পরিবেশন করতে চেয়েছেন এই সঙ্কলনের বিভিন্ন গল্পে। তিনি নিজের কোনও অনুভূতিকেই মুখোশ পরাতে চাননি। তিনি যতটুকু যেমন দেখেছেন, তেমন করেই বলেছেন।

সামাজিক কুসংস্কার কিংবা উঠতি মস্তানদের প্রশ্রয়দাতা প্রশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর কলম যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে গর্জে উঠেছে, তেমনই নারী-পুরুষের বিকৃত যৌন-সম্পর্কের বিবরণ দিতেও তাঁর কলম স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু এই বিবরণ কতখানি অবধারিত ছিল, সে নিয়ে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগাই স্বাভাবিক। 'পারমিতার ঘাড়ে কপালে, চোখের পাতায়, গলার খাঁজে, নিটোল, উঁচু আঁটো সাঁটো, পরিপূর্ণ দুই মাংসখণ্ডে ঋকের ঠোঁট হিংস্র সংগ্রামে চলে ফিরে বেড়াচ্ছিল'—অথবা 'মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে নিজের ঝাঁকড়া-চুলের মাথা শর্মিষ্ঠার প্রকাশ্য জংঘায় স্থাপন করেছিল। সৌভিক চুমু খাচ্ছিল তার নিম্নাঙ্গের সর্বত্র'—পুরুষের উগ্র কামনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে এমন ঘটনার আশ্রয় অনায়াসে নিতে পেরেছেন লেখক। যিনি চরিত্র সৃষ্টিতে অনবদ্য দক্ষতার অধিকারী, তিনি কেন এ ভাবে অসংযমী ভাষা ব্যবহারের প্রবণতায় আক্রান্ত হবেন? 'আক্রান্ত' গল্পে পারমিতা ঋকের অসংযমী আচরণকে প্রশ্রয় দিয়ে ভালবাসার প্রকাশ ঘটিয়েছে একটি চিঠিতে অথচ পারমিতা ঋককে একই কারণে প্রত্যাখ্যান করে হাত বাড়িয়েছে অন্য পুরুষের দিকে। এই ঘটনার যুক্তিগ্রাহ্যতা কি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে? সামান্য ঘটনাকে অসামান্য করে তুলে গল্পগুলিকে শিল্পসুষমায় ভরিয়ে তোলার পারদর্শিতা দেখিয়েছেন নীলাঞ্জন। তিনি কি জাঁ পল সার্ত্রের অনুগামী গল্পের নির্মাণ কুশলতায়? কখনও কখনও পরাবাস্তবতাবাদের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন। 'পাখি', 'আক্রান্ত' প্রভৃতি গল্পের পরিণতির নির্মাণে তিনি তারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

পেশায় চিকিৎসক হলেও সংবেদনশীল ও দরদি মন নিয়ে হেদায়েতুল্লাহ সমাজের অন্তেবাসীদের জীবনের গভীরে প্রবেশ করে যে সত্যের সন্ধান পেয়েছেন তারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন বিভিন্ন গল্পে। পাশাপাশি স্থান পেয়েছে ওপরতলার ভণ্ডামি, তাদের মুখোশও তিনি খুলে দিয়েছেন।

অধিকাংশ গল্পের পটভূমি গ্রামবাংলা। তাঁর মনোজগতে গ্রামজীবন এতই প্রভাব ফেলেছে যে, তিনি প্রকৃতিচেতনার সঙ্গে জীবনবোধের অসামান্য সংমিশ্রণ ঘটাতে পেরেছেন। তার ফলেই তিনি নির্মাণকৌশলে স্বতন্ত্র ধারার অধিকারী হয়ে উঠতে পেরেছেন। যে-গল্পেই তিনি প্রকৃতির রূপ বর্ণনা করেছেন, সেখান কাহিনি ও সৃষ্ট চরিত্র তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। তাই কখনও বর্ণনাগুলিকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়নি।

জীবনকে ছুঁয়েছেন, তার গভীরে প্রবেশ করেছেন, কোথাও কৃত্রিমতার আশ্রয় নেননি। "মাছগুলো দাওয়ায় ছড়িয়ে তারা স্বপ্ন দেখে। রিপার-সিপার না, ভিডিও গেম না, তারা স্বপ্ন দেখে স্রেফ একবাটি গরম ভাতের।" অর্থনৈতিক বৈষম্যের অভিশাপ কীভাবে জীবনকে গ্রাস করেছে, তার বাস্তব চিত্র তিনি এঁকেছেন অনায়াস ভঙ্গিতে। বিশ্বায়নের যুগে এই বৈষম্য আরও বাড়ছে। বিভিন্ন গল্পে তাঁর সমাজসচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। সোনালি ধানের খেতে লাশ, সাদেকের ঘর সংসার, সামাদের দিন-রাত্তির, দহের যন্ত্রণা, বিদ্যাধরী উপাখ্যান ইত্যাদি গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য।

রূপান্তর—পরিমল চক্রবর্তী / নিরালা, পূর্ব সিঁথি রোড / ৫০.০০
গণপ্রহারের খসড়া—নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় /দীপ প্রকাশন, কলকাতা / ৮০.০০
দহের যন্ত্রণা—হেদায়েতুল্লাহ / প্রকাশক—মমতাজ খাতুন / ব্রাইট স্টিট, কলকাতা / ৪০.০০

ভিন্ন মাত্রার কথাসাহিত্য

বুলবুল আহমেদ

বাংলার এই অংশে শান্তনু কায়সারের লেখাপত্র বেশি পাওয়া যায় না। বন্ধুদের মাধ্যমে তাঁর কথা জানা হয় কিছুটা। সহসা কখনও হাতে আসে তাঁর প্রবন্ধ সংকলন। তাঁর অদ্বৈত মল্লবর্মন সংক্রান্ত এষণা ও আলোচনা আমাদের পরিশ্রমী হতে শেখায়। ভাল লেগেছিল তাঁর করা 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের নাট্যরূপ। এই সবই শান্তনু কায়সারের লেখা সম্পর্কে নানা সময়ে কৌতূহলী করেছে। সঙ্গত কারণে তাঁর 'বাংলা কথাসাহিত্য ভিন্নমাত্রা' বইটি এক ভিন্ন আগ্রহ নিয়ে পড়তে বসা। তার পর সংকলিত চারটি প্রবন্ধের মাধ্যমে শান্তনু আমাদের নিয়ে যান অন্য এক চারণায়।

প্রথম প্রবন্ধের নামে বইয়ের নামকরণ। এই প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলা ভাষার এই তিন কথাসাহিত্যিকের কোথায় সংযোগ আর কোথায় তাঁরা পরস্পর থেকে ভিন্ন দিগন্তের দ্রষ্টা। তিনজনই এই উপমহাদেশের এক ক্রান্তিকালের সন্তান এবং তাঁরা এমন সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন যা তাঁদের সাহিত্যভাবনা ও রচনা প্রকরণে প্রভাব ফেলেছে। বিভূতিভূষণের রচনার এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য সারল্য হলেও তাঁর এক জটিল বিন্যাস গোচরে আসে। চরিত্রসমূহের বিশ্লেষণমুখিনতার মাধ্যমে মানিক জটিলতা থেকে সারল্যে পৌঁছে যান যেন এক নিশ্চিত পরিক্রমণে। আর আধুনিকতর শিল্পকৌশলের সঙ্গে পরিচিত ওয়ালীউল্লাহ সাহিত্যে নিজের শেকড়ের সন্ধান ও আত্মখনন করেন অবিরাম। বয়সের ব্যবধান থাকলেও ভোগা-আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তর, দেশভাগ ইত্যাদি ঘটনা পর্যবেক্ষণে তাঁরা ছিলেন সমসাময়িক।

বিভূতিভূষণের উপন্যাস 'অশনি সংকেত'— এর বাস্তব ভিত্তি পঞ্চাশের মন্বন্তর। মানিক রচিত 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' এর পটভূমি ভোগার ও মন্বন্তরে আক্রান্ত প্রান্তিক জীবনের যন্ত্রণা। আর মন্বন্তরের বিশেষ প্রকাশ দেখা যায় ওয়ালীউল্লাহ-র প্রথম গল্পগ্রন্থ "নয়নচারা"-র গল্পসমূহে।

দারিদ্রের থেকে বড় অভিশাপ আর হয় না। শান্তনু কায়সার দেখেছেন দারিদ্রের কারণে এই তিন কথাকারের চরিত্ররা কীভাবে এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। ওয়ালী উল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ যে দেশ থেকে এসেছে সেখানে 'শস্যের চেয়ে টুপি বেশি। ধর্মের আগাছা বেশি।' আর মজিদের মনে হয় 'খোদাকে হয়তো সে জানে, কিন্তু জ্বলন্ত পেটের মধ্যে সবকিছু যেন বাষ্প হয়ে মিশে যায়।' মানিকের 'গুপ্তধন' গল্পে ভীম 'শোক দুঃখ যদিবা কোনরকমে সহিতে পারে ক্ষুধার জ্বালা একেবারেই পারে না'। যে তাকে অপমান করে তার বাড়িতে খেতে বসতে বাধে না। বিভূতিভূষণের অশনিসংকেতের দীনু ভট্টাচার্য ভিক্ষার সপক্ষে অনঙ্গবৌকে বলে, 'জানো মা, ব্রাহ্মণের উপজীবিকা ভিক্ষা। এতে লজ্জা নেই কিছু। আমার নেই, আমি ভিক্ষা করবো, লড়াই বেঁধেছে বলে পেট মানবে?' বাস্তব এত কঠিন যে নিজের সন্তানের মৃত্যুকেও দৃষ্টিপ্রদীপে জিতু পরিত্রাণ মনে করে।

শান্তনু কায়সার দেখেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনেক আগে তার লক্ষণসমূহকে মানিক তাঁর সাহিত্যে ভাষা দিয়েছেন। ওয়ালীউল্লাহ তাঁর সাহিত্যে এর বিস্তৃত বর্ণনা না করলেও তাঁর অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ পাঠক প্রত্যক্ষ করেন। একই কারণে বিভূতিভূষণের চরিত্র স্বর্গে আস্থা রাখতে পারে না। ঔপনিবেশিক শাসনের মূঢ়তা তাঁদের সাহিত্যে প্রতিফলিত হতে দেখেছেন শান্তনু কায়সার। ধর্মের জাল, দারিদ্রের জাল, কুসংস্কারের জাল, কুশাসনের জাল দৃশ্যত আলাদা হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা এক সূত্রে বাঁধা।

লেখকের চোখে বিভূতিভূষণের অপুই পরবর্তীকালে আরও জটিল হয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র শশী হয়েছে। জীবনে যে বিপুল ও মনোরম সমারোহ সে আনতে চায় তার জন্য তাকে গ্রাম, আত্মীয়-বন্ধু ছাড়তে হবে। কুমুদের উদাহরণ থেকে সে জানে জীবন যতই চিত্তাকর্ষক ও চৌকশ হোক তা আসলে নকল। শশী গ্রাম ছাড়তে পারে না। অপু গ্রাম ছেড়ে গেলেও তার জীবনে তা জড়িয়ে থাকে। ওয়ালীউল্লাহ'র 'চাঁদের অমাবস্যা'র স্কুল শিক্ষক আর এক গ্রামেই থেকেছে। ঔপনিবেশিকতার হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা শেকড়চ্যুত হতে পারেনি, চায়নিও। শান্তনুর পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যয়ে আমাদের আস্থা রাখতে হয়।

"দেবযান ঃ স্বর্গ ও পৃথিবীর দ্বন্দ্ব" প্রবন্ধে লেখক সন্ধান করেছেন কীভাবে বিভূতিভূষণ মানুষকে কেন্দ্র করে প্রকৃতি ও পরলোক নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর পরলোক চিন্তা ও অধ্যাত্মভাবনা সাহিত্যজীবনের শুরু থেকে ব্যাপ্ত ছিল। শান্তনু বলেছেন, 'দেবযান' যদি পরলোকবিষয়ক উপন্যাস হয় তা হলে তার অগ্রবর্তী উপন্যাস "দৃষ্টিপ্রদীপ" ইহকালে পরকাল বিষয়ক অনুসন্ধানের ইতিবৃত্ত। স্বর্গবাসী আত্মা মনে করে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেবতারা তাকে বাঁচিয়েছে আর যতীন পৃথিবীর মায়া কাটাতে পারছে না। এই দ্বন্দ্বই 'দেবযান' উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য।

'দেবযান' আলোচনার জন্য শান্তনু বিভূতিভূষণের নানা সময়ের দিনলিপি, চিঠিপত্র, স্মৃতিকথা, অন্যদের লেখা ইত্যাদি থেকে অনেক সূত্রাংশ উদ্ধার করেছেন। এই ভাবে তিনি ঔপন্যাসিকের মানসপ্রবৃত্তি বোঝার চেষ্টা করেছেন। শান্তনু জানান "দেবযান" উপন্যাসের বক্তব্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। "দেবযান"পরলোকবাসের এক রহস্য কাহিনি, পলাতকদের আশ্রয় স্থল।

"মানিকের স্বর্ণবর্ণ" প্রবন্ধে লেখক এই সাহিত্যিকের বাস্তবতা, ভাষাব্যবহারের মৌলিকতা, শ্রেণিচেতনা, সমাজের প্রান্তিক মানুষজনের যাপিত জীবনচিত্রণে সার্থকতা, তাঁর রচনায় সতত ক্রিয়াশীল মার্কসবাদ ইত্যাদি বিষয়ে আলোর সম্পাত ঘটিয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে যৌনচেতনা, প্রকৃতি ও পরকীয়া প্রেম সংক্রান্ত শান্তনুর অন্বেষণ আমাদের অন্য এক সংবেদনে আগ্রহী করে। এই প্রবন্ধে মানিকের ব্যক্তিগত চিঠি, দিনলিপি, রচনাংশ ব্যবহৃত হয়েছে বারবার। তবে দীর্ঘ উদ্ধৃতি অনেক সময় বক্তব্যের ঋজুতা খর্ব করেছে। ইংরাজি সাহিত্যের ছাত্র শান্তনু কায়সার তাঁর লেখায় বিদেশি লেখকদের রচনা নানা অনুষঙ্গে ব্যবহারে প্রয়াসী হয়েছেন। তবে দু-একটি জায়গায় তাঁর সঙ্গে সহমত প্রকাশে সংশয় জাগে।

"সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, পুনর্বিবেচনা" প্রবন্ধটি বাংলা ভাষার এই অত্যন্ত ব্যতিক্রমী সাহিত্যিকের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা। তাঁর সারগর্ভ সাহিত্যের জন্য ওয়ালীউল্লাহ সমকালের থেকে বেশি আলোচিত আজ। শান্তনু কায়সার জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে ওয়ালীউল্লাহের এ ক্ষেত্রে সমধিক মিল দেখেন। আবির্ভাবের সময় থেকেই তিনি যেমন প্রশংসা পেয়েছেন তেমনই তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ির কথাও বলেছেন কেউ কেউ। তবে তিনি তাঁর গল্প উপন্যাস নাটকে বস্তুধর্মী শিল্পীর চেয়ে অনেক বেশি সত্যধর্মী। এই মনোবাস্তবতার শিল্পী সমাজসচেতন হয়েও তাঁর লক্ষ্য সব সময় অন্তর্গত মানুষ। আর সে জন্য তাঁর ঝোঁক ঘটনার চেয়ে ঘটনার আবর্তগুলোর দিকে—তিনি নৈর্ব্যক্তিকভাবে ঘটনার চিত্রায়ণ করেন। তাঁর সময়ের অনেক অগ্রবর্তী ভাষা চেয়ে অনেক সময় অদীক্ষিত পাঠকের সমস্যার কারণ হয়। "লালসালু", "চাঁদের অমাবস্যা" ও "কাঁদো নদী কাঁদো"-র লেখক জানেন ব্যক্তি সমাজেরই অংশ। আর তিনি ব্যক্তিমানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যেভাবে সমাজকে দেখেন তা কেবল প্রিজমের মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মির সঞ্চারণের তুলনায় আসে।

এই প্রবন্ধের বইটি পাঠককে এক 'ভিন্ন' পাঠে আগ্রহী করবে।

বাংলা কথাসাহিত্য ঃ ভিন্নমাত্রা—শান্তনু কায়সার / ঐতিহ্য, ঢাকা/১৪০.০০।

~ ভ্রম সংশোধন ~

চতুরঙ্গের গত সংখ্যার (বর্ষ ৬৩, সংখ্যা ১-২, ১৪১০) গ্রন্থসমালোচনা বিভাগে শ্রীঅজিত বাইরীর কবিতার বই 'সির্জন নদীর কবি'-র সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। অনবধানবশত 'সির্জন নদী'র জায়গায় ছাপা হয়েছিল 'নির্জন নদী'। এই জন্য আমরা দুঃখিত।

সম্পাদক ঃ চতুরঙ্গ

নাট্যসমালোচনা

'১৭ই জুলাই'-য়ের নাট্যনির্দেশক উত্তীর্ণ হয়েছেন পথনির্দেশকের ভূমিকাতেও

আবদুর রাউফ

ঘটনার তারিখ ২০০৩ সালের ১৭ জুলাই। গুজরাটের পাঁচমহল জেলার এরল গ্রামের বাসস্ট্যান্ড থেকে কয়েকজন মুসলিম যুবককে ধরে ধর্ষণের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়। ফাঁসিয়ে দিয়েছিল স্থানীয় কিছু সংকীর্ণ স্বার্থপ্রণোদিত ধান্দাবাজ—উগ্র হিন্দুত্বের সাম্প্রদায়িক বুকনি যাদের উদ্দেশ্য হাসিলের রাজনৈতিক হাতিয়ার। এই হাতিয়ার ব্যবহার করে মুসলিম ছেলেগুলিকে গণপিটুনির বলি করে ফেলার যাবতীয় উদ্যোগ তারা সেরে ফেলেছিল প্রায়। বাদ সাধল স্থানীয় থানার নতুন ও সি।

তিনিই ছেলেগুলিকে মারমুখী জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। ফলে থানা আক্রান্ত হয়। কোনওক্রমে আত্মরক্ষা করে রাতের অন্ধকারে ছেলেগুলিকে থানা থেকে সরিয়ে পাঁচমহলের জেলা আদালতে সোপর্দ করা হয়। তারপর শুরু হয় মামলার প্রহসন।

বিচার শুরুর আগে থেকেই বোঝা যায় সরকারি উকিল অর্থাৎ পাবলিক প্রসিকিউটর থেকে শুরু করে তাঁর সহযোগী, একজন বাদে সাক্ষীরা প্রত্যেকেই, আদালতে সমবেত দর্শকমণ্ডলী, মায় বিচারক পর্যন্ত মানসিকতার দিক থেকে সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী। অভিযুক্ত ছেলেগুলি যেহেতু মুসলমান শুধু সেই কারণেই তারা যে অবধারিত ভাবে ধর্ষণকারী—এ নিয়ে তাদের কারও মনে কোনও সংশয় নেই।

তবুও আসামি পক্ষের উকিল রাকেশ চ্যাটার্জি নামে জনৈক বঙ্গসন্তান মানবিকতার খাতিরে, মানবাধিকার রক্ষার দায়বদ্ধতার তাগিদে ১নং আসামি আসিফ মির্জার হয়ে প্রাণপণে লড়াই করেন তার ক্ষুরধার আইনজ্ঞান এবং অপ্রতিরোধ্য মেধাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে। সাক্ষীদের জেরা করার সময় তিনি একের পর এক অকাট্য যুক্তি প্রয়োগ করেন এবং সযত্নে সংগৃহীত নথিপত্র পেশ করে আদালতে প্রমাণ করে দেন ধর্ষণের মামলাটি সম্পূর্ণ সাজানো। তিনি প্রমাণ করে দেন মুসলিম ছেলেগুলি সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদীদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত ষড়যন্ত্রের শিকার।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! বিচারের নির্লজ্জ প্রহসন শেষে ১নং আসামি আসিফ মির্জার ফাঁসির হুকুম জারি করা হয় এবং ইঙ্গিত থাকে বাকিদেরও এই একই দশা ঘটবে। ঘটনাটি খুব স্বাভাবিক কারণেই সম্প্রতিকালে বহুল আলোচিত গুজরাটের বিলকিস মামলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মানবাধিকার কর্মীদের অক্লান্ত প্রয়াসে সে বিচার প্রহসন সাব্যস্ত হওয়ায় সুপ্রিম কোর্টের তরফে গুজরাটের বাইরে মহারাষ্ট্রে মামলাটির পুনর্বিচারের আদেশ জারি করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের এই আদেশ অভূতপূর্ব। এতেই প্রমাণ হয়ে গেছে গুজরাটের পুলিশি ব্যবস্থা এবং বিচারব্যবস্থা কতখানি সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদী পক্ষপাতিত্বের অন্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। '১৭ই জুলাই' নাটকের রঙ্গমঞ্চে সেই পরিস্থিতিরই পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে বিস্ময়কর দক্ষতায়।

এই বিরলদৃষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন ব্রাত্য বসু এবং তাঁর দল 'গণকৃষ্টি'। ইদানীংকালে 'গণকৃষ্টি' তাদের কিছু সফল নাট্যপ্রযোজনা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের কারণে বহুল আলোচিত নাম। ব্রাত্য বসু এই সংস্থার অন্যতম পুরোধা এবং তরুণ নাট্যকার। একইসঙ্গে তিনি নির্দেশক এবং অভিনেতাও। নাট্যকার হিসাবে ব্রাত্য বসুর প্রতিভা দ্রুত বিকাশশীল। সমসাময়িক আর্থ-রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মনুষ্যচরিত্র অনুধাবনে তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও নিবিড় গবেষণার ছাপ খুব স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান তাঁর '১৭ই জুলাই' নাটকেও। পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণাই শুধু নয়, এই নাটকে তাঁর সংবেদনশীল হৃদয়ও যোগ করেছে একটি বাড়তি মাত্রা।

সম্ভবত তীব্র সংবেদনশীলতার কারণেই তরুণ ব্রাত্য বসু প্রতিবাদী। যেমন 'উইঞ্চিল টুইঞ্চিল' নাটকে তেমনই '১৭ই জুলাই' নাটকেও তাঁর প্রতিবাদপ্রয়াস পরাক্রান্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। তাঁর প্রতিবাদের ভাষা আপসহীন এবং অকুতোভয়। ইদানীং চারিদিকে আত্মসমর্পণকারী বুদ্ধিজীবীদের

ভিড়ে তাই তিনি ব্যতিক্রমী কতিপয় বিরল ব্যক্তিত্বের অন্যতম। ব্যতিক্রমী বলেই আখেরগোছানো স্বার্থবুদ্ধির প্রণোদনায় তারুণ্যের স্বভাবধর্ম তাঁর দ্বারা লাঞ্ছিত হয়নি। '১৭ই জুলাই' উপস্থাপনার আন্তরিকতা দেখে মনে হয় ব্রাত্য বসুর সহযোগীরাও তারুণ্যের স্বভাবধর্ম বিসর্জন না দেওয়ার প্রশ্নে আপসহীন।

মানবতার খাতিরে নিজের আজন্ম লালিত সংস্কার এবং স্বার্থবুদ্ধির গণ্ডি অতিক্রম করতে পারাটাই তারুণ্যের স্বভাবধর্ম। এই গণ্ডি অতিক্রম করতে পেরেছেন বলেই '১৭ই জুলাই'-য়ের নাট্যকার শুধু পরাক্রান্ত ফ্যাসিস্ত রাজনৈতিক শক্তির সমালোচক নন, তিনি জনগণের বৃহত্তর অংশের গণমানসেরও সমালোচক। এই সমালোচনার ভাষা কতখানি ভণিতাহীন তীক্ষ্ণতায় এবং দ্ব্যর্থহীন দ্যোতনায় উচ্চারিত হতে পারে এই নাটকের সংলাপ তার ঐতিহাসিক নিদর্শন হয়ে থাকবে।

জনগণের বৃহত্তর অংশের গণমানস বলতে শুধু গুজরাট নয়, ব্রাত্য বসু স্পষ্টতই ইঙ্গিত করেছেন সারা ভারতের গণমানসের প্রতি। যে-মানসিকতা নিজেদের যাবতীয় দুর্দশার কারণ হিসাবে কোনও প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষকে দায়ী করতে চায়। এই প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষটি প্রায় ক্ষেত্রেই দুর্বল এবং সংখ্যালঘু। ভারতীয় জনগণের বৃহত্তম অংশের গণমানসে এই প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষটির নাম প্রায়শই মুসলমান হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। রাজনৈতিক ধান্দাবাজরা উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য গণমানসের এই সেন্টিমেন্টে গুড়গুড়ি দিতে পরোয়া করে না। তাঁদের এই প্রবণতাই জন্ম দেয় ফ্যাসিস্ত শক্তির।

ফ্যাসিস্ত মানেই মানবতাবিরোধী, যাবতীয় ন্যায়বুদ্ধি, যুক্তিবিচার ও মানবিক কল্যাণবুদ্ধির বিরোধী এমন এক উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি, উত্তর-গোধরাকাণ্ডে যাকে চূড়ান্ত বর্বরতায় প্রকটিত হতে দেখা গিয়েছিল গুজরাটে। যেখানে তা প্রকটিত হয়নি সেখানেও এমনকী আমাদের এই বামমার্গী পশ্চিমবঙ্গেও তার সম্ভাবনার বীজ বা বীজাণু যে অনেকেই মনের গহনে বহন করে চলে, '১৭ই জুলাই'-য়ের সংলাপের দ্যোতনায় তার বীজাণুজনিত মারণব্যাধির সম্ভাবনা সমাজসচেতন দর্শককে শঙ্কিত করবেই। সংবেদনশীল দর্শকের চেতনায় এই মারণব্যাধির নাম ফ্যাসিবাদ।

ফ্যাসিবাদের রুদ্ররূপের অগ্রসরমান পদধ্বনি যে কোনও সমাজসচেতন সংবেদনশীল দর্শকচিত্তে '১৭ই জুলাই' দেখার পর প্রতিধ্বনিত হবেই। তার মূল কারণ, এই নাটকটির উপস্থাপনায় যা কিছু বলা হয়েছে তার কোনওটাই প্রোপাগান্ডাধর্মী নয়। সব কিছুই উচ্চারিত হয়েছে নাট্য নামক দৃশ্যমান শিল্পমাধ্যমটির যাবতীয় দাবি বজায় রেখেই। মঞ্চ সজ্জা, কুশীলবদের রূপসজ্জা, নিপুণ আলোকপ্রক্ষেপণ, নেপথ্য মিউজিকের প্রয়োজনানুগ ব্যবহার, আবহ নির্মাণে নাটকীয় জনতা এবং তাদের ন্যানাটিক আচরণের যথাযথ ব্যবহার—এ সবের মধ্যেই প্রতিফলিত সেই দাবি বজায় রাখার প্রয়াস।

এই প্রয়াসের আন্তরিকতা কোনও কোনও ক্ষেত্রে নাট্যশিল্পের দাবি বজায় রাখাই শুধু নয় যোগ করেছে নতুন মাত্রাও। অভিনয়ে কারও কারও ব্যক্তিগত দক্ষতা নিঃসন্দেহে অনবদ্য। কিন্তু তাদের কারও কথা আলাদা করে বলতে গেলেই অবধারিতভাবে অবিচার হয়ে যাবে অন্যদের প্রতি। আসলে দলবদ্ধ অভিনয়ের উৎকর্ষ এই নাটকে এমন স্তরে পৌঁছে গেছে আলাদা করে কাউকে চিহ্নিত করার প্রয়োজন পড়ে না। প্রতিটি সংলাপ উচ্চারিত হয়েছে যথোপযুক্ত নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করে এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। তাই গণমানসে সযত্নলালিত সংস্কার এবং তার ওপর আরোপিত ফ্যাসিস্ত প্রবণতাগুলির বিশ্লেষণধর্মী সংলাপগুলিকেও কখনও তত্ত্বকথার মতো শোনায়নি। তাত্ত্বিক সংলাপগুলিও উচ্চারিত হয়েছে প্রাত্যহিক জীবনের নাটকীয় মুহূর্তে সঞ্চারিত উপলব্ধির তীব্রতায়।

'১৭ই জুলাই'-য়ের আবেদন তাই অমোঘ। অবশ্য অমোঘ তাঁদের কাছেই যাঁরা আত্মসমর্পণকারী বুদ্ধিজীবীদের ভিড়ে কোনওক্রমে মাথা উঁচু রেখে পথ খুঁজছে। অমোঘ ইদানীং বিরলদৃষ্ট সেইসব তরুণ-তরুণীর কাছেও স্বার্থবুদ্ধির শত প্রলোভনেও যারা নিজেদের তারুণ্যের ধর্মকে বিসর্জন দিতে সম্মত হয়নি। শুধু নাট্য নির্দেশকরূপে নন, '১৭ই জুলাই' উপহার দিতে পেরে ব্রাত্য বসু নিঃসন্দেহে তাদের কাছে নিজেকে পথনির্দেশকের ভূমিকাতেও উত্তীর্ণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

২ আগস্ট'০৪

চলচ্চিত্র সমালোচনা

মেল গিবসনের 'দ্য প্যাশন অব দ্য ক্রাইস্ট'

মেঘ মুখোপাধ্যায়।

মাত্র তেত্রিশ বছরের আয়ু নিয়ে এই ধূলিধূসর পৃথিবীতে এসেছিলেন যিশু। বাল্য-কৈশোর প্রথম যৌবনের দিনগুলি অতিক্রম করে প্যালেস্টাইনের এক দরিদ্র ইহুদি ছুতোরের সন্তান মহামানব হয়ে উঠেছিলেন তাঁর স্বল্প আয়ুষ্কালের শেষ পর্বের মাত্র কয়েক বছরের কর্মধারায়। সম্ভবত শেষ সাত বছরের জীবন তাঁকে পরবর্তী যুগের পৃথিবীতে যিশু খ্রিস্টের মহিমা দান করেছিল। আরও নির্খুঁতভাবে বলতে গেলে যেন তেত্রিশ বছরের এক মানবপ্রেমিক হৃদয়বান যুবকের জীবনের শেষ বারো ঘণ্টাই তাঁকে সমস্ত মানুষের থেকে এক অসীম উচ্চতায় উত্তীর্ণ করেছিল। তেমন ঘটনাবহুল ছিল না তাঁর জীবন, মৃত্যুই ছিল তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় ঘটনা। অকল্পনীয় এক মৃত্যু, অভাবনীয় রোমহর্ষক এক মৃত্যুপথযাত্রা, এক ভয়াল ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা আর হিংসার তাণ্ডব শেষে মৃত্যুবরণ নাজারেথের রক্তমাংসের যিশুকে চিরমৃত্যুঞ্জয়ী করে তুলেছিল। জীবন দিয়ে তিনি একটি ধর্মের প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন, সে ধর্মের পরিসরের বাইরে রয়েছে বিশ্বের আরও কয়েকটি মুখ্য ধর্ম, এ-ছাড়া দেশে দেশে ছড়িয়ে রয়েছে আরও অসংখ্য ধর্ম আর সম্প্রদায় কিন্তু এই সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায় মতবাদ আচারের গণ্ডি পেরিয়ে যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষের অন্তরে যিশুর আসন বিশ্বব্যাপী। যাঁরা তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের পরিমণ্ডল ছাড়িয়ে যিশু হয়ে উঠেছেন মানুষের হৃদয়ের রাজা।

যিশুর জীবন আর মৃত্যুবরণের বিবরণ সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষকে ছাড়া যুগে যুগে আলোড়িত করেছে কবি-চিত্রকর-নাট্যকার-ঔপন্যাসিক-চলচ্চিত্রকার-অভিনেতা আর গবেষক পণ্ডিতদের।

তাঁর যন্ত্রণাভোগের আখ্যান অবলম্বনে মধ্যযুগে ইউরোপের ক্রিশ্চান সমাজে গড়ে উঠেছিল 'প্যাশন প্লে'। জার্মানিতে এ-রকম এক 'প্যাশন প্লে'-এর অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ 'শিশুতীর্থ' লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ২০০০ বছর ধরে চলেছে তাঁর জীবন সম্বন্ধে, জীবনের অন্তিম মুহূর্তগুলি সম্বন্ধে তথ্য আহরণের চেষ্টা। তাঁর জীবনকে বুঝে, উপলব্ধি করে বিশ্লেষণের আর রূপ দেবার বা পুনঃসৃজনের প্রয়াস করে চলেছেন নানা মাধ্যমের শিল্পীরা। এ ব্যাপারে বাইবেলের পুরাতন ও নববিধানের এবং পরবর্তীকালে নানাভাবে উদ্ঘাটিত তথ্যসমূহ ছাড়া শিল্পীদের সম্বল হয়েছে তাঁদের প্রগাঢ় অনুভূতি আর যুগোপযোগী মনন।

বুনুয়েল, পাসোলিনি প্রমুখের পথ ধরে, একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে যিশুর জীবনচরিত চলচ্চিত্রে নতুন করে বর্ণনার চেষ্টা করেছেন হলিউডের তারকাশ্রেষ্ঠ মেল গিবসন। সমস্ত জীবনের ঘটনাক্রমকে সেলুলয়েডে ধরার বদলে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন অন্তিম বারো ঘণ্টায়। অকথ্য ভয়াল নির্যাতন ভোগ করে অবশেষে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যিশুর মৃত্যুবরণের মুহূর্তগুলি তিনি চলচ্চিত্রায়িত করেছেন আর তাই ছবির নাম রেখেছেন 'দ্য প্যাশন অব দ্য ক্রাইস্ট'। বিপথগামী স্বদেশবাসীকে শোধরানোর আর ধর্মের নামে অলীক আচারঅনুষ্ঠানে মত্ত প্রকৃত ধর্মভ্রষ্ট জনসমাজকে সুপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছিলেন যিশু, ভাই সম্বোধন করে তাদের নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তমসা থেকে, সংকীর্ণতা থেকে আলোয় উদ্ভূল বিস্তীর্ণ এক জীবনের পরিসরে। পরিবর্তে সেই জনসমাজের বৃহদংশ ধর্মব্যবসায়ী ক্রুর পুরোহিতমণ্ডলীর প্ররোচনায় উন্মাদ হয়ে যিশুকে দিয়েছিল অবর্ণনীয় মানসিক নিপীড়ন, দিনের পর দিন করেছিল অসম্ভব উপহাস। এতেও ওই ধর্মোন্মাদ পুরোহিতকুল ক্ষান্ত হয়নি। দেশবাসীকে উন্মত্ত করে তুলেছিল যিশুর ওপর। রক্তমাংসের প্রাণবন্ত যিশুকে বধ না করে তারা থামেনি। যিশুর জৈবিক অস্তিত্বটিও হয়ে উঠেছিল তাদের চক্ষুশূল। যে বা যারা আমার বা আমাদের মত মেনে নেয় না, আমাদের ধর্ম বা শাস্ত্র বা মতবাদকে অমান্য করে অন্য রকম চিন্তা-চেতনা-কল্পনার কথা শোনাতে চায়, তাদের অপর জ্ঞান করা, পৃথক করে ফেলা—তারপর মানসিক পীড়ন চালানো আর তাতেও না দমলে দৈহিক অস্তিত্বটুকু নিকেস করে দেওয়ার রীতি চলে আসছে

হাজার হাজার বছর। এ রকম বহু ঘটনার আর শহিদের নাম তুলে আনা যায় ইতিহাস থেকে।

'দ্য প্যাশন্ অব দ্য ক্রাইস্ট' কে আমরা আরও কয়েকটি দিক থেকে দেখার সঙ্গে এ-দিক থেকেও দেখতে পারি, যে একটা বিরুদ্ধ মত ও এক বিপরীত পথের যাত্রীকে ক্ষমতাবান শাস্ত্রান্ধ গোষ্ঠী কীরকম নৃশংসভাবে দমন করে, শাস্তি দেয় আর শেষে হত্যা করে নিশ্চিন্ত হতে চায়। পৃথিবীর ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম কাণ্ড হল যিশুর নিধন। মেল গিবসন এই মর্মান্তিক কাণ্ডের চলচ্চিত্রায়ণ করেছেন কয়েকটি পর্যায়ে। নম্র ক্ষমাশীল করুণাময় যিশুকে গেথসিমানি বাগানে গভীর নিশীথে গোপনে গ্রেপ্তারের থেকে এ চলচ্চিত্রের সূচনা। এখানে আমরা দেখি বিক্ষুব্ধহৃদয় এক যিশুকে—কী এক মর্মযন্ত্রণায় পীড়িত হয়ে ধ্যানের দ্বারা তিনি প্রশান্তি খুঁজছেন। আকুল হয়ে সম্মুখের পথের সন্ধান চাইছেন। এই গোপন আস্তানায় প্রিয় শিষ্য জুডাস বিশ্বাসঘাতকতা করে ইহুদি অভিজাত পুরোহিতগোষ্ঠীর কাছে যিশুকে ধরিয়ে দিল। এবার বিচারের জাঁকজমক, প্রহসন। আসল উদ্দেশ্য ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে যেনতেন প্রকারেণ তাঁকে ক্রুশে ঝুলিয়ে হত্যা করা। জেরুজালেমে রোমের গভর্নর পাইলেটের কাছে তাঁকে বিচারের জন্য আনা হল। ইহুদি পুরোহিতদের নেতৃত্বে উন্মত্ত জনতা যিশুর প্রাণদণ্ড চাইল পাইলেটের কাছে। এ রকম কোনও শাস্তিতে তাঁরা কিছুতেই সন্তুষ্ট হল না। পাইলেট কিন্তু যিশুকে সাক্ষাৎ দেখে এবং কথা বলে সন্তুষ্ট। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী মেনে নিলেন না যে যিশু এমন কোনও মারাত্মক অন্যায় করেছেন যার জন্য তাঁকে চরম দণ্ড দিতে হবে। তাঁরা চেষ্টা করলেন যিশুকে বাঁচাবার। ক্রুদ্ধ জনতাকে খুশি করতে তিনি সৈন্যদের হুকুম দিলেন যিশুকে বেঁধে কশাঘাত করতে। কিন্তু তাতেও ক্ষিপ্ত জনতার খেদ মিটল না। এক প্রকার নিরুপায় হয়েই পাইলেট যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার হুকুম দিলেন। তার আগে তিনি আর একবার চেষ্টা করেছিলেন যিশুকে মুক্তি দেবার। বন্দি অপরাধী বারাববাসকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় কারাগার থেকেজনতার সম্মুখে এনে তাদের বললেন যে তিনি আজ একজন অপরাধীকে মুক্ত করে দিতে পারেন। জনতা বলুক তারা কার মুক্তি চায়—নৃশংস খুনি বারাববাসের না যিশুর? পুরোহিতকুলসহ সকলে সমস্বরে চিৎকার করে জানাল যে তারা বারাববাসেরই মুক্তি চায়। পাইলেট উপায়ান্তর না দেখে বারাববাসকে মুক্তি দিলেন। যিশুকে কাঁটার মুকুট পরানো হল, তাঁর মুখে গায়ে দলাদলা থুতু ছিটোতে আর কখনও কটূক্তি কখনও বা তীব্র উপহাস করতে লাগল সৈন্যরা আর জনতা। তাঁর মাথায় মুখে ছড়ি দিয়ে রক্তাক্ত করতে লাগল । তারপর তাঁর সুঠাম, কিন্তু ক্লান্ত অবসন্ন ইতিপূর্বে বেত্রাঘাতে আর লৌহশলাকায় জর্জরিত দেহের ওপর শক্তপোক্ত কাঠে নির্মিত ভারি বিশাল আকৃতির ক্রুশ চাপিয়ে দিয়ে তাঁকে বয়ে নিয়ে যেতে বলল। শহরের বাইরের গলগাথা নামে বধ্যভূমির দিকে ক্রুশ কাঁধে যিশুর এই মৃত্যুযাত্রার অনুপুঙ্খ চিত্রায়ণ ভুলবার নয়। রোমান সৈন্যদের কশাঘাত, যিশুর কষ্ট দেখে উল্লাস আর জনতার ফুর্তি। এরই মধ্যে কারও কারও চোখে বিষাদের ছায়া, মুখ মলিন হয়ে যায়। গলগাথায় পৌছনোর পর মস্ত মস্ত পেরেক ঠুকে যিশুকে ক্রুশে গেঁথে ফেলা— সে এক হাড়হিম করা দৃশ্য। ক্যামেরা নির্বিকার দৃষ্টিতে যিশুর দু'হাতের তালুর সঙ্গে গজালের মাথায় হাতুড়ি দিয়ে পিটে কাঠের সংযোগ ঘটানোর দৃশ্য দেখাতে থাকে। কীভাবে হাড়মাংস ভেদ করে গজালের হিংস্রমুখ কাঠের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে আর তারপর সৈন্যটি কাঠের উল্টো পিঠে বেরিয়ে থাকা মুখগুলি এবার পুরো ক্রুশটিকে উল্টে হাতুড়ির ঘায়ে বাঁকিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছে আমরা দেখতে পাই। যিশুর হাতের ও পায়ের পাতা থেকে টুপটুপ করে মাংসের টুকরো মেশানো তাজা টকটকে রক্ত ঝরে পড়তে থাকে ধরণীতে। দু'জন সাধারণ চোরের ক্রুশের মাঝখানে স্থাপন করা হয়েছিল যিশুর ক্রুশ। যিশু সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র মহাপুরুষ কি না এই নিয়ে দু'টি চোরের মধ্যে বাক্যবিনিময় হতে থাকে। হঠাৎ কোথা থেকে একটা বীভৎস কাক উড়ে এসে এক চোরের ক্রুশের মাথায় বসে তার চোখ ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে নিতে থাকে । ভর দুপুরে পৃথিবী আকস্মাৎ ঘনঘোর অন্ধকারে ঢেকে যায়, আকাশে ভয়ানক মেঘ জমে, প্রবল তীব্র ঝড় বইতে আর ভূমিকম্প হতে থাকে। এই কঠিন পৃথিবীতে জন্মে এক ক্ষণজন্মা মহাপ্রাণ তাঁর যৌবনের পরম সময়ে নিদারুণ অবিচার অন্যায়-ভন্ডামির শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। এর চেয়ে নিরাশার-হতাশার ঘটনা বোধহয় পৃথিবীতে আর ঘটেনি।

কখনও মহাদুঃখে ম্রিয়মান হয়ে পড়ে আবার কখনও বা আতংকপাণ্ডুর বিস্ফারিত নেত্রে এই ছবি দেখতে দেখতে, দেখে শিউরে উঠতে উঠতে, হৃৎপিণ্ডের রক্ত উথলতে উথলতে বারবার মনে প্রশ্ন জাগে হলিউডের এই মহাতারকা তাঁর নিজের সঞ্চয় জড়ো করে কেন এমন একটি ছবি করতে গেলেন? এমন একটি ছবির বাণিজ্যসম্ভাবনা কি প্রবল হতে পারে? এ-ছবি তো হলিউডের সাম্প্রতিক কোটি কোটি ডলার কামানো বাণিজ্যসফল দুনিয়া কাঁপানো ছবিগুলির ছাঁচে পড়ে না। যিশুর সমগ্র জীবনচরিতও এ ছবির বিষয় নয় যে ক্রিশ্চান-দুনিয়ার ধর্মপ্রাণ মানুষেরা ভক্তিনম্রচিত্তে এ ছবি দেখতে ভিড় করবেন। যিশুর পার্থিব শরীরের ওপর রোমান সৈন্য এবং বিভ্রান্ত ক্ষিপ্ত জনতার নির্যাতনের অন্তিম দৃশ্যগুলির পুনঃসৃজনই হল পরিচালকের উদ্দেশ্য। বাইবেলে বর্ণিত ২০০০ বছর অগের সেই ভয়াল উচ্চণ্ড শারীরিক আঘাত-উৎপীড়নের দৃশ্যের অভিঘাতে আমূল কাঁপিয়ে দিতে চেয়েছেন তিনি আজকের দর্শককে, আজকের দুনিয়াকে। ক্ষমতামত্ত প্রবল ক্রিশ্চান-দুনিয়াকে?

গ্রন্থপাঠে পৃথিবীর মানুষ শতশত বছর ধরে যে হিংস্র নির্যাতনের বিবরণ জেনেছে—চলচ্চিত্রের পর্দায় খুঁটিনাটি সহ তা প্রত্যক্ষ করার জাজ্বল্যমান দৃশ্য দর্শনের অভিঘাত ঢের বেশি, চলচ্চিত্র এ ভাবে দেখাতে পারে। চলচ্চিত্রমাধ্যমের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে মেল গিবসন পৃথিবীকে তা দেখিয়েছেন। ছবির অনেকটা সময় জুড়ে রুপালি পর্দা রক্তে ভেসে গিয়েছে। দণ্ড-দমন-হিংসা আর রক্ত। আর অবশ্যই সেই তেত্রিশ বছরের মহাপ্রাণ ক্ষণজন্মা যুবার অভাবনীয় সহনশক্তি এ ছবির থিম । সত্যের জন্য জীবনপণ করে একজন রক্তমাংসের মানুষ কী পরিমাণ শারীরিক অত্যাচার নীরবে সহ্য করে যেতে পারে ঘন্টার পর ঘন্টা—এ ছবি করা হয়েছে তা দেখানোর জন্য। হিংসার নিষ্ঠুরতার সন্ত্রাসের প্রত্যেকটি রেখা তিনি তুলির আঁচড়ে সেলুলয়েডে এঁকেছেন। কিছুই অতিরিক্ত বলে বাদ দেননি। অভিজাত পুরোহিত সম্প্রদায় আর তাদের আকাঙক্ষাপূরণে নিযুক্ত রাষ্ট্রশক্তি বা প্রশাসন যিশুর শরীরের ওপর যে অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিল—তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দৃশ্যায়িত করেছেন গিবসন—দেখানোর প্রয়োজন নেই বা শিল্পের সংকেতে বুঝিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট বলে মনে করেননি। আমাদের প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। উন্মুক্ত চাতালে এক ছোট স্তম্ভে হাত দু'টি বদ্ধ অবস্থায় যিশুর নগ্নগাত্রে, প্রথমে উন্মুক্ত পৃষ্ঠদেশে তার পরে দ্বিতীয় খেপে উল্টে দিয়ে বুকের ওপর দানবসদৃশ সৈন্যদের কশাঘাতের আর লোহার ধারালো শলাকাযুক্ত কোড়ার আঘাতের ফলে ত্বক ছিন্নবিছিন্ন হয়ে তাঁর সর্বাঙ্গ রুধিরাক্ত হবার দৃশ্য বিভীষিকা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু গিবসন এক অসীম নির্লিপ্তিতে আমাদের এই বিভীষিকার সম্মুখীন করতে চেয়েছেন। পরবর্তী নির্যাতনের ক্রম এবং ক্রুশ কাঁধে বয়ে নিয়ে যাওয়ার যাত্রাপথের সমস্ত পর্বের বীভৎসতার মোক্ষম চিত্রায়ণ এ ছবির সম্পদ।

কেউ কেউ পর্দায় এই ভয়াল হিংসার-নিষ্ঠুরতার-মাংসে লৌহশলাকা আর কপালে কাঁটার মুকুট গেঁথে যাওয়ার ফলে রক্তপাতের দৃশ্যগুলিকে বাড়াবাড়ি বা হিংসার প্রদর্শনী বলে মনে করেছেন। এত হিংসা এত রক্তপাতের দৃশ্যায়ন তাঁরা দেখতে চাননি/চান না। সত্যিই অনেকের মানসিক গঠন হিংসার এই প্রত্যক্ষতা মানতে চাইবে না। তাঁরা শৈল্পিক সংকেত চাইবে। এঁদেরই অনেকে তো হলিউডের, ইউরোপের বা লাতিন আমেরিকার ছবিতে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলা নগ্ন নরনারীর রক্তমাংসের উদ্বেলিত শরীরের উদ্দাম প্রণয়দৃশ্য ও কামনাপূরণের ডিটেল্স চিত্রায়ণ দেখে শিল্পের মুনশিয়ানায় অভিভূত হয়ে যান। মানতে হয় যে কিংবদন্তিপ্রতিম চলচ্চিত্রকারদের অনেক ছবিতে এ রকম নিখুঁত পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃশ্যায়ন অপূর্ব শিল্পসুষমা সৃষ্টি করেছে, অবিস্মরণীয় দৃশ্যের জন্ম দিয়েছে। নির্জন প্রণয়কাতর নগ্ন দু'টি শরীর আর তাদের মিলনপ্রয়াসের আকুতি পর্দায় স্পষ্ট রূপে দেখানো যদি বাহুল্য না হয়ে থাকে বরং অধিকাংশ চলচ্চিত্রমোদীর প্রশংসাই আদায় করে নেয় তবে যিশুর জীবনের অন্তিম বারো ঘন্টার দৃশ্যায়নে হিংসা আর রক্ত বাড়াবাড়ি বলে মনে হবে কেন?

মেল গিবসন বলেছেন তিনি বাইবেলের বিবরণ থেকে এক আঙুলও দূরে সরে যাননি এবং খ্রিস্টধর্মের উচ্চাসন থেকে তার সমর্থন জানানো হয়েছে। তবে কি ইরাকের আবু ঘ্রাইব বন্দিশালায় বন্দি ইরাকি সৈনিকদের ওপর ইরাকে শান্তিস্থাপনার্থে আগত বিদেশি বাহিনীর অকথ্য ও বিচিত্র শারীরিক অত্যাচারের যে ফোটোগ্রাফ গুলি বিশ্বময় প্রদর্শিত বা মুদ্রিত হয়েছে সেই পৈশাচিক নিষ্ঠুর হিংসা প্রদর্শনের বা মানবজাতিকে প্রত্যক্ষ করানোর কোনও প্রয়োজন নেই? 'দ্য প্যাশন অব দ্য ক্রাইস্ট'—এর হিংসা, বীভৎসতা, রক্তপাত আর বিভীষিকা মানুষের ইতিহাসের এমন অনেক দুঃস্বপ্নের পর্বকে আমাদের মনে পড়িয়ে দেয়। যেখানে যিশুর মতো কোনও ব্যক্তিমানুষই শুধু নন, কোনও জনগোষ্ঠী বা সমষ্টিকে ভয়াল দৈহিক নির্যাতনের পর চিরতরে বিনষ্ট করা হয়েছিল। যেমন ফাসিস্টদের দ্বারা ইহুদি নিধন, বিরোধী উৎসাদন, লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন একনায়কতন্ত্রী মিলিটারি শাসনাধীন দেশে বিরোধীদের খতম, খণ্ডবিখণ্ড যুগোশ্লভিয়ায় এথনিক ক্লিনজিং, দু'বছর আগের গুজরাতের গণহত্যা আর এ-বছর আবু ঘ্রাইব জেলে যুদ্ধবন্দি ইরাকি সৈন্যদের ওপর বিদেশি বাহিনীর উদ্ভাবনী কুশলী নির্যাতন।

ছবিটির সাফল্যের পিছনে পরিচালকের প্রধান সহায় যিশু চরিত্রে জেমস ক্যাভিজেলের অভিনয় আর পোশাকেআশাকে সাজসজ্জায় উপকরণে সেট নির্মাণে ইতিহাসকে জীবন্ত করে তোলার পারদর্শিতা। বাইবেলে বর্ণিত

সেই কালটি আমরা চাক্ষুষ করতে পারি। জনতার দৃশ্যগুলিও ছবিটিকে জীবন্ত করে তোলার বড় সহায়ক। এ ছাড়া ঘটমান বারো ঘণ্টার মধ্যে উপযুক্ত মুহূর্তে যিশুর অতীত জীবনের নানা টুকরো ঘটনার সংস্থাপন ছবিটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ফ্ল্যাশব্যাক হল যিশুর ক্রুশ কাঁধে গলগাথা যাত্রাপথে শ্রমে-ক্লান্তিতে তিনি যখন ভেঙে পড়ছেন তাঁর শৈশবের একটি দৃশ্য ভেসে আসে। যেখানে বেথলেহেমের রাস্তায় শিশু যিশু টমমল পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ছে আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে—ওকে ধরতে ছুটে যাচ্ছে মা মেরি। এই যে মৃত্যুপথযাত্রী একটি মানুষের যন্ত্রণা ভোগের দৃশ্যের মধ্যে তার মধুর শৈশবের মাতৃস্নেহসিক্ত একটি দৃশ্যের অবতারণা—পরিচালকের কল্পনাশক্তির নৈপুণ্যে এ রকম অনেক দৃশ্যই উজ্জ্বল।

সংবাদমাধ্যমে নিজেকে ধর্মভীরু একনিষ্ঠ রোমান ক্যাথলিক হিসাবে ঘোষণা করে গিবসন বলেছেন: "This is a movie about love, hope, faith and forgiveness, It's time to get back to that basic message. The world has gone nuts. We could all use a little more love, faith, hope and forgiveness." গিবসনের ছবিটিকে অবলম্বন করে আজ তাঁর স্বদেশের তাঁর এই কথাগুলি মনে রাখা, মনে রেখে কাজ করার বড় বেশি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

একটি নিবেদন

চতুরঙ্গের গত সংখ্যায় (বর্ষ ৬৩ সংখ্যা ১-২) সুখরঞ্জন সেনগুপ্তর 'ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়'-এ শঙ্খ ঘোষের বিখ্যাত কবিতা 'যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে' উল্লেখ করেছিলেন লেখক (পৃঃ ৩৯)। প্রসঙ্গক্রমে সুখরঞ্জনবাবু লিখেছিলেন "কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল সে সময়কার 'পরিচয়'—এর কোনও একটি সংখ্যায়। কবিতাটি লিখেছিলেন চিত্তপ্রিয় ঘোষ। পরবর্তীকালে তিনি হয়েছিলেন 'শঙ্খ ঘোষ' নামের এক অপ্রতিরোধ্য কাব্যপ্রতিভা।"

এই অংশটি পাঠ করে শ্রীশঙ্খ ঘোষ আমাদের জানিয়েছেন যে তিনি নিয়মিত আগ্রহভরে সুখরঞ্জনের এই স্মৃতিচারণটি পড়ছেন। তিনি জানিয়েছেন যে তিনি কখনওই চিত্তপ্রিয় ঘোষ নামে কবিতা লেখেননি। পরিচয় পত্রিকায় কবিতাটি শঙ্খ ঘোষ নামেই প্রকাশিত হয়েছিল। সুখরঞ্জন তাঁর সহপাঠী বন্ধু বলে পোশাকি নাম চিত্তপ্রিয়টাই মনে রেখেছেন। ডাকনাম শঙ্খ ঘোষের কথা ভুলে গেছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে কবিতা লেখার প্রথমাবধি সর্বত্রই তিনি তাঁর ডাকনামের ব্যবহার করে আসছেন।

ইতিমধ্যে 'ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়' অসংখ্য পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে বলে আমরা কবির দেওয়া এই তথ্যটি সকলের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখলাম।

সম্পাদক ঃ চতুরঙ্গ

স্মরণে

এক অনুতাপহীন হৃদয়বান কমিউনিস্ট

প্রণব বিশ্বাস

নিজেকে বলতেন 'অনুতাপহীন কমিউনিস্ট'। বলার জন্য বলতেন এমন তো নয়, ভেতরের একটা গভীর বিশ্বাস থেকেই উঠে আসত তাঁর এই উচ্চারণ। তীব্র শারীরিক কষ্ট নিয়ে হাসপাতালের বিছানায় যখন শুয়ে তখনও কথা বলছিলেন নানান বিষয়ে—রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধীর প্রসঙ্গ আসছিল বারেবারেই ঘুরে ফিরে, তাঁর কণ্ঠ আর উচ্চারণের অবেগ বুঝিয়ে দিচ্ছিল 'এই দুই পুরুষোত্তম' তাঁর মনের কোন গহনে অবস্থান করেন, আসছিল জওহরলাল নেহরুর কথা, হঠাৎ-ই কখনও বা বলেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কথা, বন্ধু আবু সয়ীদ আইয়ুব আর বিষ্ণু দের কথা, অনুজ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ।এরই মধ্যে প্রত্যয়ী কণ্ঠে কখনও কোনও প্রসঙ্গের উপসংহার টেনেছেন এই বলে 'আমি তো পার্টিজান'।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পার্টিতে এসেছিলেন ১৯৩৬-এ। ব্রিটিশ ভারতে পার্টি তখন বেআইনি। পি.সি যোশির আহ্বানে সেদিন যে আন্তরিকতার সুর বেজেছিল তাকে অমান্য করা বুঝি ছিল অসম্ভব। ঝুঁকি ছিল তবু খুশি মনেই তিনি পার্টিতে এসেছিলেন। সদস্য হয়েছিলেন Communist Party of India—Section of third (Communist) International-এর। তারপর ২০০৪-এর ৩০ জুলাই জীবনান্তের দিন পর্যন্ত তিনি রয়ে গেলেন সেই পার্টিতে—পার্টির একজন একনিষ্ঠ সদস্য হয়ে। লেনিনের পার্টির সদস্য হয়ে ১৯৩৬-এ যে গৌরবে তিনি আপ্লুত ছিলেন গত আটষট্টি বছর ধরে সে গৌরবকে তিনি লালন করেছেন অতি যত্নে, স্নেহে ও মমতায়। হীরেন্দ্রনাথ যখন পার্টিজানশিপের কথা বলেন তখন প্রশ্ন জাগে তাঁর সেই পার্টি কি নিছকই কোনও একটা দল, দিন আনি দিন খাই কোনও রাজনীতির দলের কাছেই কি তাঁর আনুগত্য? তাঁর প্রজ্ঞাবৃত মনন, তাঁর গভীর সংবেদী মন আর হাজারো প্রশ্নে জর্জরিত হওয়ার স্বভাব-এর কথা মনে রাখলে হয়ত বলা যায় দলীয় আনুগত্যের বাইরেও তাঁর 'পার্টি' আসলে মার্কসের সেই কথারই অনুসারী—মার্কস একবার লিখেছিলেন না 'পার্টি ইজাদি গ্রান্ড হিস্টোরিকাল সেন্স অফ দি টার্ম'—হীরেন্দ্রনাথ কথাটা কত সূত্রে কতবারই না বলেছেন। এক মহতী ঐতিহাসিক বোধ, শুভবুদ্ধি ও মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণচিন্তাই তো তাঁর পথপ্রদর্শক।

গত আটষট্টি বছরে ইতিহাস তার গতিমুখ পাল্টেছে বারেবার। ইতিহাসের ছাত্র তিনি, তিনি প্রবল প্রত্যাশা আর গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন ইতিহাসের এই বাস্তবকে। অনেক স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের পর্যায়কে অতিক্রম করে। অনেক ভাঙা-গড়া, চড়াই-উৎরাই-এর পথ পেরিয়ে, এমনকী তাঁর দ্বিতীয় স্বদেশভূমি সোভিয়েত-রাশিয়ার ভেঙে গুড়িয়ে যাওয়া, পূর্ব ইউরোপের দেশে দেশে সমাজবাদী রাষ্ট্র কাঠামোর নির্মম অবলুপ্তি, নিজের দেশে নিজের পার্টির ভেঙে দু'টুকরো হওয়া ও পরে বহু টুকরোয় বিভাজিত হওয়ার তীব্র মনোবেদনাকে অন্তরের গভীরে বহন করেও শেষপর্যন্ত তিনি একজন প্রত্যয়ী পথিক। মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার অপরাজেয়তায় একান্ত আস্থাশীল বলেই কি শেষ পর্যন্ত অটুট থাকে তাঁর এই বিশ্বাস? তাই কি হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়েও বলতে পারেন চিত্তের নৈরাশ্যকে সংকল্পের আশাবাদের জোরে অতিক্রম করে যাওয়ার কথা?

হীরেন্দ্রনাথ মার্কসবাদকে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন তার সামগ্রিকতার মধ্য দিয়ে। তাই বোধহয় তিনি অনায়াসেই ভারতীয় চেতনা ও দর্শনকে সাঙ্গীভূত করতে চেয়েছেন এই সামগ্রিকতার আলোয়। এই দুই সামগ্রিকতার একটা মিল খুঁজতে খুঁজতেই যেন তাঁর সাতানব্বই বছরের ব্যাপ্ত জীবনের পথচলা। মার্কস ও গান্ধী এই 'দু'জনের মধ্যে প্রভেদ যে সুগভীর তাতে সন্দেহ নেই' জেনেও তাঁর অন্বেষার ফসল 'ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ প্রকাশ সাম্রাজ্যবাদ'—এ হল লেনিনের সংজ্ঞা। আর মার্কসীয় চিন্তা সম্পর্কে ধারণা বিনাই মহাত্মা গান্ধীর মুখ থেকে যেন শুনি, 'ধনতন্ত্রের লজ্জা ক্লেদ আর অমানুষিকতা' বিষয়ে মার্কসের ধিক্কার। এ-ভাবেই একটা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে মার্কসবাদ, ধর্ম, দেশীয় মনীষার বিশ্লেষণ করতে করতেই তাঁর পথচলা। তাঁর বীক্ষা ও অভিমতের সঙ্গে ছকে বাঁধাবুলির মিল হওয়া স্বাভাবিকও নয়, সম্ভবও নয়। যিনি লক্ষ্যে স্থির, গ্রহণ বর্জনের ক্ষেত্রে উদার আর সমীকরণের ব্যাপারে স্থিতপ্রজ্ঞ, তাঁকে বুঝতে

গেলে এ-দেশের অসম বিকাশজনিত জীবনের অপূর্ণতাকে যেমন বুঝতে হয় তেমনই ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিকতার পথে প্রকীর্ণ সৎ ও অসৎ উপকরণ ও উপমার সন্ধান করতে হয়। সেজন্য প্রয়োজন অঘেয় মনের যে অন্বেষাকে সারাজীবন ধরে বহু যত্নে তিনি প্রতিপালন করে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের 'সার্বভৌম কবি' ব্যক্তিত্বের ওপর তাঁর অপার নির্ভরতা শুধু যে তাঁর বিভিন্ন সময়ে লেখা রচনা কিংবা গোটা একটা বই 'Himself A True Poem' গ্রন্থেই বিধৃত রয়েছে এমন নয় বরং প্রতিমুহূর্তের আলাপচারিতায় তাঁর সমস্ত ক্ষণের চিন্তাচর্চার মধ্যেও তা ছিল মূর্ত।

তাঁর মধ্যে মানবিকতার যে উৎসার আবেগ ও যুক্তির ওপর ভর দিয়ে চলেছে তা-ও লক্ষ করলে দেখা যাবে রবীন্দ্র উত্তরাধিকারেরই ফসল। ধর্ম-বিষয়ে মুক্তমনের বিচারপদ্ধতি রবীন্দ্রচিন্তার সঙ্গে মিলে মার্কসীয় বিজ্ঞানচেতনার আলোয় সমৃদ্ধ। ধর্মের ব্যাখ্যায় তাই নতুন একটি মাত্রা তিনি অনায়াসে যোগ করে দিতে পারেন। দেশজ পরম্পরাকে তার লোকায়তিক ব্যঞ্জনায় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিতরে ওপর অনায়াসে দাঁড় করিয়ে দেবার অনেক সাক্ষ্য আমরা তাঁর রচনায় খুঁজে পেতে পারি।

মার্কসবাদের অন্তর্গত দর্শন ও আর্থবীক্ষা বিষয়ে অটুট আস্থা তাঁকে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিজয়ে কেবল অভিভূত নয়, করে উল্লসিত। আবার সোভিয়েতসহ পূর্ব-ইউরোপের সমাজবাদী রাষ্ট্রসমূহের বিপর্যয়ে তাঁকে আক্ষরিক অর্থেই ভেঙে পড়তে দেখি। সমাজতন্ত্রের এই আপাত-পরাজয় তাঁর মনে গভীর হৃদয়ক্ষত তৈরি করে দেয়। হীরেন্দ্রনাথের মননযাত্রায় বিশ্বপরিক্রমা যেমন অনায়াসে ধরা পড়েছে তেমনই অবলীলায় স্বদেশজিজ্ঞাসাও স্থান করে নিয়েছে। স্বদেশজিজ্ঞাসু এই মানুষটি আজীবন ভারতীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরার কাছেনতজানু মূলগত প্রত্যয়ে স্থিত থেকে।

অনেক আগে একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন—

'রাজনীতি ক্ষেত্রে বহু ব্রেদ লক্ষ করতে বাধ্য হই বলে হয়তো একথা বলছি, কিন্তু না বলে পারি না যে, সত্য, শিব, সুন্দর প্রভৃতি বাক্য আমাদের বিপ্লবী শব্দকোষে যেন অবহেলিত না হয়ে থাকে—ভালো হওয়া, ভালো কাজ করা, নিজের গর্ব নিজের কাছে রেখেই যথাসম্ভব নিঃস্বার্থ ভাবে অপরের কল্যাণসাধনে নিরত থাকা। এই সাধারণ সহজ কথাগুলির বিপুল মূল্য যেন বিস্মৃত না হই। উপনিষদের ভাষায় যদি কেউ আশীর্বাদ করেন—"সত্যংবদ, ধর্মংচর"—তখন মন ভরে ওঠে। এ ধরনের কথায় হয়তো আছে সেই বস্তু যাকে তিনশো বছরেরও বেশি আগে আচবিশপ Lond বলেছিলেন "the beauty of Holiness"। মার্কসবাদীরা যদি আমাদের দেশের সাধুসন্তদের নিয়ে জানবার ও ভাববার মতো দামি কিছু লেখেন তো ভারি খুশি হতে পারি—তিরুভল্লুভর, জ্ঞানেশ্বর থেকে কবীর, রামানন্দ, নানক, চৈতন্য, রবিদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতির কথা ভালো করে জানা চাই। কেন আজো হিন্দীভাষী জগতে তুলসীদাস কৃত 'রামচরিত মানস'-এর অপরিমিত মর্যাদা তা বুঝলে নিশ্চয়ই উপকার হবে। এই সাধুসন্তদের দল যেভাবে হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ নির্বিশেষে সকলকে কাছে টেনেছেন, তা বিপ্লবের বাঁধা রাস্তা থেকে দূরে অবস্থিত হয়েও তো অল্পমূল্য নয়। জীবনকে কথঞ্চিৎ অস্বীকার করবার যে-ঝোঁক আমাদের দেশের মানসে লক্ষ করা যায় তার সমাজগত ভিত্তির সন্ধানও তো মনে আবেগ সৃষ্টি করতে পারবে। হৃদয়ের যে অতৃপ্তি বিনা অপরকে হৃদয় দেওয়া যায় না, সেই অতৃপ্তির অনুভূতি কি আমাদের বাস্তবিকই আছে?'

'অতৃপ্তির এই অনুভূতি' একদিকে যেমন ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে তাঁকে অন্যদিকে তাঁর গভীর হৃদয়সংবেদী মন মানুষের ছোটবাটো সুখদুঃখেও আলোড়িত হয়েছে বারবার।

হীরেন্দ্রনাথের সংবেদনার খবর নিয়ে খবরের কাগজের কোনও কলমচি কখনও লেখেননি সত্য কিন্তু যাঁরা তাঁকে চিনতেন, তাঁরাই জানেন কত তুচ্ছ ঘটনাতেও কী অসম্ভব বিচলিত বোধ করতেন তিনি। এমন অস্থির মুহূর্তে তাঁকে যাঁরা দেখেছেন, মনে হয় সে স্মৃতি তাঁরা সহজে ভুলবেন না। ঘেষচাপা পড়ে শিশুশ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা বা এরকম আরও কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর লেখনী অনেক সময় ক্ষুরধার হয়েছে। কিন্তু অতি সম্প্রতি যে হাউসিং কমপ্লেক্সে তিনি থাকতেন সেখানে নিরীহ কুকুরদের উৎপীড়নের ঘটনা যখন ঘটছিল, বা শহর জুড়ে গাড়ির রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য গাছ কাটার যে মহাসমারোহ চলছে তার খবরে তাঁর বিচলনের, মনোবেদনার খবর আমরা ক'জন রেখেছি। একটা প্রবন্ধে বেশ কয়েক বছর আগে তিনি সখেদে লিখেছিলেন

'আমরা গাছের নাম জানি না। ফুলের নাম জানি না, পাখির নাম জানি না;না জানার দুঃখও আমরা বড়ো একটা রাখি না।... মানুষের খোঁজই আমরা রাখি না তখন আর "অন্যে পরে কা কথা"।'

হীরেন্দ্রনাথের প্রজ্ঞাবৃত মন ও মননের সঠিক সন্ধান সম্ভবত আমরা কখনওই করিনি। শেষদিকে তাঁর একটা আক্ষেপ ছিল যে কেউ তাঁর কথা মন দিয়ে শোনে না। যে, গভীরতায় তিনি ভাবতেন, যে, মমতায় তিনি অনুভব করতেন, যে, সহৃদয়তায় তিনি উপলব্ধি করতেন তার সুলুকসন্ধান হয়ত সহজ না। শেষ পর্যন্ত বোধ হয় তিনি একজন 'মিস আন্ডারস্টুড পার্সোনালিটি'।

জওহরলাল একবার একটা চিঠিতে ওঁকে লিখেছিলেন, 'You being sensetive suffer more,' সংবেদনার এই যন্ত্রণা তাঁকে শেষদিন পর্যন্ত বহন করতে হল।

হীরেন্দ্রনাথ নেই। কিন্তু এখনও আমার চোখে লেগে আছে তাঁর সেই উজ্জ্বল হাসি, অনেক সময় সেই হাসিকে মনে হত শিশুর দেয়ালা। সেই আশ্চর্য সুন্দর হাসি আমাদের উজ্জীবিত করতে থাকুক। তাঁকে আমাদের প্রণতি।

মানুষ বিলায়েৎ খাঁ এবং ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ

অতনুশাসন মুখোপাধ্যায়

ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ এ বছরের মার্চ মাসে গত হলেন। ভারতবর্ষের সংগীত জগতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এখন কিংবদন্তি। সমালোচকদের অনেকের ধারণা কোনও বড় মাপের মানুষের কর্মকাণ্ডের যথার্থ মূল্যায়ন করতে হলে সেই ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে জানাশোনা বিশেষ কাজে আসে। যেমন রবীন্দ্রচরিত্র বিশ্লেষণ থেকেই ধারণা জন্মায় প্রথাগত শিক্ষার বাইরে শিক্ষা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা অথবা ব্রহ্মচর্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার তাগিদ স্কুল-পালানো বালক রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের মধ্যেই শিকড় গেড়েছিল। একই রকম ভাবে ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ সেতারে যে নিজস্ব স্টাইল তৈরি করেছিলেন যা তাঁর পিতামহ ইমদাদ খাঁর বাদন থেকে এবং তাঁর পিতা এনায়েৎ খাঁর বাদন থেকেও ভিন্ন শৈলীর, তার কারণ খুঁজতে গেলে বিলায়েৎ খাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটু ভাবতে হয়।

শিল্পী হিসাবে বিলায়েৎ খাঁর ব্যক্তিত্ব

ইমদাদ খাঁ সেতারে ঠুংরির সুর বাজাতেন না, কিন্তু এনায়েৎ খাঁ ঠুংরি বাজাতেন। অর্থাৎ ছোট বয়সেই এক সময় বিলায়েৎ বুঝতে শিখলেন তাঁর পিতা নিজের পিতার বাজনার বাইরে কিছু স্বাধীনতা ভোগ করতে চেয়েছেন। অবশ্যম্ভাবী ফল যা হবার তাই হল। বিলায়েৎ পিতামহ ইমদাদ খাঁর ঘরানা ছাড়িয়ে পিতা এনায়েৎ খাঁর বাদনবৈশিষ্ট্য ছাড়িয়ে এক নতুন আলোর ঝর্ণাধারায় সিক্ত হয়ে তাঁর সেতারে ঝঙ্কার তুললেন। সেখানে কণ্ঠসংগীতের অলঙ্কার, মুড়কি, গমক, তান সংযোজিত হল। তান দীর্ঘায়ত হল এবং সেই তান ফুটিয়ে তুলতে ছয় তারের সেতার তৈরি হল। ইমদাদ খাঁ, এনায়েৎ খাঁর ঘরানায় বিলায়েৎ যেটা করে বসলেন তার ফল হল এই, এ ঘরানায় এক নতুন বিলায়েতি স্টাইল বা সংগীতজগতের পরিচিত ভাষায় বিলায়েতিবাজ প্রতিষ্ঠিত হল এবং বাস্তব পরিস্থিতিটা হয়ে দাঁড়াল এমনই যে ইমদাদ খাঁর ঘরানা অনুসরণকারী হিসাবে পরিচিত বিলায়েৎ-পরবর্তী কোনও বাদকের পক্ষেই এই মুহূর্তেবিলায়েতকে ছাড়িয়ে বেশি দূর যাওয়াটা দুরূহ হয়ে পড়ল।

শুধু সেতারবাদক বা সরোদিয়ারাই বিলায়েতকে অনুসরণ করেছেন তাই নয়। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে এ যুগের বহু নামি কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী মুড়কি, গমকের সঙ্গে দ্রুত গতির তান মিশিয়ে এবং রেগ রেগ, গম গম, মপ মপ, পধ পধ ইত্যাদি জমজমাট চালচিত্রে খেয়ালের বিলম্বিত অংশে প্রায়ই বিলায়েৎ খাঁর জোড় পর্যায়ের অনুসারী হন।

বিলায়েতিবাজ ব্যাপারটা কীরকম? এক কথায়, অত্যন্ত বিদগ্ধ, কুশলী বাজিয়ের কাঁধে নান্দনিক সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার দায় অব্যর্থ ভাবে চাপিয়ে দিলে যে ফল বেরিয়ে আসে সে রকম একটা কিছু। বিলায়েৎ খাঁর মধ্যে বলাই বাহুল্য, এই দুই গুণের সার্থক সংমিশ্রণ ঘটেছিল। রাত্রি প্রথম প্রহরের রাগ থেকে শুরু করে গভীর রাতে প্রযোজ্য যে কোনও রাগেই তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। আবার সূর্যোদয়কালে তিনি যখন দিনের প্রথম প্রহরের রাগ বাজিয়েছেন, শ্রোতা পাগল হয়ে গেছে। সভায় অনুষ্ঠানে বেশির ভাগ সময়েই বিলায়েৎ যে সব রাগ উপহার দিয়েছেন, সেগুলো পূর্বাঙ্গের রাগ। তাঁর হাতে পূর্বাঙ্গের রাগগুলো প্রকৃতই সজীব হয়ে উঠত। তাঁর মধ্যে এমন নতুন কিছু ছিল যা সবার বাজনা থেকে বেরয়নি। এই নতুনত্ব সৃষ্টির পিছনের কারণ খুঁজতে বিলায়েতের সচেতন শিল্পীসত্তার দিকে তাকিয়ে দেখতে হয়।

অহম্‌বোধসম্পন্ন বিলায়েৎ খাঁর সচেতন শিল্পীসত্তা

বিলায়েৎ খাঁ আর পাঁচজন শিল্পীর থেকে কিছু আলাদা ছিলেন। তাঁর এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যেখানে 'অহম্' ব্যাপারটা নিষ্প্রভ তো নয়ই বরং তাঁর আচারে ব্যবহারে মাঝে মধ্যে একটা অহমিকা প্রকাশ পেত—এ রকম একটা ধারণাও করা যেতে পারে। অর্থাৎ তাঁর আচারে ব্যবহারে বিলায়েতি স্টাইলটা সব সময়ই উচ্চকিত থাকত। যৌবনে বিলায়েৎ খালাপর্বে ঝড়ের গতিতে বাজাতে পছন্দ করতেন স্রেফ লোককে তাক লাগিয়ে দেবার জন্য। অন্য ওস্তাদের সঙ্গে বাজাতে বসে তাকে গতিতে পরাস্ত করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার প্রয়াস, অথবা বিখ্যাত তবলিয়াকে দু'আঙুলে বাজিয়ে তার সঙ্গে টক্কর দেবার প্রকাশ্য আহ্বান জানানো ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁর অহমিকারই প্রকাশ—এতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুরমাধুর্যের অন্দরমহলে যতই আরও বেশি প্রবেশ করতে থাকেন যৌবনের এই উচ্ছলতাও ততই কমতে থাকে।

জি ডি বিড়লা সভাগৃহে বিলায়েৎ খাঁর স্মরণসভায় তাঁর দীর্ঘদিনের সঙ্গী এবং শিষ্য অরবিন্দ পারেখের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় বিলায়েৎ খাঁ ভাল সাঁতার কাটতে পারতেন, ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসতেন এবং সেতারবাদনে যতটা খুঁতখুঁতে ছিলেন ঠিক ততটাই ছিলেন নিজের জন্য গাড়ি নির্বাচনে। বিলায়েৎ খাঁর ভাই ওস্তাদ ইমরাত খাঁর পুত্র ওস্তাদ ওয়াজাহাত খাঁর খবরের কাগজে প্রকাশিত বিবৃতি থেকে জানা যায় এক সময়কার প্রগাঢ় ভ্রাতৃবন্ধনে জড়িয়ে থাকা বিলায়েৎ এবং ইমরাত খাঁর মধ্যে গত পাঁচ বছর বাক্যালাপের সম্পর্ক ছিল না। অরবিন্দ পারেখ এবং ওয়াজাহাত খাঁর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটুকু অনুমান করতে বোধ হয় অসুবিধা হয় না বিলায়েৎ খাঁ মানুষ হিসাবে তেমন একটা আপনভোলা সাধুসন্তগোছের ছিলেন না, বরং তাঁর পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে যথেষ্টই সচেতন ছিলেন। তা হলে একটা যে প্রচলিত ধারণা আছে সংগীতের উচ্চসোপানে আরোহন করেন যে শিল্পী, তিনি আর পাঁচজনের থেকে আলাদা উচ্চতর কোনও মার্গে বিচরণ করেন বিলায়েৎ সেই প্রচলিত নিয়মটা ভাঙলেন কীভাবে? এক কথায় এর উত্তর হয়ত দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এ কথাটা বোধহয় মেনে নেওয়া যেতে পারে, ব্যক্তিগত জীবনের বহু ক্ষেত্রে প্রতিটি খুঁটিনাটি যেমন ছিল তাঁর বিচার্য, বাজনার ক্ষেত্রেও সুরের প্রতিটি টান তাঁর খুঁটিনাটি বিচারের পর্যায় অতিক্রম করে তবেই প্রকাশিত হতে পারত। সেখানে রাগের রূপ বা নান্দনিকতার গুরুত্ব যতটা, শ্রোতার কান বা শ্রোতার তৃপ্তি ব্যাপারটাও ছিল ততটাই প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ উপস্থাপক হিসাবে বিলায়েৎ খাঁ ছিলেন অতিমাত্রায় সচেতন। আরও বুঝিয়ে বলতে গেলে তথাকথিত সাধুসন্ত মনোভাবাপন্ন আত্মমগ্ন শিল্পী নিজের রুচি মতো সুরসৃষ্টি করে তাঁর সাধনকর্ম সম্পন্ন করার তৃপ্তি পেতে পারেন, শ্রোতার দিকে তাকিয়ে দেখার তেমন কিছু দায় তাঁর না নিলেও চলে। হয়তবা সে দায় নেবার বাস্তব পথও তাঁর পক্ষে সুগম নয়। কিন্তু বিলায়েৎ খাঁ তুলনায় অনেক ধাপ এগিয়ে রয়েছেন। তাঁর অন্তরের সুর আর শ্রোতার পক্ষে সুখশ্রাব্যতা এই দু'য়ের মধ্যে তিনি সেতুবন্ধন করতে জানেন, কারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তিনি আত্মবিস্মৃত নন, তিনি ভাবের মাত্রা এবং তার বাহ্যিক প্রয়োগ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন এবং অনুভূতিপ্রবণ।

কণ্ঠসংগীতের প্রতি দুর্বলতা

সম্ভবত এখান থেকেই কৌতূহল উঠে আসে সেতার বাজাতে বসে প্রায়ই তিনি গান গাইতেন কেন। যে বন্দিশ গেয়ে শোনাতেন সেটাই পরমুহূর্তে অবিকল সেতারে তুলতেন। গান না গেয়ে শুধু সেতার বাজিয়ে শোনাকে কী অসুবিধা ছিল? বিলায়েৎ খাঁ নিশ্চয়ই এমন নামজাদা কণ্ঠসংগীতশিল্পী ছিলেন না যে শ্রোতা শুধুমাত্র তাঁর সেতারবাদনে তৃপ্ত না থেকে তাঁর গাননেরও প্রত্যাশী হয়ে থাকতা তাহলে গান গাওয়া কেন? অনুমান করা যেতে পারে, বিলায়েৎ শ্রোতাকে তাঁর ভিতরের সুরের আবেগটার হদিশ দিতে আগ্রহী ছিলেন। কণ্ঠসংগীতের যে মস্ত একটা যাদু আছে সে কথাটা বোধহয় বিলায়েতের ভাল মতো উপলব্ধ হত। ১৯৩৮ সালে এনায়েৎ খাঁ যখন মারা যান বিলায়েৎ তখন মাত্র এগারো বছরের বালক। এরপর একদল কণ্ঠসংগীত শিল্পীর তত্ত্বাবধানে বিলায়েতের শিক্ষা চলতে থাকে যাঁদের মধ্যে ছিলেন মতামহ ওস্তাদ বন্দে হোসেন খান, মামা জিন্দা হোসেন এবং কাকা ওয়াহিদ খান। বিলায়েৎ খাঁর গায়কিঙ্গেও সেতারবাদন খুব সম্ভব এই কণ্ঠসংগীত শিল্পীদের প্রভাবে। পরবর্তীকালে আগ্রা ঘরানার ফৈয়াজ খাঁর গুরুগম্ভীর গমক, কিরানা ঘরানার আবদুল করিম খানের সূক্ষ্ম কাজ, বড়ে গোলাম আলির পাতিয়ালা ঘরানার তানবৈচিত্র্য এবং আত্মীয় আমির খাঁর বন্দিশের শৈলী বিলায়েতের ভাষায় বলা হয় আশ, এ ছাড়া সাপট তান, একহারা তান এবং ছুট তান বিলায়েতের বাজনায় শোনা যেত। ফলে সেতার হাতে থাকলেও বিলায়েতের বুকের ভিতরে হয়ত সব সময়ই তাঁর কণ্ঠসংগীত শিল্পীসত্তা নাড়া দিতে থাকত। তারই সামান্য বহিঃপ্রকাশ গানের মধ্য দিয়ে

ঘটিয়ে অতঃপর সেতারের সুরঝঙ্কারে তার বিস্তৃতি ঘটিয়ে বিলায়েৎ সম্ভবত তাঁর সুরের আবেগের সঙ্গে শ্রোতার কানের যোগসূত্র স্থাপনে প্রয়াসী হতেন। হয়ত এই কণ্ঠসংগীতের আবেগের প্রাবল্যই ষড়জ-পঞ্চ মের সেতার বাদ দিয়ে তাঁকে গান্ধার-পঞ্চ মের সেতার সৃষ্টির দিকে প্রবৃত্ত করেছিল।

কণ্ঠসংগীত অভ্যাস বা পরিবেশনে তানপুরার অপরিসীম গুরুত্বের কথা বলার প্রয়োজন নেই। চার তারের সচরাচর ব্যবহৃত তানপুরায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় জুড়ির তার ছাড়া প্রথম তারটি মন্দ্র-পঞ্চ মে এবং চতুর্থ তারটি মন্দ্রষড়জে বাঁধা হয়। পঞ্চ ম বর্জিত রাগে প্রথম তারটি মন্দ্র-মধ্যমে মেলনো হয়। তানপুরা ঠিক ঠিক সুরে মেলাতে পারলে মন্দ্র-ষড়জের তার থেকে গান্ধার স্বর স্পষ্ট ভেসে আসে। এই গান্ধার স্বরের পরিচিতি "স্বয়ম্ভু গান্ধার" হিসাবে। কণ্ঠসংগীতের গুণী শিল্পীর কানে স্বয়ম্ভু গান্ধারের উপস্থিতি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বিলায়েৎ খাঁর শিল্পীসত্তার যে ভাগ অবিবত তাঁর বুকের ভিতর কণ্ঠসংগীতের মূর্ছনার ঢেউ তুলত হয়ত তারই প্রেরণায় তিনি গান্ধার-পঞ্চ মের সেতার সৃষ্টি করেছিলেন। শুদ্ধ গান্ধারযুক্ত রাগে তাই প্রত্যেকটি স্ট্রোকে জুড়ি আর পঞ্চ মের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর সেতারে যে গান্ধার স্বরকে স্পষ্টভাবে পেতেন মনে হয় কণ্ঠসংগীতপ্রেমী সেতারি বিলায়েৎ সেই সুরমণ্ডলের মোহে বাড়তি শক্তি পেয়ে যেতেন। এই ভাবেই বিলায়েৎ প্রথম তাঁর মেজাজটাকে সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তার পর শ্রোতার মন জয় করার নতুন একটা পথ আবিষ্কার করেছিলেন অনুমান করা যায়। বলা বাহুল্য বিলায়েৎ খাঁ মানুষটা আর পাঁচজনের থেকে বেশি আত্মসচেতন না হলে সেই আত্মসচেতনতার এমন একটা ইতিবাচক ফলশ্রুতিও অনুপস্থিত থাকতে পারত। শ্রোতার কাছে সেটা হয়ত হয়ে দাঁড়াত এক অভাবিত অজানা অধ্যায়।

রাগসৌষ্ঠব ও স্বেচ্ছাচার

একটা পুরনো প্রশ্ন, হিন্দুস্থানি রাগসংগীতে ভাব ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজনবোধে রাগরূপ রক্ষা করার ব্যাপারে শিল্পী কতটা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেন? পাশ্চাত্য মার্গসংগীতের তুলনায় ভারতীয় রাগসংগীতে শিল্পীর স্বাধীনতা অনেক সীমিত। যদিও বিশুদ্ধ রাগের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও স্বর আর শ্রুতির বিন্যাস ও সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এক একটি রাগের যে বিশ্ব তৈরি হতে পারে তার ব্যাপকতা সুবিশাল, তবু রাগসংগীতে সুরস্রষ্টার স্বাধীনতার ব্যাপ্তি আসলে 'সীমার মাঝে অসীম'। অসীমত্বের প্রেমে পড়ে সীমাকে লঙ্ঘন করেছেন বিলায়েতের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ হেনে কোনও কোনও সমালোচকের ভ্রূকুঞ্চি ত হয়েছে বহুবার। গান্ধার, ধৈবত এবং নিষাদের শুদ্ধ এবং কোমল সুর একই রাগে প্রতিস্থাপন করে বহু স্বরের ভিড়ে তিনি রাগরূপ হারিয়ে ফেলেছেন এমন অভিযোগও উঠেছে। একটা কথা ভুললে চলবে না। ভারতীয় সংগীতের মাতৃসদৃশ হল জাতি এবং জাতিগায়নের ফল হল রঞ্জকতা, রস ও ভাবের সৃষ্টি। এই জাতি শুদ্ধা হতে পারে আবার সংসর্গজ বিকৃতা হতে পারে। গান্ধারোদীচ্যবা, নন্দয়ন্তী, গান্ধারপঞ্চ মী, কার্মারবী, কৈশিকী ইত্যাদি বিকৃতা জাতিগায়ন-কালে কোমল ও শুদ্ধ স্বরের সহাবস্থানে ও বহু স্বরের সমকালীন উপস্থিতিতে বীররস, শৃঙ্গ ররস, বীভৎসরস, অদ্ভুতরস সৃষ্টি হতে পারে—ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রে এর সমর্থন পাওয়া যায়। আমাদের পরিচিত রাগ-রাগিনী যখন এই জাতি থেকেই উদ্ভূত তখন নিজস্বই রাগের মোড়কে বিলায়েৎ খাঁ সাধারণ প্রচলিত রীতি ছাপিয়ে বহু স্বরের সহাবস্থান ঘটালে তাঁর বিরুদ্ধে রাগরূপ ফুটিয়ে তুলতে ব্যর্থ হবার অভিযোগ তোলা আসলে প্রচলিত গোঁড়া মনোভাবেরই প্রকাশ। রাগ হতে হবে ঔড়ব, ষাড়ব বা সম্পূর্ণ এবং সাতটির বেশি স্বর দিয়ে রাগ রচিত হবে না-এমন কিছু কিছু ধারণা রাগলক্ষণের নামে চলে আসছে। ঔড়বের নীচে রাগের প্রচলন সাধারণ ভাবে নেই, কিন্তু ইদানীং দক্ষিণ ভারতের শিল্পীদের কণ্ঠে চারস্বরবিশিষ্ট রাগ পরিবেশিত হতে শোনা যাচ্ছে। আবার একই রাগে বড় বড় পণ্ডিত আর ওস্তাদরা ভিন্ন ভিন্ন স্বর প্রয়োগ করে আসছেন-এমন দৃষ্টান্তও তো অজস্র। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়। তিলককামোদ যাড়ব-সম্পূর্ণ জাতির এমন একটা রাগ যাতে সব স্বর শুদ্ধ ব্যবহার করা হয়। বিশেষত কোমল নিষাদ বর্জন করার রীতি দেশ এবং সুরট রাগের থেকে একে আলাদা করার জন্য। কিন্তু দুই নিষাদই সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন কোনও কোনও গুণী শিল্পী। তিলককামোদের বিশেষ বক্রগতি বজায় রেখে রাগলক্ষণ এঁরা নষ্ট হতে দেননি। বলাই বাহুল্য, রাগসংগীতের মহাভারত তাতে অশুদ্ধ তো হয়ইনি বরং সমৃদ্ধ হয়েছে। অন্য স্বর বা বাড়তি স্বর রাগে প্রতিস্থাপনের এই পরীক্ষা বহুকাল থেকেই চলে আসছে। বিলায়েৎ খাঁ যা করতে চেয়েছেন সেটা যদি তাঁর একটা ঊটকো পরীক্ষা বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে সঙ্কীর্ণ রাগ হিসাবে পরিচিত "পিলু" কি বর্জনীয়? পিলুতে বারোটি স্বরেরই ব্যবহার লক্ষণীয়। মানুষটা যেহেতু ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ প্রতিবাদী ও নির্ভীক বিলায়েৎ খাঁ তাঁর পরীক্ষাটা নতুন এবং প্রথাসিদ্ধ পথের বাইরে হবে এতে আশ্চর্য হবার কী আছে। একটা কথা ভাবা দরকার প্রথাভঙ্গ করা যদি দোষের হয় তাহলে রাগসংগীতে প্রচলিত অর্থে স্বররূপই সব হয়ে দাঁড়ায়, ভাবরূপের কোনওই গুরুত্ব থাকে না। রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে এই তর্ক শেষ করা যেতে পারে—'সংগীতবেত্তাদিগের

প্রতি আমার এই নিবেদন যে কী কী সুর কীরূপে বিন্যাস করিলে কী কী ভাব প্রকাশ করে, আর কেনই বা তাহা প্রকাশ করে তাহার বিজ্ঞান অনুসন্ধান করুন। মূলতান, ইমনকল্যাণ, কেদারা প্রভৃতিতে কী কী সুর বাদী আর কী কী সুর বিসম্বাদী তাহার প্রতি মনোযোগ না করিয়া দুঃখ, সুখ, রোষ বা বিস্ময়ের রাগিনীতে কী কী সুর বাদী ও কী কী সুর বিসম্বাদী তাহাই আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হউন।' (সংগীত ও ভাব)।

সম্মান ও সমীহের দাবিদার

বিলায়েৎ খাঁর চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য তাঁকে সংগীতের নতুন রসধারায় শ্রোতার প্রাণমন ভরিয়ে তুলতেই যে কেবল সাহায্য করেছিল তাই নয়, সামাজিক ভাবে তাঁকে প্রতিবাদী প্রবল আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মানুষ হিসাবেও উপস্থাপিত করেছিল। শিল্পী এবং স্রষ্টা হিসাবে তাঁর প্রাপ্য তিনি পাচ্ছেন কিনা এই ব্যাপারে তিনি খুব বেশি অনুভূতিপ্রবণ ছিলেন। পণ্ডিত রবিশঙ্করকে কোনও এক অনুষ্ঠানে যে সম্মানী দেওয়া হয়েছিল তিনি তার থেকে এক টাকা বেশি দাবি করেছিলেন এ কথাই প্রমাণ করতে যে শিল্পী হিসাবে তাঁকে ছোট করে দেখা যাবে না। পদ্মশ্রী এবং পদ্মবিভূষণ খেতাব নিজে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং পণ্ডিত রবিশঙ্করকে ভারতরত্ন উপাধি দেওয়ার সময় তাঁর মনের অসন্তোষ গোপন রাখেননি। সরকারি আমলা এবং মন্ত্রীদের সংগীতের বিচারে অংশগ্রহণ করা ভাল চোখে দেখতেন না।

সংগীতসভায় তিনি যখন বাজাতেন, শ্রোতাদের মধ্যে অতিরিক্ত কথাবার্তা বা ফিসফাস চলতে থাকলে বিলায়েৎ খাঁ অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। এমন ক্ষেত্রে তিনি সেতার নামিয়ে রেখেছেন এ রকমও শোনা গেছে। স্বভাবে তিনি নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। আবার সমঝদার শ্রোতা পেলে তাঁর বাজনাও খুলে যেত। শ্রোতার মনের মধ্যে নিজের মনের আবেগ সঞ্চারিত করতে যাঁর ছিল সজাগ দৃষ্টি সেই বিলায়েৎ খাঁ উপ্টোদিক থেকেও কিছু প্রত্যাশা করতেন। সেটা সম্মান ও সমীহ প্রাপ্তির প্রত্যাশা।

বাংলার বিশেষ ক্ষতি

বিলায়েৎ খাঁর বংশের শিকড় যদিও ছিল উত্তরপ্রদেশের এটাওয়ায়, ইমদাদ খাঁ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে কলকাতায় এসে তারাপদ ঘোষের কাছে শিক্ষা শুরু করেন। তাঁর পুত্র এনায়েৎ খাঁ সভাসংগীতজ্ঞ থাকার সূত্রে বিলায়েৎ পূর্ববঙ্গের গৌরীপুরে ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরির বাড়িতে জন্ম নেন। পার্ক সার্কাসের স্কুলে পড়েছেন। কলকাতা এবং বাংলার লোক বলে নিজের পরিচয় দিতেন। বাংলায় তাঁর অসংখ্য শিষ্য, অনুরাগী এবং ভক্ত। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁকে সংগীতাশ্রম গড়ে তোলার জন্য এক খণ্ড জমির ব্যবস্থা করে দেওয়ায় বাংলার সংগীতপ্রেমী মানুষজন খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে সেই সংগীতাশ্রম আদৌ আর হবে কিনা এ ব্যাপারে তাঁর পরিবারের সভ্যরাই সন্দিহান। ফলত বাঙালির মনে বিলায়েৎ খাঁ এক বিশাল শূন্যতা রেখে দিয়ে চলে গেলেন। সংগীতের অন্যতম এই জ্যোতিষ্ক তাঁরই শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী গোবরা কবরস্থলে পিতা এনায়েৎ খাঁর কবরের পাশে শায়িত রয়েছেন। তাঁর সাধের বাংলা তথা কলকাতার মাটিতে নিজের মৃতদেহ মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন আফ্‌তাব-ই-সিতার।

প্রতিবেদন

শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত সম্মানসন্ধ্যা

গত ২১শে মার্চ রবিবার (২০০৪) সন্ধ্যা ছ'টায় ভারতীয় যাদুঘরের আশুতোষ শতবার্ষিকী হলে কমলকুমারী ফাউনডেশন ও চতুরঙ্গ পত্রিকার যৌথ উদ্যোগে আমাদের সময়ের একজন বিরল মনস্বী শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তকে সম্মান জানানোর জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন সুশীল মুখোপাধ্যায়।

কলকাতা তথা বাংলার বিদগ্ধ সমাজের উপস্থিতিতে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে এমন এক সারস্বত সন্ধ্যা কলকাতা বহুদিন দেখেনি। তাঁদের প্রিয় ও পরম শ্রদ্ধার অধ্যাপককে সংবর্ধনা জানানোর সংবাদ পেয়ে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-সংবাদপত্র জগতের এমনসব প্রথিতযশা গুণীব্যক্তি সেদিন সাগ্রহে ভিড় করে এসেছিলেন যাঁদের দেখতেই ভিড় জমে যাওয়া স্বাভাবিক। একটি আকর্ষণীয় ক্রিকেট ম্যাচ দেখার প্রলোভনও কাউকে বাড়িতে ধরে রাখতে পারেনি। তাঁদেরই কয়েকজন এগিয়ে এসে নবতিপর অশক্ত অধ্যাপককে ধরে ধরে পরম যত্নে মঞ্চে নিয়ে এসে বসালেন সভামুখ্য সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের পাশে। আর তাঁর দু'পাশে বসলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ বড়ুয়া, অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, নবনীতা দেব সেন, সুনন্দ সান্যাল এবং আবদুর রাউফ। চতুরঙ্গের সম্পাদক আবদুর রাউফের সুযোগ্য সঞ্চালনায় অনুষ্ঠান শুরু হল। সত্যকাম সেনগুপ্তর পরিচালনায় 'সোহিনী'-র শিল্পীবৃন্দ সূচনা-সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। আবদুর রাউফের স্বাগত-সম্ভাষণের পর শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তকে পুষ্পমাল্য দিয়ে বরণ করলেন রিনীতা রহমান ও জোরা রহমান। মানপত্র পাঠ করে অধ্যাপকের হাতে অর্পণ করলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। মূল্যবান উপহারসামগ্রীর সঙ্গে তাঁকে এক লক্ষ টাকার চেক প্রদান করলেন সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। 'হৃদয়ের উচ্চারণ' নামে একটি সম্মানগ্রন্থ সেই সন্ধ্যায় প্রকাশ করা হল। সম্মানগ্রন্থটি তাঁর হাতে তুলে দিলেন স্বপন মজুমদার। অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এই গ্রন্থে রবীন্দ্রকুমারের ব্যক্তিত্ব ও মনীষার নানা দিক নিয়ে লিখতে এগিয়ে এসেছেন শিক্ষা-সংস্কৃতি জগতের এক ঝাক নক্ষত্র। প্রকাশ করেছেন দে'জ পাবলিশিং।

এরপর রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনালেন এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত শেষে সঙ্গীতের মতোই ব্যঞ্জনাময় এক পর্ব— সঞ্চালকের আহ্বানে একে একে রবীন্দ্রকুমারকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে উঠে এলেন নবনীতা দেব সেন, সুনন্দ সান্যাল এবং অমলকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রকুমারের পাণ্ডিত্য, মনীষা, রসবোধ, ছাত্রপ্রীতি, নৈতিক চেতনা আর সারল্য বিষয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর কথাগুলি উচ্চারিত হল এই তিনজনের মুখে। তাঁর চরিত্রবৈশিষ্ট্যের, সুউচ্চ মানবিকতার কথা উঠে এল নানাভাবে। সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে এক সংক্ষিপ্ত সরস ভাষণে সকলকে মুগ্ধ করে দিলেন রবীন্দ্রকুমার।

সভাপতির ভাষণ শেষে সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করলেন 'সোহিনী'র শিল্পীবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে আবদুর রাউফের স্বাগত-ভাষণ থেকে জানা গেয়েছিল যে অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তকে সম্মান জ্ঞাপনের চিন্তা ও আয়োজনের মূল উদ্যোক্তা হলেন আত্মপ্রকাশে পরাঙ্মুখ নীহাররঞ্জন চক্রবর্তী। তাঁকে সহযোগিতা করেছেন শিল্পপতি হেমেন্দ্রপ্রসাদ বড়ুয়া এবং প্রসূনকুমার রায়। এই উদ্যোগ গ্রহণের প্রথমাবধি এবং ২১শে মার্চের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত আগ্রহভরে হাল ধরেছিলেন শঙ্খ ঘোষ। শান্ত স্থিতধী মানুষটি স্বপন মজুমদারের সহযোগিতা নিয়ে মঞ্চের নেপথ্য থেকে নিঃশব্দে সেই সন্ধ্যার অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে কেমন সজাগ যত্নবান ছিলেন সে কথা জানার সুযোগ সম্ভবত কেউই পাননি।

মেঘ মুখোপাধ্যায়

চিঠিপত্র

বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এগুলিও ইতিহাস

সুখরঞ্জন সেনগুপ্তের "ভাঙাপথের রাঙা ধুলায়" ধারাবাহিক রচনার (বর্ষ ৬২, সংখ্যা ৩-৪, ১৪১০) কয়েকটি ভুল সংশোধন করতে চাই। পুরানো কথা তিনি শুনেছেন, তাই তাঁর ভুল ইচ্ছাকৃত নয়। দৈনিক যুগান্তর-এর প্রথম সম্পাদক হিসাবে নাম ছাপা হয়েছিল যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে গিয়েছিলেন। পরে নীতিগত কারণে তিনি যুগান্তর পত্রিকা ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং আমারও শোনা কথা যে, সত্যেন মজুমদারের পরামর্শে তুষারকান্তি ঘোষ আনন্দবাজার পত্রিকার আর এক সাব-এডিটর বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে দৈনিক যুগান্তরের পরবর্তী সম্পাদক নিযুক্ত করেন। যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যুগান্তর ছাড়বার পর ব্যবসা-বাণিজ্য নামে একটি পত্রিকা বের করেছিলেন। পত্রিকাটি খুব জনপ্রিয় হয়। কিন্তু ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট কলকাতা শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তাঁর পত্রিকা-অফিস লুট হয় এবং পরবর্তী এক বছর কলকাতা শহরে সাম্প্রদায়িক-ভিত্তিতে চোরাগোপ্তা ছুরি মারা চলতে থাকায় পত্রিকাটি আর বের করা সম্ভব হয় না। অশোককুমার সরকার আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার পর প্রতিদিন অর্থনীতি-বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেন। তখন যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে আনন্দবাজার পত্রিকায় সহ-সম্পাদক হিসাবে ফিরিয়ে আনা হয়। যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছাড়া প্রয়োজনে অর্থনীতি-বিষয়ে সম্পাদকীয় লিখতেন হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ড পত্রিকার সম্পাদক সুধাংশু বসু। ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে যতীন্দ্র ভট্টাচার্য হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন এবং সুধাংশু বসু তখন জাপানে। বাজেট-অধিবেশনের সময় রোজই অর্থনীতি-বিষয়ে সম্পাদকীয় লিখতে হয়। তাই বার্তা-সম্পাদক সন্তোষকুমার ঘোষ এবং সহ-সম্পাদক সরোজ আচার্যের পরামর্শে ওই সময়ে অর্থনীতি-বিষয়ে সম্পাদকীয় লেখার জন্য আমাকে নিয়োগ করা হয়। পরে যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে এক ঘরে বসে কাজ করার সুযোগ হয়। যতীন্দ্রবাবু ১৯২১ সালে খিলাফৎ অসহযোগ আন্দোলনে মৈমনসিংহ জেলায় কারাবরণ করেছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা শোনার পর খিলাফৎ আন্দোলন সম্পর্কে আমার আগের মত পালটে যায়। যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সকালে পুজো এবং সন্ধ্যায় আহ্নিক করতেন। কিন্তু তিনি মুসলমানের তৈরি খাবার খেতেন। আমাকে বলেছিলেন 'খিলাফৎ আন্দোলনে "বন্দেমাতরম", "আল্লাহো আকবর" শ্লোগান দিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছি। তাই জেলে যাওয়ার পরে বলেছি "মিঞা ছাহেব, আপনি রাঁধবেন", আন্দোলনে যাকে ভাই বলেছি, তাঁর হাতের রান্না না খেয়ে পারি?' খিলাফৎ আন্দোলনে যাঁরা জেলে গিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই খাওয়ার ব্যাপারে পরে আর মুসলমানদের অস্পৃশ্য জ্ঞান করেননি। এটা আন্দোলনের ভাল দিক।

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত সত্যেন মজুমদারের স্যাটায়ারের নানা উদাহরণ দিয়েছেন। আমার মনে হয়, তাঁর একটা স্যাটায়ার মুসলমানদের মধ্যে ফজলুল হকের জনপ্রিয়তা বা প্রভাব হ্রাস করতে সাহায্য করেছিল। মুসলিম লিগের সঙ্গে কৃষকপ্রজা পার্টির কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটলে ১৯৪১ সালের ১১ডিসেম্বর ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাংলায় দ্বিতীয় কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির লিডার ছিলেন ফজলুল হক। ডেপুটি লিডার ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু। শপথ গ্রহণের দিনে শরৎচন্দ্র বসু ভারত-রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন। শরৎ বসুর দপ্তরটি খালি রেখে অন্যেরা মন্ত্রিত্বের শপথ নেন। ঠিক ছিল ১২ জন মন্ত্রীর ৬ জন হবেন হিন্দু, ৬জন হবেন মুসলমান। শরৎ বসু গ্রেপ্তার হওয়ায় হিন্দুদের মধ্যে যে পাঁচজন শপথ নেন, তাঁরা হলেন কংগ্রেসের সন্তোষকুমার বসু, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র নস্কর, উপেন্দ্রনাথ বর্মন এবং হিন্দু মহাসভার ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ছিলেন অর্থমন্ত্রী। তাঁর অন্য কোনও মর্যাদা ছিল না। কিন্তু সত্যেন মজুমদার তাঁর কলমে এই কোয়ালিশন সরকারকে 'শ্যামা-হক' মন্ত্রীসভা বলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন। 'শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা' নামকরণ মুসলিম লিগকে সারা বাংলায় এই বলে প্রচার করতে

সাহায্য করে যে, ফজলুল হক হিন্দু মহাসভার কাছে নতি-স্বীকার করেছেন। বাংলায় মুসলিম লিগের জনপ্রিয়তা শেষ পর্যন্ত ভারত-বিভাগকে অনিবার্য করে তোলে।

আমার অর্জিত জ্ঞান অনুসারে আমি সুখরঞ্জনদার একটি ধারণা সংশোধন করতে চাই। ১৯৫৩ সালে ট্রাম-ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন দমন করার জন্য পুলিশ কমিশনার সমাজ-বিরোধীদের দিয়ে সাংবাদিকদের পিটিয়েছিলেন। যুগান্তরের রিপোর্টার হীরেন মিত্রের পকেট থেকে পেন ও মানি-ব্যাগ তুলে নেয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে আনন্দবাজারে 'মাতৃগর্ভের লজ্জা' নামে এক জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় ছাপা হয়। জনশ্রুতি ছিল ওটি সত্যেন মজুমদারের লেখা। সত্যেন মজুমদার তখন সম্ভবত শেষবারের মতো আনন্দবাজার পত্রিকায় কাজ করছিলেন। আমি শুনেছিলাম, ওটা সত্যেন মজুমদারের লেখা। কিন্তু আনন্দবাজার পত্রিকায় চাকরি নেবার পর জানতে পারি, ওটা সম্পাদক চপলাকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা। চপলাকান্তবাবু সম্পাদক থাকা কালীন এক এক স্লিপ লিখে সেটি বেয়ারার মাধ্যমে প্রেসে পাঠাতেন। আমাকে বেয়ারারা বলেছিলেন, ওটা বড় বাবুর লেখা। তাঁরা আরও জানিয়েছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকা ওই সংস্করণের চাহিদা এত বেশি ছিল যে, ওই দিনের পত্রিকা দ্বিতীয়বার ছাপতে হয়েছিল। আমি অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছিলাম যে, বেয়ারাদের দেওয়া খবর অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য। সে জন্য আমার ধারণা, ওই সম্পাদকীয়টি জনশ্রুতি মতো সত্যেন মজুমদারের লেখা নয়।

সত্যেন মজুমদার কেন আনন্দবাজার পত্রিকার চাকরি ছেড়েছিলেন, আমার সংগৃহীত তথ্য থেকে সেটাও জানাতে পারি। সত্যেন মজুমদার কম্যুনিস্ট ছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু দ্বিতীয়বার কংগ্রেস-সভাপতি হওয়ার পর কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে বিরোধের সময় কম্যুনিস্ট ও সোশালিস্টরা সুভাষবাবুকে পরিত্যাগ করে। সত্যেন মজুমদার তখন সুভাষচন্দ্র বসুকে আক্রমণ করে রোজই সম্পাদকীয় লিখতেন। কিন্তু পরের দিন দেখতেন, তাঁর সম্পাদকীয় ছাপা হয়নি, তার বদলে সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করে সম্পাদকীয় বের হয়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুরেশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর অনুগামী। সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তব্য অবাঙালিদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য সুরেশচন্দ্র মজুমদার ইংরাজি দৈনিক হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড বের করেছিলেন। সত্যেন মজুমদার সম্পাদকীয় লিখে মদ খাওয়ার জন্য বাইরে চলে যাওয়ার পর সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রেস থেকে ওই সম্পাদকীয় এনে তার বদলে অন্য সম্পাদকীয় প্রেসে পাঠাতেন। দিনের পর দিন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় সত্যেন মজুমদার রাগ করে আনন্দবাজার ছেড়ে যান এবং কিছুদিন তিনি কম্যুনিস্ট-পত্রিকা 'অরণি'র সম্পাদক ছিলেন। অবশ্য পরেও প্রবীণ এক সহ-সম্পাদকের সম্পাদকীয় দিনের পর দিন হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে ছাপা হয়নি। তবে তার কারণ ছিল ভিন্ন। চপলাকান্ত ভট্টাচার্যকে সরিয়ে অশোককুমার সরকার আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক হলে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের সহ-সম্পাদক অধীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে আনন্দবাজার পত্রিকার বিরুদ্ধে কেস হয়। অধীর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ভারতের জার্নালিস্ট ফেডারেশানের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। ওই কেসের জন্য তাঁর কোনও সম্পাদকীয় বহু বছর হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে ছাপা হয়নি। তিনি আসতেন, সই করতেন এবং সম্পাদকীয় লিখে চলে যেতেন। যাই হোক, ওই কেসে আনন্দবাজার পত্রিকা জিততে পারেনি। কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষের হস্তক্ষেপে কংগ্রেস এম. পি. চপলাকান্ত ভট্টাচার্য টাকা নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট থেকে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের বিরুদ্ধে কেসটি তুলে নেন।

পশ্চিমবঙ্গে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এগুলিও ইতিহাস।

— নিরঞ্জন হালদার
৭৯ রাজকৃষ্ণ ঘোষাল রোড,
কলকাতা ৭০০০৪২